নমিতা মুখোপাধ্যায়
মধুর বিস্মৃতি : 'কবির পৌষ আর কবিতার মাঘে'
নরেশ গুহ
একটা নষ্ট ফল : 'আহা রে ছুঁই কে ফল অকালে'
পুর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য
প্রস্তাব : 'জেনো নুনোপথ বন্ধ'
অনৈহাসিক : 'অঙ্কের কাঁচা ছেলে'
এবার গেলে ফিরবে সে-মন : 'যাওয়ার যা তা যাবেই'
একটি অনুভব : 'পৌরসমিতির ভোর'
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়
ভিলানেল : 'তোমার ভালোবাসা তোরের কথাগুলি'
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
আবহমান : 'যখন বর্ষণ মুক্ত তোমার শরীরে' ২০৬
জানলা : 'ঘুমের মাঝে তারার কুয়াশা' ২০৭
শ্রেষ্ঠ প্রেম : 'সে-এসে দাঁড়ায় বুঝি আকাশের মতো' ২০৭
প্রতিমা পাল
বিকেল : 'নীল বিকেল' ৩১
রাত্রিশেষ : 'বাইরে নেমেছে বৃষ্টি' ৩১
একটি স্বপ্ন : 'কাল রাতে, হঠাৎ আমার' ১০৯
প্রভাকর সেন
প্রমিতি : 'কোমল পাতার আভা এলবের শাখে'
বিকাশ দাশ
অলৌকিক : 'পুরোনো সড়ক, এর অলিগলি'
বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
হাসি তবু হ'লো ইতিহাস : 'যে-হাসি ছিটিয়ে দিবে' ১২৭
মাঝাদের গান : ছি্রোলেট গুচ্ছ ২০১
জীবনবৃত্ত : 'মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ু' ২০৩
ঘ'রেশ-পক্ষক : 'রাত্রি আর নয় সুদূর' ২৬৮

বিষ্ণু দে
চতুর্দশপদী 'বহুদীর্ঘ পরিক্রমা'
সাতটি এপিগ্রাম
ঘরের আড়ালে প্রেমিক : 'আমার যাহাতে ভয় বিশেষ'
দশদিক : 'কর্মে আর ব্যক্তির প্রত্যয়ে'
বুদ্ধদেব বসু
সনেটগুচ্ছ :
ফেরা : 'এতে নয় জড়িত জনপদের বিরাট নিয়তি'
কবি : তার ক্ষমতার প্রতি
সনাতন সংঘর্ষ : 'বাসনা অপরিসীম,'
'দুই পাখি' : 'যখন রাত্রি নামে'
মিল ও হৃদ্য : 'আমি, এক অন্তর্গামী'
বেলা : 'আতাল, আতাল ঢেউ'
কর্কটক্রান্তি : 'দীর্ঘ দিন শেষ হ'লো'
অপেক্ষা : 'উল্লোল দিনের পর দিন'
না-লেখা কবিতার প্রতি :
১ : অনন্ত জন্মের যার
২ : তোমরা, আমাকে যারা
৩ পড়বা ?···জানে না কেউ
স্টিল-লাইফ : 'লোবালি আপেল, ছুরি'
প্রেমিকারা : 'মেয়েদের হাসির প্রস্রবণ'
ঋতুর উত্তরে : 'শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষার দিন'
বন্ধুসম্বোধে : 'বলো, কিছু বলো'
ন্যাওড়েপ : 'ওরা সব নিয়েছিলো ভাগ ক'রে'
আটচল্লিশের শীতের জন্য
১ 'না ছুই, নিবি না আর' ১৬৬
২ 'প্রান্তরে কিছুই নেই' ১৬৭
৩ : 'কবে সেই ফুরান ফুরালো' ১৬৮

দেবব্রতীর স্মরণে কচ

১ 'মাঝে-মাঝে, বার-বার,'

২ 'তোমার কথা ভাবতে গিয়ে'

৩ : 'ভুলেও কবি না উচ্চারণ'

প্রেমিকের গান

১ 'কী এসে যায়, তবু না তুমি চলছলীনা' ৩৩১

২ 'কাছে যাওয়া বড্ড বেশি হবে' ৩৩৯

এক তরুণ কবিকে 'পাতাবিহীন ইস্কি রেখো খাড়া' ৩৪১

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

চেনা পাখি : 'হর্ষের হাতে সোনার পদ্ম'

মৃণালকান্তি

প্রতীক্ষা : 'সে আসেনি'

পাখ : 'ক্লান্তিকর রুক্ষ দিন'

অন্ধ : 'কী যে পাখি নীলিমায়'

অসহায় : 'যৌন যন্ত্র যেন পাখি'

নিঃস্ব : 'একটি মুহূর্ত শুধু'

যৌবন : 'যৌবন সাথে জলন্ত শিখা'

আলোছায়া : 'দিনের প্রখর আলোয়'

অস্তি : 'সেও কি পড়েছে বাঁধা'

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

উতল বসন্তে : 'ছায়া-কাঁপা তীব্র আবলম্বি'

যোগেন্দ্রনাথ সেন

গিরিপিগ : 'পুরোনো উদ্যানপ্রান্তে'

আশ্বিন : 'বাসিহাঁস ফিরে এলো'

নিশাচর : 'সারারাত ধ'রে'

রবীন্দ্রনাথ সেন

আকাশ-পিপাসা : 'তোমাকে জেনেছি যত',

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

সহজ : 'মধু ভাঁড়ে রক্ত ক্ষয়'

নীলিমা : 'হঠাৎ গভীর শব্দে উৎকেন্দ্রিক লরি'

তোমার মৃত্যুর পর : 'তুমি নেই ! আকাশের আলো'

উদ্বাস্তুদের বিধি ও রোধ : 'এ-ক'দিন একটুও রোদ নেই'

বিশ্বস্ত : 'কেউ মানে, কেউ তার নির্দেশ মানে না'

লোকনাথ ভট্টাচার্য

দুই অপরাহ্ণ : 'দিন হ'লো ক্রুর ক্রুদ্ধ'

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

যম : 'বিপ্রকর্ষ তোমোমর তোমার অতিথি'

শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্য

হংসপাহিকা : 'পলাতক মুহূর্তের ছবি নিয়ে'

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

ইতিহাস : 'সিন্ধুর কৌটোয় মোড়া দীর্ঘ ইতিহাস

শচীন্দ্র কাদরী

এই শীতে : 'শীতার্ত নিঃস্বতায় কিছুই বাঁচে না'

শান্তিকুমার ঘোষ

সমুদ্রচতুর্থ

উত্তরণ : 'নিরন্ত সময় আর অনন্ত বিস্তার'

রাত্রিলোক

আটত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখা : 'বিপরীত দিকে তবু'

অন্য এক সমুদ্র : 'সবুজ ফিরোজা নীল',

শামসুর রাহমান

নির্জন দুর্গের গাথা : 'যামিনি জীবন সমুদ্র সন্ধানে' ৪৩

বিরস গান : 'ইচ্ছা যার অনিদ্রায় জীবনভোর' ৪৫

ভোরবার জন্য : 'এতকাল ছিলাম একা আর ব্যথিত' ১০৯

ছিলো সে-ও : 'ছিলো সে-ও ধূলোয় নিঃসঙ্গ পথে' ২১৭

দে-ছাড়া আরনায় : 'দে-ছাড়া আরনায় ছাখো'
সে : 'প্রেম তাকে করে না আকুল'

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
বৌ : 'কোথাও এমন বিন্দু নেই'

সলিল গঙ্গোপাধ্যায়
ট্রাঙ্গলেট : 'মরা ডালে আর কেন আলো তুমি'

সুকুমার রায়
বাগানবাড়ি ৩৮
তুলিনি : ৩৮
বদি : 'নির্জন নিশ্চুপ পোড়ো বাড়ি' ১২৬
বৈশোধ : 'ছোট্ট নাক : প্রলাপ যেন রুদ্ধ' ১২৬
উপযাচিকা : 'জলের মতো চিকন তার হাসি' ২২২
সঙ্কেত : 'ঘোমটাখানি তোলো' ২২২

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
তীর্থপরিক্রমা : 'এখনও গেল না তোলা'
ভূমা : 'সবুজের স্বপ্নগ্রাম কাস্তনের রৌদ্রে হিরণ্ময়'

সুনীল চট্টোপাধ্যায়
ধরনী : 'মন্দির চূড়া হঠাৎ যখন জলবে'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
মিনতি : 'ঝড় দিসনে, আকাশ' ২৮৬
বিবৃতি : 'উনিশে বিধবা মেয়ে' ২৮৬

সুশীলকুমার গুপ্ত
ব্যর্থতা : 'কী ক'রে তোমাকে ক'রে যাবি'

সৈয়দ শামসুল হক
দুইজন : 'চুপ ক'রে থাকে সে আড়ালে' ৩৬
স্টাডি : 'আকাশে আলতো আঁকা' ৩৬
তার মৃত্যু : 'ইজদানি মারা গেছে' ১৩১

রজনী : 'আকাশে উদাসী মেঘ'

প্রস্থানের মুহূর্তে : 'এই দেখে যাবো চলে'

রহিলাকে : শিল্পীর উত্তর—'লোকোত্তর কোনো এক'

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

সোহিনী : 'শেষ রাতের পাতলা পর্দা ছিঁড়ে'

লগ্ন : 'আলো এখন গোলাপ হয়ে'

ঢেউ : 'ব্যথা-নদীর ও পার থেকে'

হুমায়ুন কবির

যৌবন : তোমারে ভুলিতে হবে'

অনুবাদ-কবিতা

কার্ল স্যান্ডবার্গের কবিতা

(অনুবাদে : কবিতা সিংহ)

১ প্রবাহ ২ ক্ষতি ৩ সত্যি ৪ পছন্দ করো

শিএর রঁসার

(অনুবাদ : বিষ্ণু দে)

সনেট : 'যখন অত্যন্ত বৃদ্ধা হবে তুমি, সাঁঝের বাতিতে'

রঁাঁবোআ তিল

(অনুবাদ : বিষ্ণু দে)

লে, বা বরং রঁাঁবো : 'মরণ, কাঁদালি নিষ্ঠুরতার জোরে'

ফেদেরিকো গার্সিয়া লর্কা অবলম্বনে

(কবিতা সিংহ)

একটি ইচ্ছার সঙ্গীত : 'আহা কী বেদনায় অপার প্রান্তর'

রাঁডলিফ হেল্ডারলিন

(অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)

সন্ধ্যাস্নান : 'ফুটির-প্রাঙ্গণে ব'সে ক্লান্ত চাষি'

আমার সম্পদ : 'এখন হেমন্তদিন'

তের আরনের কবিতা
(১-৩ অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য
৪, ৫ অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)
অনেকটি খণ্ড কণ ১
১১
.. ২৪
ক্রস্ট : 'সন্ধ্যা, বিশাল এক আকাশ' ৮৬
গয়লানি : 'গলায় বাঁধা রুমাল' ৮৭
বৈকালি লোক-সংগীত ১-৪
(অনুবাদ : বিকাশ রায়) ৩৩৩
রাইনার মারিয়া রিলকে
(অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)
অর্ফিউসের প্রতি সনেট ১
শার্ল ভ্রুক্ ব'দলেআ
(অনুবাদ : বিষ্ণু দে)
র'দেল : 'পালান সব এখান থেকে পালান'
শার্ল বোদলেআর
(১-৪১ অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু। ৪২ অনুবাদ : বিষ্ণু দে)
১ ভ্রমণ : 'পঞ্জিকা, রঙিন ছবি, বালকের হৃদয়মুকুল'
২ অনেকটি দিন : 'মনের নেশা লুকিয়ে রাখে নোংরা গলি'
৩ ছাকড়া-কুড়ুনির মদ : 'বস্তির সলিল পথে'
৪ নিঃসঙ্গ মানুষের মদ : 'যেমন, অন্ধোদ হ্রদে'
৫ প্রেমিক-প্রেমিকার মদ : 'সকল দিক আজ মায়ুরীময়'
৬ গন্ধর্ব : 'পাতাল, জগৎ ঘুড়ে দেখেছেন কেবল গন্ধর্ব'
৭ চাকনা : 'মানুষ যেখানে থাক, সিন্ধুপারে, কিংবা আরো দূরে'
৮ ধ্বংস : 'নিত্য সে আমার পাশে'
৯ রোমান্টিক সূর্যাস্ত : 'কী সুন্দর সূর্যের জ্যোতির্ময়, নয় বিস্ফোরণ'

একটি মুখের প্রতিশ্রুতি : 'শান্তিময়ী, ভালোবাসি যাঁকা তুক তোমার'

১১ সুন্দর জাহাজ 'অলস যাত্রাবিনী, বলবো তোরে, শোন'

১২ আলবাট্রস : 'মাঝে-মাঝে সকৌতুকে'

১৩ প্রতিসাম্য : 'প্রকৃতি, মন্দির এক'

১৪ পদ্য কবিতা : 'কবিতা, মানসী, দুই প্রাসাদের উপাসক, জানি'

১৫ পূর্বজন্ম : 'সরল শুভ্রের সাথি অলিন্দের বিরাট নির্ঝর'

১৬ আদর্শ : 'ক্যাকাসে বরফে-পড়া, পটে-আঁকা রূপসীর দল'

১৭ মানবী : 'সে দূর অতীতে, যবে প্রকৃতির ঘনমত্ত রতি'

১৮ মৃতাগত সুখ্যাস 'যখন, দুচোখ বুজে'

১৯ আলাপ : 'হেমন্তের সুন্দর আকাশ দুমি'

২০ আধ্যাত্মিক উষা : 'আদর্শ দর্শনময়'

২১ দুই বোন : 'উষার, সৌরভময়ী, আছে দুই মনোরম নারী'

২২ নর্তকী সাপিনী : 'কী যে ভালোবাসি, প্রেয়সী, তোমার তনুবিতান' ১১৩

২৩ অতিশয় লাস্যময়ীকে : 'রমণীর কোনো দুরু-ছবির মতো' ১১৪

২৪ লাল চুলের ভিখিরি মেয়েকে : 'লাল চুলের, কর্শা, একমুঠো' ১১৬

২৫ রাজহাঁস : 'আত্মোন্মাকি, তোমাকে স্মরণ করি' ৩১৭

২৬ অলংকার : 'ফেলে দিলো বসন আমার প্রিয়া' ৩১৯

২৭ মরণের নৃত্য : 'সম্রাট রমণী যেন' ৩২১

২৮ মিথ্যার প্রেম : 'অলস আবরিণী, যখন দেখি তোরে' ৩২৪

২৯ স্বীকারোক্তি : 'শুধু একবার তোমার বাহুর শ্লাঘি' ৩২৫

৩০ সৌন্দর্যের স্তব : 'উৎস কি তোর দ্যুলোক' ৩২৭

৩১ অনুকম্পাময়ী ভাস : 'অন্ধির, তোর ভবিতব্যের মতো ৩২৮

৩২ কর কবিতা : 'আহা রে, কবিতা, বল.' ৩২৯

৩৩ লিখি : 'উঠে আয় আমার বুকে' ৩৩০

৩৪ কোনো মালাধারের মেয়েকে : 'তোমারই হাতের মতো' ৩৩১

৩৫ মশাল : 'কয়েল, সুখের পদ্য, তনুমাংসে স্নিগ্ধ উপাখ্যান, ২২১

৩৬ বিকেলের গান : 'যদিও তোর কুটিল ভুরু-জোড়া' ২৩১
৩৭ বিড়াল : 'আমার শায়ক বুকে উঠে আয়' ২৩৩
৩৮ বিড়ালেরা : 'প্রৌঢ় অসুর আগমে, প্রণয়' ২৩৩
৩৯ বিড়াল : 'আমার মাথার তার চলে আনাগোনা' ২৩৪
৪০ প্যাচারা : 'উইগাছের কালো ছায়ার খাপে' ২৩৬
৪১ ভ্রমণের আহ্বান : 'কবিতা, কন্যা, বোন' ২৩৭
৪২ মাতাল হও : 'সব সময়ে মাতাল হ'তে হবে' ৩৩

প্রবন্ধ

জ্যোতির্ময় দত্ত

আধুনিক কাল ও বাংলা কবিতা

[জগত, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, তৃতীয় নয়ন, লয় সোধুলি, বুদ্ধিল আসান, দক্ষিণ নায়ক, হেমন্তের দিন]

নরেশ গুহ

ওঅল্ট হুইটম্যান—একশো বছর পরে ৬৮

বুদ্ধদেব বসু

অমিয় চক্রবর্তীর পালা-বদল

ভাষা ও রাষ্ট্র

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সমালোচনার স্বাধিকার

গল্প অনুবাদ

বু-ধ.

ভেরআরন প্রসঙ্গে

১ ভেরআরন এসোইথ-এর আত্মজীবনী থেকে

২ রাইনার মারিয়া রিলকের পত্রাংশ

চিঠিপত্র

অমিয় চক্রবর্তী [ছন্দ ও কবিতা]
দীপঙ্কর দাশগুপ্ত [অমিয় চক্রবর্তীর ছন্দ]
নরেশ গুহ [,,]
অশোক মিত্র [অক্ষরবৃত্ত ছন্দ]
অক্ষরবৃত্ত ছন্দ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য
প্রকাশচন্দ্র চক্রবর্তী [জীবনানন্দর কবিতা]
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ['কবিতা'র ত্রুটি বহর]
শান্তিকুমার ঘোষ [বাংলা সনেট]

সমালোচনা ও অন্যান্য

নরেশ গুহ [রুক্ষচূড়া, মধুর বঙ্গনা]
বুদ্ধ
সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ
সমালোচনা [The Flowers of Evil, 100 Poems from the Japanese]
সম্পাদকীয় [হুইটম্যান, রেমবোরন, টমাস মান]

ছবি

ওয়াল্ট হুইটম্যান
এমিল রেমবোরন

J 29,380

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬২
বিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
ক্রমিক সংখ্যা ৮০

সম্পাদকীয়

'কবিতা'র কুড়ি বছর আরম্ভ হ'লো। হওয়া উচিত ছিলো একুশ বছর; কিন্তু—পুরোনো পাঠকদের স্মরণে থাকতে পারে—১৩৪৭ ও ৪৮-তে পত্রিকার প্রকাশ এতই অনিয়মিত ও অনিশ্চিত হ'য়ে উঠেছিলো যে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে কাগজে-কলমে পুরো একটা বছর আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তা কুড়ি হোক বা একুশ হোক, কোনো কবিতা-পত্রিকার পক্ষে আমরা বড়ো দীর্ঘকাল টিঁকে আছি, এ-কথা এখন মানতেই হয়। হয়তো অসংগতরকম দীর্ঘকাল। পাঁচ, সাত, দশ বছরের উজ্জ্বল জীবনের পরে আমরা যদি অবসিত হতুম, সেইটাই যেন স্বাভাবিক হ'তো, সাহিত্যের উত্তম ঐতিহ্যের অনুসারী। ক্লান্তি নামেনি তা নয়, অক্ষমতার প্রহর আমরা জেনেছি; কিন্তু সেই মুহূর্তটা অতিক্রম করার প্রেরণা কখনো হারিয়ে যায়নি, তা যেন এই পত্রিকারই প্রবাহের মধ্যে নিহিত ছিলো; তারই আদেশ পালন ক'রে চলেছি আমরা। হোক পত্রিকা, হোক মানুষ, তার সত্যিকার আয়ুষ্কাল ততক্ষণই, যতক্ষণ নিজেকে সে প্রয়োজনীয় এবং সার্থক ব'লে অনুভব করে। অন্যেরা যা বলে বলুক, নিজেকে সার্থক ব'লে অনুভব করাই আসল কথা; তারই নাম জীবন।

এই সার্থকতাবোধ কোথা থেকে আসে? আসে মূল্যবোধ থেকে। কোথায় আমরা মূল্য দিয়ে থাকি, আমাদের সকল ক্রিয়াকলাপ তারই উপর নির্ভর করে। 'কবিতা'র মতো পত্রিকা অর্থাগমের উপায় নয়, সর্বসাধারণের সামনে বিপুলভাবে উপস্থিত হবারও পথ নয় এটি: এই কাজের প্রকৃতি অনেকটাই ব্যক্তিগত। এ যদি বেড়ে উঠে থাকে এবং অন্তর্ধানের সম্ভবপরতার প্রতিবাদ ক'রে থাকে, তার কারণ এর অন্য কোনো আকর্ষণ—মনের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে কোনো

আকর্ষণ। 'আদর্শ' কথাটা বড্ড কড়া, আঁটোসাঁটো, গম্ভীর ; 'কবিতা' বের করার সময়, বা পরবর্তী কালে, আমাদের সামনে কোনো স্পষ্ট আদর্শ ছিলো, এ-কথা বললে অতিরঞ্জন হবে। যেটা ছিলো, সেটা মনের একটা ইচ্ছে মাত্র, খুব বড়ো কোনো ইচ্ছেও নয় :—কবিতার জন্য পরিষ্কার আর নিভৃত একটু স্থান ক'রে দেবো, যাতে তাকে ক্রমপ্রকাশ্য উপন্যাসের পরপ্রান্তে বসতে না হয়, কুণ্ঠিত হ'য়ে থাকতে না হয় রঙ-বেরঙের পসরার মধ্যে, অনেক বেশি গলায়-জোর-ওলা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে—যাতে তারই জন্য নির্দিষ্ট যেন্নার সমর্মীর সঙ্গে সসম্মানে সে সৌঁছতে পারে স্বল্পসংখ্যক সুনির্বাচিত পাঠকের কাছে—এইটুকু মাত্র ইচ্ছে করেছিলাম। 'সসম্মানে' এবং 'সুনির্বাচিত', এই বিশেষণ দুটি লক্ষ্যণীয় : যে-পত্রিকায় কবিতা আর সাহিত্যের আলোচনা ছাড়া আর-কিছু থাকে না, এবং এসপ্লানেডের স্টলওলার মতে মূল্য যার অসম্ভবরকম বেশি, সেই পত্রিকা যে-ক'জনই কিনবেন, তাঁদের প্রত্যেককেই কাব্যকলার প্রকৃত অনুরাগী ব'লে ধ'রে নেয়া যায়। অতএব এতে প্রকাশিত কবিরা অপাত্রে আত্মনিবেদনের লজ্জা থেকে বাঁচেন, এবং সম্পাদকের পক্ষেও সেটাই সবচেয়ে বড়ো তৃপ্তির কথা। অর্থাৎ, আমরা কবিতা নামক বিষয়টাকে জরুরি ব'লে মনে করি ; মনে করি, ওতে সমগ্রভাবে মানবসভ্যতার অত্যন্ত কিছু এসে যায়—যদিও সেটা কেমন ক'রে ঘ'টে থাকে, 'সুরভ', 'ঘুসর পাণ্ডুলিপি' বা 'চোরাবালি' নামক কাব্যগ্রন্থ লেখা না-হ'লে—যাকে আমরা 'দেশ' ব'লে থাকি সেই দৈনিকপত্র-পরিবেশিত জনগণের কোথায় কোন ক্ষতি হ'তো, সেটা বুঝিয়ে দেবার স্পর্ধা আমরা রাখি না। কিন্তু যেমন আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অনেক যন্ত্র, অনেক গ্রন্থি নিরন্তর কাজ ক'রে যাচ্ছে, আমরা তা কখনো জানতে পারি না, কিন্তু কোথাও কোনো প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ন হ'লেই পীড়িত হ'য়ে পড়ি—সভ্যতার উপর কবিতার বা শিল্পকলার প্রভাবও সেই রকম। এই পত্রিকার প্রথম থেকেই, কবিতার এই আদিমূল্য আমরা স্বীকার ক'রে নিয়েছি, এবং সেই সঙ্গে, আলোচনা এবং উদাহরণ দ্বারা, এটাও স্পষ্ট ক'রে তুলতে চেয়েছি যে পদ্যের আকারে মিলিয়ে লেখা রচনামাত্রকেই কবিতা বলে না।

• • •

আজ ভেবে দেখলে মনে হয়, 'কবিতা' আরম্ভ হয়েছিলো কবিতার পত্রিকা-রূপে নয়, কবিদের পত্রিকা-রূপে। অর্থাৎ, প্রতি সংখ্যায় কিছু কবিতা—এমনকি, কিছু ভালো কবিতা ছাপা হবে, আমাদের লক্ষ্য ঠিক এই রকম ছিলো না ; সমসাময়িক সৎকাব্যের সমগ্র ঘারাটিকে আমরা এর মধ্যে সংহত করতে চেয়েছিলাম। একটি সৌভাগ্যবশত সমাপতন আমাদের সহায় ছিলো : তিরিশের বছরগুলিতে যে-সব কবিরা নতুন দৃষ্টি ও নতুন সুর নিয়ে এসেছিলেন, যাঁদের শিল্পীকলাপ, কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তাঁদেরই বাহন এবং প্রচারক-রূপে আমাদের যাত্রারম্ভ। তারপর এই কুড়ি বছরে আরো অনেক তরুণতর সঙ্গ পেয়েছি, ; পেরিয়ে গেছি বিতর্ক, সহ্য করেছি বিদ্বেষ, দেখেছি খ্যাতির উত্থান ও পতন, তুল্য এবং বহুৎ পরিণাম। আমাদের প্রথম সহযাত্রীর মধ্যে জীবনানন্দ দাশ মৃত, কেউ-কেউ মৌন, কেউ বা দূরে স'রে গেছেন। কিন্তু—'কবিতা'র সূচীপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে—তাঁদেরই অনেকের বসন্তের দিনে যেমন আমরা একসঙ্গে ফুল তুলেছি, তেমনি তাঁদের হেমন্ত ফসল কুড়োতেও আজ আমরা যাবান। এই নিরবচ্ছিন্ন সহযোগের জন্য ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং যাঁরা আপাতত মৌন, আমরা তাঁদেরও প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশী।

* * * *

কিন্তু এই কয়েকজন কবি—আজকের দিনে পাঠকমাত্রেই যাঁদের সঙ্গে পরিচিত—তাঁদের বাইরে আরো অসংখ্য লেখকের রচনা আমরা প্রকাশ করেছি—কখনো-কখনো এমন রচনা, যা নিজের মধ্যে সার্থক ও সম্পূর্ণ, উপরন্তু সম্ভাবনার বাহন। বস্তুত, 'কবিতা'র পৃষ্ঠা থেকে অখ্যাত লেখকদের কবিতা বেছে নিয়ে একটি মনোহর সংকলনগ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব নয় : কয়েকটি, এমনকি হয়তো একটিমাত্র ভালো কবিতা লিখে অনেকেই এক নিরক্তিজ্ঞান কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেছেন—তারপরে আর তাঁদের বিষয়ে কিছুই শুনিনি বা জানতে পারিনি। কী হ'লো তাঁদের, কেন আর লিখলেন না, কোন দারিদ্র্য অথবা সাফল্য, উচ্চাশা অথবা হতাশার চাপে ঠোঁটের উপর ভাষা ম'রে গেলো তাঁদের, না কি ঐটুকুর বেশি বরাদ্দ নিয়েই জন্মাননি তাঁরা—

এই সব দুরুহতা মনোবিজ্ঞানীর প্রবেশযোগ্য, সাহিত্যিকের নয়। কিন্তু এই ঐকান্তিক লেখকদের—যাঁরা অন্তত একবারও ডাক শুনতে পেয়েছিলেন —তাঁদেরও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে, বেদনার সঙ্গে স্মরণ করি : যুগে-যুগে এই ক্ষণকালীনের যে-স্রোত ব'য়ে চলে সমসাময়িকের সংলগ্নতায় তার প্রয়োজন আছে, এবং পরিশ্রমী ও বিবেকবান উত্তরকালের ভাণ্ডারে যে এ থেকে দু-একটি রত্ন চয়িত হ'তে না পারে তাও নয়। সার্থকতা গভীরতম অর্থে দৈবাধীন : আমাদের কাজ প্রচেষ্টার উপর দৃষ্টি রাখা।

নতুন কবিরও অনটন ঘটেনি। সাহিত্যিক হিশেবে কুড়ি বছরের মধ্যে দুই বা তিন পুরুষ বেড়ে উঠতে পারে : আজকের দিনে যাঁরা পঞ্চাশ-প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত, এবং যাঁরা কুড়ির কিনারায় কম্পমান—তাঁদের, এবং তাঁদের মধ্যবর্তী সকলেরই জন্য আমাদের আমন্ত্রণ অবারিত রেখেছি। আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করি কয়েকজন তরুণ কবির যাথার্থ্য—হয়তো তাঁরাও আক্ষরিক অর্থে আর তরুণ নন, কিন্তু কনিষ্ঠরাও ইতিমধ্যে তাঁদের কাব্যচর্চার কিছু প্রমাণ দিয়েছেন। বাংলাদেশে কবিতার প্রচার, মনে হয়, বিবর্ধমান ; এই বিষয়টিতে প্রকাশকদের মধ্যে যে-সন্তর্পণীয় অরুচি ছিলো তাও এখন অবসিত বললে ভুল হয় না। তার একটা বড়ো প্রমাণ এই যে গত দু-তিন বছরের মধ্যে তরুণ কবিদের অন্তত পঁচিশখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হ'তে পেরেছে, তার অনেকগুলো আমার একেবারে প্রথম বই। এই সব বইয়ের পাতা উল্টিয়ে ধারণা হয় যে বাংলা কবিতার পরবর্তী যুগান্তর এখনো কালের গর্ভে নিহিত। এটা নিরাশার কথা নয়, কেননা সৃষ্টিমাত্রেই সময়-সাপেক্ষ, বিশেষত শিল্পকলার বিবর্তনে কালের দুর্জ্ঞেয় প্রভাব অমোঘভাবে কাজ ক'রে থাকে। আপাতত কোনো-কোনো নতুন কবি কলাকৌশলে নৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছেন, বৈচিত্র্যেরও আস্বাদ পাই মাঝে-মাঝে, বিরল কোনো মুহূর্তে একটি সুন্দর, উৎকণ্ঠিযোগ্য কবিতা। যেটা পাওয়া যায় না সেটা কোনো স্পর্শসহ বস্তু, পাওয়া যায় না-পংক্তির ফাঁকে-ফাঁকে না-বলা এবং অনির্বচনীয় সংবাদ—কিংবা, এটাকে যদি খুব বেশি মনে হয়, রচনায় কোনো অনুরণন পাওয়া যায় না। এই ত্রুটিটা কবির চিত্তবৃত্তিরই নিঃসাড়, কিন্তু

কার মধ্যে তার সম্ভাবনা আছে বা নেই তা প্রাথমিক অবস্থায় বলা যায় না : এবং শিক্ষা, সংযম ও ভাবনার দ্বারা যা উপার্জনীয় তার সবটুকু উপার্জন ক'রে নিতে যিনি পণ করবেন, শুধু তাঁরই অধিকার জন্মাবে অনুপার্জিত, প্রদত্ত অমৃতে।

• • • •

বিশ্বকবিতায় দুটি উল্লেখযোগ্য শতবার্ষিকী এই বছরে পড়েছে : 'লীভস অব গ্রাস'-এর প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৮৫৫, এবং ঐ বছরই বেলজিয়মে এমিল ভেরহারেন (Émile Verharen) জন্মেছিলেন। এই সমাপতন আকস্মিক ব'লেও এ-দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধসূত্র খুঁজে পাওয়া সহজ ; যেমন হুইটম্যান ছিলেন নতুন পৃথিবীর প্রবক্তা, তেমনি, আমাদের নিয়তিময় বিশ শতক যখন সদ্যোজাত, তখন এই নতুন কাল যাঁর কণ্ঠে বাণী পেয়েছিলো, তিনি ভেরহারেন। নতুন কাল বলতে যন্ত্রনির্ভর, দ্রুত, সক্ষম, উপায়নিপুণ আধুনিক সভ্যতাকে বোঝাতে চাই, যার জন্ম ইওরোপে, বিস্তার আমেরিকায়, এবং প্রচলন সমগ্র পৃথিবীতে। এই কাল হুইটম্যানের অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিলো না—এক শতক আগেও মার্কিন মহাদেশ ছিলো আয়মান এবং অপরিণত—কিন্তু এই কালেরই বন্দনা তিনি ক'রে গেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী আমেরিকার কবিরা ছিলেন 'ঔপনিবেশিক', পরিত্যক্ত মাতৃভূমির স্মৃতি তখনো তাঁরা ভুলতে পারেননি, সাহিত্যিক অনুষঙ্গের জন্যও তাকিয়ে থাকতেন আটলান্টিকের পরপারে—বিশেষত ইংলণ্ডের দিকে, যে-দেশের উনিশ-শতকী কাব্যের ধারা অত্যন্ত বেশি উজ্জ্বল নয়। হুইটম্যান এলেন প্রথম আমেরিকার কবি, এবং আমেরিকার প্রথম বিশ্বকবি : ইংলণ্ডে যখন মহারানীর এবং টেনিসনের স্বর্ণযুগ, সেই সময়ে শান্ত-তাজা দুর্দান্ত গদ্যছন্দে তিনি উচ্চারণ করলেন আমেরিকার মাটি, শহর, অরণ্য, নদী আর মানুষের হৃদয় থেকে উত্থিত এমন একটি বাণী, যা বিশ্বমানবের অবধানযোগ্য। এডগার অ্যালন পো-র কথা তুলে বাড়ি না ; 'লীভস অব গ্রাস'-এর প্রকাশের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো, কিন্তু ফরাসি কাব্যে তাঁর প্রতিপত্তি আরো পরের কথা, আর সেই প্রতিপত্তিও—হুইটম্যানের তুলনায়—সীমাবদ্ধ। পো-র মধ্যে প্রথমে বোদলেয়ার ও পরে মালার্মে কী পেয়েছিলেন তা আমাদের

পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব নয়, কিন্তু যাঁরা শুধু ইংরেজি ভাষার ঐতিহ্যের মধ্যে শো-কে জানেন, তাঁদের কাছে এই কয়খানি উদ্ধারনায় কিছু অংশে দুর্বোধ্য থেকে যাবে, সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে, দেশে-বিদেশে হুইটম্যানের কবিতা অনেক কবিরই ভালো লাগেনি এবং লাগে না, কিন্তু তিনি যে বিশ্ববীণায় একটি নতুন সুর যোজনা করেছিলেন, এ-বিষয়ে সকলেই একমত। অর্থাৎ, শো-র প্রভাব ছিলো বিশেষজ্ঞদের মধ্যে, আর সেই বিশেষজ্ঞরা এমনই প্রতিভাবান যে আমরা হাজার বার শো-কে ফেলে তাঁদেরই রচনা পড়বার জন্য উৎসাহী হ'য়ে উঠি। কিন্তু হুইটম্যান সর্বজনীন, সুদৃঢ়ভাবে মাটিতে পা রেখে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, তাঁকে বিশেষ যত্নপাতি দিয়ে অবলোকন করতে হয় না, দূর থেকেও সহজে তিনি চোখে পড়েন।

* * *

যে-পৃথিবী হুইটম্যানের স্বপ্ন ছিলো, বাস্তবে তার সম্ভাবনা দেখা দিলো উনিশ শতকের প্রৌঢ়তার সময়ে, প্রথমে ইংরোপে। এই নতুন কালকে নিয়ে কী করবেন, তা ভেবে বিবিধভাবে বিচলিত হ'য়ে পড়লেন কবিরা। কেমন ক'রে খ্রীস্টান ধর্মের সঙ্গে এর সংগতি সাধন করা যায়, টেনিসনের কাছে—অংশত ব্রাউনিঙের কাছেও এই সমস্যাটা বড়ো হ'য়ে উঠলো। কারো ভিক্টর উগো সরল এবং তরল উচ্ছ্বাসে অভ্যর্থনা জানালেন, শু তিনী আশঙ্কার সুরে বললেন—না জানি এই রেলগাড়ি নামক দানব কোন প্রলয়ের পথে টেনে নেবে মানুষকে! একদিকে জয়ধ্বনির দামামা, আর একদিকে নৈরাশ্য; একদিকে পাণ্ডুর অবিশ্বাস, অন্যদিকে আপোশের চেষ্টা: এই সব রকম সংকট এড়িয়ে হুইটম্যান সহজভাবে মিলতে পেরেছিলেন নবযুগের সঙ্গে, তাকে মূর্ত ক'রে তুলতে পেরেছিলেন তাঁর কবিতায়। বিজ্ঞান ভালো না মন্দ, আধুনিক জ্ঞান ধর্মসাধনার অন্তরায় কিনা, এ নিয়ে তিনি টেনিসনের মতো বিতর্ক করেননি; তিনি শুনতে পেয়েছিলেন এই নতুন কালের হৃৎস্পন্দন, তাকে সত্য ব'লে অনুভব করেছিলেন, আর সেই অনুভূতির মধ্যেই কাব্যের প্রেরণা পেয়েছিলেন। এইজন্যেই তাঁর কবিতার প্রধান গুণ প্রত্যক্ষতা, কোথাও তার এতটুকু কুণ্ঠা নেই, সংক্রামক স্বাস্থ্য নিয়ে তারা সামনে এসে দাঁড়ায়, পাঠকের সঙ্গে তাদের দূরত্ব হ'তে মুহূর্তকাল দেরি হয় না। এই গুণ লক্ষ্য

ক'রে কেউ-কেউ তাঁকে প্রথম বিশ-শতকের পরম কবি ব'লে অভিহিত করেছেন।

* * * *

অথচ এই আবেগদীপ্ত আনন্দের পথ তাঁর পক্ষে নির্বিঘ্ন ছিলো না। ভেরহারেন ফরাসি ভাষার কবি, কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন ওলন্দাজ; এবং তাঁর কাব্যের বর্ণবিলাসে ও চিত্রনির্মাণে তিনি সহজেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি রেমব্রাণ্ট ও ভেরমেল-এর আত্মীয়। তবু, ফ্লেমিশ পল্লীজীবনের বৎসলতা এবং ওলন্দাজের জীবনপ্রীতি—এই উভয় উত্তরাধিকার সত্ত্বেও শতাব্দির সাহিত্যিক ব্যাধি তিনি একেবারে এড়িয়ে যেতে পারলেন না; তাঁর মধ্য-যৌবনের রচনা ('সন্ধ্যা', 'ধ্বংস' ও 'কালো মশাল' নামের তিন খণ্ডের নাটক) বিমর্ষতায় পরিপ্লুত, এমনকি উন্মত্ততার লক্ষণাক্রান্ত। এই সময়ে যেন জীবনের সমগ্রতা উপলব্ধি করার জন্য একান্তভাবে দুঃখেরই অনুশীলন করেছিলেন তিনি, কিন্তু মেঘ কেটে গিয়ে আলো দেখা দিলেও দেরি হ'লো না। বিবাহ করলেন, বিবাহে সুখী হলেন; পত্নীকে উৎসর্গিত তিনটি গ্রন্থের শিরোনামায় যাওয়াট তাঁর হার্দ্য পরিবর্তন বোঝা যাবে। পর-পর লিখলেন 'উজ্জ্বল প্রহর', 'অপরাহ্ণ', 'গোধূলি'। এর পর পুনরায় যেন আতঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন, যখন দেখলেন সদ্যোজাত যন্ত্রযুগ বেলজিয়মের মনোহর পল্লী-প্রান্তরগুলিকে ধ্বস্ত ক'রে দিচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবর্ধমান নগরও তাঁকে মুগ্ধ করলো; নগরের মধ্যে মানবিক উদ্যমের যে তীব্র ও সংহত রূপ দেখতে পাওয়া যায়, শ্রদ্ধার সঙ্গে যখনই তাকে স্বীকার ক'রে নিলেন, তখনই তাঁর কাব্যের মধ্যে নতুন স্পন্দন জেগে উঠলো। তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় কবিতাবলীতে তিনি রটনা করেছেন আধুনিক, নগরবাসী, পরিশ্রমী মানুষের সম্মান, তার জয়ের বার্তা ঘোষণা করেছেন। তাঁর এই সময়কার গ্রন্থাবলীর নাম: 'জীবনের আনন', 'দুরন্ত ক্ষমতা', 'বহুমুখী দীপ্তি', 'পরম ছন্দ'। ভাবতে একটু অবাক লাগে যে সমকালীন ইংরেজি ভাষার কবিতায় এই রকমের উৎসাহের সুর শুনতে পাওয়া যায় একমাত্র রাডিয়ার্ড কিপলিং-এ, যে-কিপলিং কবিদের মধ্যে নগণ্য এবং সাম্রাজ্য-মদে কলুষিত। কিন্তু ভেরহারেন যে-ভাষায় লিখেছিলেন সে-ভাষায়, তাঁরই অব্যবহিত পূর্বে, জন্ম নিয়েছিলেন নগরজীবনের প্রথম কবি, প্রথম আধুনিক কবি: শার্ল

বোদলেয়ার। উনিশ শতকের প্রথম ভাগের ইওরোপীয় কবিতা যদি ইংলণ্ডের হয়, শেষ ভাগের কবিতা মানেই ফ্রান্সের।

• • • •

ভেরহারেন যার বন্দনা করেছিলেন সেই যন্ত্রই তাঁকে সংহার করেছিলো: ট্রেনের সংঘাতে মৃত্যু হয়েছিলো তাঁর। এই ঘটনার সূত্রে বিতোপদেশে প্রবৃত্ত হবো না আমরা: এমন কথাও বলবো না যে যন্ত্রের যে-সব বিভীষিকাময় রূপ আমরা সম্প্রতি দেখেছি, তাতে এই কবির কাব্যগত মূল্য তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে। মানুষ তার দুর্বুদ্ধিবশত যা ঘটায় তার জন্য মনোহীন যন্ত্রকে দায়ী করাটা ছেলেমানুষি। উপরন্তু এ-কথাও বিবেচ্য যে আলো আর অন্ধকার যেমন অবিচ্ছেদ্য, তেমনি শৈতান মানুষের মঙ্গলসাধনা আর প্রলয়সিদ্ধিও পরস্পরের পরিপূরক কিনা। অন্তত এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ও-দুই বস্তু একই প্রবলতার বিভিন্ন বিচ্ছুরণ; এবং আমেরিকা আবিষ্কার থেকে অণুশক্তির বিদারণ পর্যন্ত তারা পৃথিবীর ইতিহাসে ভালো-মন্দ যা-কিছু করেছে তার মূলে আছে হিংস্র, উজ্জ্বল, শান্তিহীন উদ্ভবের ক্ষমতা। হুইটম্যানের মতোই, ভেরহারেন এই উদ্ভবের, উৎসাহের চারণ; হুইটম্যানের মতোই, ভবিষ্যতের দিগন্তে তিনি দেখেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সমন্বয়, এক সমৃদ্ধ, বিজিত, উদার এবং উন্মুক্ত পৃথিবী। দুই কবির মধ্যে এই সাদৃশ্য 'যকের' সম্বন্ধপ্রসূত; ভেরহারেন-এর উপর কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাবের প্রমাণ নেই; সম্ভবত তিনি 'লীভস অব গ্রাস'-এর নামও শোনেননি। কিন্তু তিনিও উত্তরজীবনে ক্লান্তিকর আদেশকুণ্ঠ জীবন পরিহার ক'রে বন্ধুছন্দকে বরণ করেছিলেন, আর তাঁর বলীয়ান বাচনভঙ্গিও হুইটম্যানের সঙ্গে তুলনীয়। তুলনীয়, কিন্তু অনুরূপ নয়, দু-জনের প্রতিতুলনারও প্রচুর অবকাশ আছে। এই সংখ্যায় আমরা যে-ক'টি অনুবাদের আয়োজন করেছি, তাতে আশা করি পাঠকের ধারণা হবে যে ভেরহারেন প্রবলতার প্রতিনিধি হ'লেও তাঁর কবিতা চিত্রলতা, গভীরতা ও দৌষম্যগুণেও অসাধারণ। তা যদি না হ'তো, তাহ'লে রাইনার মারিয়া রিলকের মতো ধ্যানী কবি তাঁর গুরুদলের মধ্যে গণ্য হতেন না।

• • •

'কবিতা'র আমরা সাধারণত কথাসাহিত্যের আলোচনা করি না ; কিন্তু টমাস মান্-এর মৃত্যুর বিষয়ে উল্লেখ না-করলে বিশ্বমানবিক সত্তাটাকেই অবজ্ঞা করা হয়। তাঁকে বলা যায় ইওরোপীয় কলাসিদ্ধির 'মহৎ ঐতিহ্যে'র সর্বশেষ প্রতিনিধি ; গ্যেটের পর জর্মন আত্মার অবিকল বাণীমূর্তি ; টলস্টয়ের পরে পাশ্চাত্যভূমির মহত্তম গল্পলেখক। উপরন্তু, আমাদের মনোযোগের উপর অন্য একটি কারণে দাবি আছে তাঁর : তাঁর গল্প-উপন্যাস বিশেষভাবে কবিদের পাঠ্য ও আলোচ্য। আধুনিক জগতে কবিতা আর কথাসাহিত্য যেন বিপরীত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ; এমন কবির কথাও আমরা শুনেছি যাঁরা উপন্যাস-পাঠে স্বভাবতপেই অক্ষম ; এবং এ-দুয়ের বিষমতার আরো নজির দাঁড়িয়ে যায়, যখন কোনো কবি উপন্যাস লেখেন বা ঔপন্যাসিক কবিতা। তবু এ-কথাও সত্য যে আধুনিক সময়েও কাব্যের প্রভাব কথকতায় যেমন বিস্তীর্ণ, তেমনি কবিরাও অনেক সময় উপন্যাসের সুর পেয়ে থাকেন ; মেলভিল থেকে কাফকা পর্যন্ত যত ঔপন্যাসিকের কথা আমরা জানি, যাঁরা আধুনিক কবিদের সখ্যী এবং সংকারী। যাকে বলা হয় সামাজিক উপন্যাস, যার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ডিকেন্স-এর লেখায় দেখতে পাই, যার নির্ভর মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধে, তার আবেদন কবিদের পক্ষে ক্ষীণ হ'তে পারে, কিংবা তা হ'তে পারে অবকাশের উপাদান, ক্লান্ত মস্তিষ্কের বিনোদনের একটি উপায়। কিন্তু যে-উপন্যাসের উপজীব্য মানুষের—সামাজিক নয়, আধ্যাত্মিক জীবন, মানুষের সঙ্গে বিশ্বের অথবা বিশ্বস্রষ্টার সম্বন্ধ, যে-উপন্যাস তার প্রচ্ছন্ন অর্থের চাপে রূপক বা রূপকথার মতো হ'য়ে ওঠে, ক্ষীণ কোনো কাহিনীর সূত্রকে মানবাত্মার শাশ্বত বেদনার আধার ক'রে তোলে, তার কাছে কবিদেরও প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়াতে হয়, কেননা সেখানে তাঁরা দেখতে পান তাঁদেরই সহযোগী, প্রতিযোগী এবং যন্ত্রদাতাকে। আর এইরকম ভাবগম্ভীর উপন্যাস আধুনিক যুগে যাঁরা লিখেছেন—প্রুস্ত, কনরাড, লরেন্স, উলফ, জয়স, জীদ, কাফকা—টমাস মান্ তাঁদেরই সগোত্র, শুধু সগোত্র নন, কোনো-কোনো বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য। বিশ শতকের প্রথম অর্ধেকের কথাসাহিত্যে পরম কলাসিদ্ধির উদাহরণ যদি খুঁজতে হয়, তাহ'লে

—প্রুস্ত আর জয়স-এর মহাকাব্য বাদ দিলে—তৎক্ষণাৎ আমাদের মনে পড়বে 'মায়াবী পাহাড়', 'ডক্টর ফস্টাস', 'জোসেফ'-গ্রন্থাবলী মনে পড়বে 'ভেনিসে মৃত্যু', টোনিও ক্রোগার', 'ফেলিক্স কুল'। সমকালীন সাহিত্যে তাদের সঙ্গে তুলনীয় কিছুই নেই; এদের কোনো পাঁড়িপাল্লায় চড়াতে হ'লে অন্য দিকে আমরা রাখতে পারি শুধু গোটের আর টলস্টয়ের রচনাবলী।

জীবনে কখনো-কখনো এমন মুহূর্ত আসে যখন আমরা সাহিত্য নামক পদার্থের একটি অখণ্ড সত্তা অনুভব করি; মনে হয়, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, প্রভৃতি বিভাগগুলি দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হ'লেও রসবোধের উচ্চতম মুহূর্তে অর্থহীন, এই ভিন্ন-ভিন্ন নামকরণের দ্বারা মানুষের মন-গড়া এবং সুবিধাজনক একটা ব্যবস্থামাত্র সূচিত হচ্ছে: মনে হয় এদের মধ্যে বিনিময় সম্ভব, সংমিশ্রণ সম্ভব, প্রতিভার কোনো এক বিস্ময়কর ভরসঙ্কেতে সব ভেদরেখা মুছে যেতে পারে। মান্-এর উপন্যাসপাঠের অন্যতম উপার্জন এই অখণ্ডতাবোধ। 'দি ম্যাজিক মাউন্টেন'-এর মতো উপন্যাস প'ড়ে উঠে কী বলতে পারি আমরা, কী বলতে পারি 'ডেথ ইন ভেনিস' বা 'টোনিও ক্রোগার'-এর মতো গল্প প'ড়ে? এরা কী? মহাকাব্য? গীতিকাব্য? রূপকথা? সঙ্গীত? স্থাপত্যকর্ম? তথ্য হিশেবে জানি যে এরা গদ্য ভাষায় লেখা উপন্যাস, কিন্তু প্লট কোথায়? ঘটনা কোথায়? পাত্র-পাত্রীর মধ্যে সামাজিক ব্যবহার অথবা স্বার্থের সংঘাত কোথায়? আর কোথায়ই বা সেই দৈবের হাত, সেই অমোঘ নাটকীয় নিয়তি, যার সাহায্যে সফোক্লিস থেকে টমাস হার্ডি পর্যন্ত বহু লেখক তাঁদের ঘটনাজালের গ্রন্থিমোচন করেছেন? উল্লিখিত তিনটি রচনায় বহু বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছে, কিন্তু কোনো-এক অর্থে তিনটিকেই প্রেমের কাহিনী বললে ভুল হয় না: ('দি ম্যাজিক মাউন্টেন'-এর বিরাট জটিল অর্কেস্ট্রার মধ্যেও কেন্দ্রস্থলে কাজ ক'রে যাচ্ছে প্রেম)—কিন্তু আমাদের অভ্যস্ত কোনো অর্থে প্রেমের কাহিনী নয় এরা, কেননা যে-দু'জন মানুষকে অবলম্বন ক'রে

প্রেমের জন্ম ও পরিণতি, যান্ তাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ বেশি ঘটাননি, বাক্যালাপ প্রায় নিষিদ্ধ ক'রে রেখেছেন। 'দি ম্যাজিক মাউন্টেন'-এর বিপুল অবয়বের মধ্যে 'নায়ক-নায়িকা' (এই পরিভাষাও এখানে অসংগত মনে হয়) পরস্পরের সম্মুখীন হ'য়ে কথা বলেছে মাত্র একবার—চুম্বক কথা, দু-চার মিনিটের আলাপ, তাও কয়াশি ভাষায়, সেটা তাদের উত্তরের পক্ষেই পরভাষা, এবং দু-জনের মধ্যে একমাত্র সামান্য ভাষা। এ ছাড়া দু-জনের মধ্যে আর যা 'ঘটেছে' তা শুধু চোখে-চোখে দেখা—এবং মনে-মনে ভাষা—তাও শুধু তর্মন যুবকটিরই কিছু খেকে, কেননা রহস্যময়ী বহুচারিণী কুশ শ্যাম মহিলাটির মনের কথা আমাদের কিছুই জানতে দেয়া হয়নি। এই চোখ দিয়ে দেখা, অবলোকন, নিরীক্ষণ—এটাই 'ডেথ ইন ভেনিসে' সর্বস্ব, এবং উপরন্তু, তার 'নায়িকা' একটি রূপবান কিশোর, আর 'নায়ক' একজন প্রসিদ্ধ, মধ্যবয়সী সাহিত্যিক। এই অবতারী উপাখ্যান নিয়েই গ'ড়ে উঠেছে মর্মান্তিক, আত্মঘাতী এই কাহিনী, যেখানে, প্রায় অপ্রকৃতিস্থতার উর্ধ্বে উত্তীর্ণ হ'য়েও গুস্তাভ আশেনবাখ কদাচ আমাদের শ্রদ্ধা বা অনুকম্পা হারান না, বিকৃত কামনার বশবর্তী হ'য়েও সকল মলিনতার ঊর্ধ্বে উজ্জ্বল হ'য়ে বিরাজ করেন। তেমনি, 'লটে ইন ভাইমার'-এও বাল্যসখী শার্লটে যখন গ্যেটের সঙ্গে আর-একবার দেখা করতে এলেন, তখন গ্যেটে রীতিমতো বয়োবৃদ্ধ এবং বিগতস্পৃহ, আর লটের বয়সও ষাটের পরপারে। জোকের সভায় বহু লোকের সমক্ষে একবার মাত্র দেখা হ'লো, আর তারপর—গ্যেটেরই আয়োজনের ফলে—নিভৃতে একবার। গ্রন্থের সেই প্রচণ্ড উপসংহারে গ্যেটে কবির মতো ধীরে-ধীরে কয়েকটি কথা বললেন, আর তারপর লেখকের আর কিছুই বলবার থাকলো না, পাঠকের আর কিছুই টীকে করার থাকলো না। কোনো গ্রন্থেই কিছু 'ঘটে' না; মিলন নেই, বিরহ নেই, আশা বা হতাশাও নেই; তবু আমরা আদি রিপুর পূর্ণ তীব্রতা অনুভব করি; পাত্র-পাত্রী বৃদ্ধ, তবু অনুভব করি; বাসনার লক্ষ্য একজন বালক, তবু অনুভব করি। এই সংবাগ যেন ছত্রে-ছত্রে পরিকীর্ণ, পংক্তি ছাপিয়ে উপচে পড়ছে; ঘরের বর্ণনায়, দৃশ্যের বর্ণনায়, অবান্তর প্রসঙ্গে (যদিও আসলে কিছুই অবান্তর নয়), এমনকি বিশ্বের বাহ্যতীয় সমস্যায় গুরুতর

আলোচনার মধ্যেও সেই আগুন মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে বিদ্যুতের মতো জ্ব'লে যাচ্ছে। যেন প্রেম নামক বস্তুটাকে মানুষ তার সারাৎসারে পরিণত ক'রে নিয়েছেন—কত বয়স, নারী না পুরুষ, তাতে কিছুই এসে যায় না আর, তার অনুভূতিটাই সব, তা যেন বিশ্বব্যাপী এক অমর হৃৎপিণ্ডের মতো ধ্বনিত হচ্ছে বহুবিচিত্র পরিচ্ছদের অন্তরালে। এইজন্যই এ-সব গ্রন্থকে কাব্য ব'লে চিহ্নিত করতে ইচ্ছে করে; এর উপাদান সামাজিক আচার-ব্যবহার নয়, মানুষের মনের আদিম ভাবমণ্ডল, কবির সেই নীহারিকাময় জগৎ, যা থেকে বহু ধৈর্যের ফলে ধীরে এক-একটি কবিতার নক্ষত্রবিন্দু উদ্গত হ'য়ে থাকে। এ-সব গ্রন্থ আধুনিক যুগের নূতন পুরাণের উদাহরণ।

যাকে 'সুখপাঠ্য' বলে, মান্‌ত্য কখনোই নয়। শ্রেষ্ঠ জর্মন মানসের প্রতিভূ তিনি, বিস্তীর্ণতলে গুরুভার, ক্লান্তিহীনতলে গম্ভীর, নির্ভীকভাবে ক্লান্তিকর। তাঁর গ্রন্থের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়েই অনেক বলবান্ পাঠকও শিথু হ'তে পারেন; পাতায় পর পাতা পাথরের মতো নীরন্ধ্র, তার মধ্যে সংলাপের সোপানপংক্তি কদাচ চোখে পড়ে, অনুচ্ছেদের বিরাম বেশি পাওয়া যায় না, অবিচ্ছেদী আখ্যান আর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার চাপে পাত্র-পাত্রীর নামের উল্লেখ পর্যন্ত বিরল। আকার সুদীর্ঘ, এবং ছোটো উপন্যাস বা ছোটোগল্পও—অধিকাংশ ক্ষেত্রে—একটি রকম গুরুভার-দ্বারা আক্রান্ত। যে-সাহসী (এবং মেধাবী) পাঠক এতৎসত্ত্বেও যাত্রা শুরু করবেন, তিনি অবিলম্বেই এক বিশাল, বন্ধুর, বিচিত্র-দৃশ্যময় আয়োজনের মধ্যে দেখতে পাবেন নিজেকে, যেখানে মানুষের কামনা ও ভাবনা, সাধনা ও স্বপ্ন দলে-দলে বস্তু নগ্নতায় উদ্ঘাটিত, যেখানে দূরপ্রসারী বহুমুখী উল্লেষের রাশি প্রতিটি বস্তুকে তৃতীয় আয়তন দান ক'রে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তুলছে, পৃথিবীর সমগ্র ভূগোল যেখানে দৃশ্যমান, এবং সোনার পাথার স্পন্দন থেকে নক্ষত্রের কিরিয়ণ পর্যন্ত মহাবিশ্ব বিধৃত হ'য়ে রয়েছে, আর যেখানে দর্শন, গণিত, সংগীত, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, উপকথা—মানব-চিত্তের যা-কিছু নিঃসরণ, মানব-সভ্যতার যা-কিছু সম্পদ, সেই প্রত্যেকটি বিষয়কে বনস্পতির মতো জড়িয়ে-জড়িয়ে বেড়ে উঠছে কূট বিতর্কের

মৃত্যু-তত্ত্ব, জটিল চিন্তার উর্ণাজাল। সহজ হবে না সেই যাত্রা, কিছুক্ষণ পরে-পরেই হাঁপ ধরবে, বিশ্রাম নিতে হবে; এই এক আশ্চর্য জগৎ—যার অধিবাসীরা 'আলাপ' করে না, দীর্ঘ অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদে অনর্গল জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ক'রে যায়, তারপর তার যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তরও পরিপাক করে, যার প্রতিটি তথ্য বিশ্বকোষের বিস্তার ও যাথার্থ্য এবং ভাস্কর্যের প্রত্যক্ষতা নিয়ে উপস্থিত, এবং যার তথ্যাবলী পরস্পরের অন্তঃপ্রবিষ্ট হ'য়ে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মতোই এক ধারাবাহিক প্রাসাদ নির্মাণ ক'রে চলেছে—এই জগতের জলবায়ুর সঙ্গে অত্যন্ত হ'তেও প্রয়োজন হবে সময়সাপেক্ষ সচেতন প্রয়াস। অথচ, এই ক্লেশ সত্ত্বেও, প্রয়াস ত্যাগ করা সম্ভব হবে না, একবার আরম্ভ করলে শেষ পর্যন্ত না-দেখে উপায় নেই। যাকে আমরা সাধারণত 'সসপেন্স' বলি, ঘটনার পরিণতি জানবার সেই আগ্রহের কোনো অবকাশ নেই এখানে; অথচ অন্য কোনো দুর্বার আকর্ষণ আছে, যা চুম্বকের মতো ধীরে-ধীরে আমাদের টেনে নিয়ে যায়; যেন এক মহান মনীষার জালেই ধরা পড়ি আমরা, ছটফট করলেও পালাবার আর উপায় থাকে না। আর যতই কাহিনী অগ্রসর হই, উপসংহার যতই নিকটবর্তী হয়, ততই আমরা মুগ্ধতায় বিহ্বল হ'য়ে পড়ি, যখন দেখি এই বিপুল মনীষিতা সত্ত্বেও পাত্র-পাত্রীরা রক্তমাংসে বাস্তব, এবং অনুভব করি এই ভূরিপরিমাণ উপাদানের মধ্যে ঐক্যের সংহতি, অভিপ্রায়ের অখণ্ডতা, তাৎপর্যের বহুমুখী হীরক-দ্যুতি। শেষ পর্যন্ত, উল্লিখিত প্রতিটি তথ্য আমাদের মনের মধ্যে প্রতীক হ'য়ে জন্ম নেয়, কাহিনীর অংশ হ'য়ে ওঠে রূপক, এবং পাত্রপাত্রীরা দেশকালের অতীত বিশ্বমানবের প্রতিভূ। যে-গল্প কাহিনী একবার পড়লে আর ভোলা যায় না, মহাভারত বা বাইবেলের গল্পের মতো জীবনের নিত্যসঙ্গী হ'য়ে ওঠে, তার উদাহরণ টলস্টয়ের পরে টমাস মান্ রেখে গেলেন।

এই মহাকবির বিষয়ে পূর্বাভাস দূরে থাক, অংশত সম্পূর্ণ আলোচনারও অবসর বা পরিসর নেই আমাদের। তাঁর রচনার মধ্যে প্রবেশ করেছে জর্মনির প্রকৃষ্টতম সাধনার ধারা; শোপেনহাওয়ার, নীটশের দর্শন, হ্যাগনারের

সংযুক্ত সংগীত, আইনস্টাইন এবং রুয়েডের যুগান্তকারী আবিষ্কার। শেষোক্ত দুজনের ভাবনা 'দি ম্যাজিক মাউন্টেন'-এর প্রধান উপাদান বলা যায়: বস্তুত, মান্-এর অনেক উপন্যাসেই কালের একটি স্পর্শসহ মূর্তি ধরা পড়েছে—পরম যাদু, অজ্ঞের যাদু এই কাল। আর মানুষের অবচেতনের ক্ষমাহীন বিশ্লেষণের ফলে আমাদের সবচেয়ে লজ্জাকর লালসাকেও তিনি গোপন থাকতে দেননি; গ্যেটের মতো তিনিও উপলব্ধি করেছেন সদসতের অন্যোন্য সম্বন্ধ, ভগবান আর শয়তানের প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা আর প্রচ্ছন্ন মিতালি। তাঁর প্রবন্ধাবলীকে বলা যায় বিভিন্ন মৌলিক সম্বন্ধ বিষয়ে গবেষণা: ভালো আর মন্দের, দেহ আর মনের সম্বন্ধ, শিল্পী আর সমাজের, শিল্প আর জীবনের সম্বন্ধ, সময় আর মহাকালের, স্থান আর মহাবিশ্বের সম্বন্ধ। মানবিক মুক্তি, তাঁর ধারণায়, একাধারে ঘূর্ণিত এবং মহিমান্বিত; বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ক্ষণিকভাবে দেখা দেয় শুধু বালক অথবা শিশুর রূপ নিয়ে: তাছাড়া আমাদের যা-কিছু আদরণীয়—প্রতিভা, নারীর রূপ, শিল্পসৃষ্টি, সামাজিক হিতৈষণা, সবই কলুষিত, ব্যাধিত, ধ্বংস-দূত, শয়তানের ষড়যন্ত্রী। তাই তাঁর রচনা একদিকে যেমন নিখিল সৌন্দর্যের স্তবগান, তেমনি অন্যদিকে আতঙ্কের শুশ্রূষাকরণে তৎপরঃ মহাভারতে যদুকুলের ধ্বংসের মতো তিনিও 'দি ম্যাজিক মাউন্টেনে' একটিমাত্র পরিচ্ছেদে এক সমগ্র সভ্যতার সর্বনাশের ছবি এঁকেছেন; 'ডক্টর ফস্টাস'-এ প্রতিপন্ন করেছেন দৈব প্রতিভার নায়কী প্রকৃতি, 'ডেথ ইন ভেনিসে' দেখিয়েছেন প্রেম আর মৃত্যুর অঙ্গাঙ্গী সংযোগ। অপেক্ষাকৃত কম-জানা গ্রন্থের মধ্যে 'দি ট্রান্সপোজড্ হেডস'-এ দেহ-মনের দ্বন্দ্বের বিবরণ দিয়েছেন, যে-বিষয়টি ফিরে এসেছে তাঁর শেষ বয়সের ছোটো উপন্যাসে, ইংরেজিতে যার নাম হয়েছে 'দি ব্ল্যাক সোয়ান'। সুখের বিষয়, মৃত্যুর আগে তাঁর যৌবনে লেখা 'ফেলিক্স ক্রুল' গল্পটি, যাকে বলেছিলেন তাঁর 'হৃদয়ের নিকটতম গল্প'—তাকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে পরিণত ক'রে গেছেন: এই স্বভাব-জোচ্চোরের বিস্ময়কর উপাখ্যানে মান্-এর বিশ্লেষণী প্রতিভা তাঁর অত্যন্ত পাঠককেও স্তম্ভিত ক'রে দেয়।

এবং তাঁর গঠনশক্তির কথা চিন্তা করলেও স্তম্ভিত হ'তে হয়। রূপকল্পের দিক থেকে, তাঁর উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয়—স্রাপত্য নয়, সিম্ফনি-সংগীত, অভিজ্ঞ সমালোচকেরা এই রকম ব'লে থাকেন। পাশ্চাত্য সংগীত আমরা কমই জানি, কিন্তু লক্ষ্য না-ক'রে উপায় নেই যে তাঁর রচনার মধ্যে পুনরুক্তি একটি বিশেষ যন্ত্র, এবং অন্তত ঘটনার উদ্ভাবন যে-কাজ করে, সেই কাজ আরো অব্যর্থভাবে সাধিত হয় বহুলাঙ্গ উল্লেখের উপায়ে। আপাতক্ষুদ্র কোনো বস্তু বা দৃশ্য—প্রথম উল্লেখে যাকে আমরা ভালো ক'রে হয়তো লক্ষ্য করিনি—তা কোনো এক সময়ে ফিরে আসে গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত হ'য়ে, যে-তাৎপর্য, শুধু সেই অংশটিকে নয়, আনুপূর্বিক সমস্ত আখ্যানটিকেই আলো ক'রে তোলে। মান্ তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায় বহুক্ষণ পর্যন্ত গোপন রাখেন; 'মারিও অ্যাণ্ড দি ম্যাজিশিয়ান' গল্পটার একেবারে শেষ পাতায় না-পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা বুঝতেই পারি না যে এই হাস্যরসোজ্জ্বল আপাতসরল কাহিনীতে মুসোলিনি-শাসিত ফাশিস্ট ইটালিকে সুতীব্র বিদ্রূপ করা হয়েছে। 'ডক্টর ফস্টাস'-এ একটি কাহিনীর মধ্যে তিনটি বৃহৎ বিষয় বিধৃত হ'য়ে রয়েছে, কিংবা লেখক একটি কাহিনীকে একই সঙ্গে তিনটি বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করেছেন: প্রথমত, ফাউস্টের পুরোনো গল্প নতুন ক'রে লিখে গ্যেটের সঙ্গে প্রকাশ্য প্রতি-যোগিতায় নেমেছেন; দ্বিতীয়ত, শিল্পপ্রতিভার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন, আর তৃতীয়ত, মূর্ত ক'রে তুলেছেন নাৎসি জর্মনির ভীষণ ইতিহাস। গ্রন্থের নায়ক আমাদের চিরচেনা ফাউস্ট, এখানে তাঁর নাম আড্রিয়ান লেভেরকুন, প্রতিভাবান গীতস্রষ্টা তিনি, আবার জর্মনি দেশটাকেও তাঁরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু একেবারে একসঙ্গেই সবটা দেখা যায় না, অতি ধীরে লেখকের সমগ্র উদ্দেশ্য উন্মোচিত হ'তে থাকে—এই সমস্ত ব্যাপারটা 'কী নিয়ে', এর শেষ না-করা পর্যন্ত ঠিকমতো ধারণাই করা যায় না। এই বহুলাঙ্গতার লক্ষণ থেকে মুক্ত, মান্-এর প্রধান গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র জোসেফ-জীবনী, কারো-কারো মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি—কিন্তু সম্পদ যেখানে অগণ্য সেখানে শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে মনস্থির করা অসম্ভব।

মান্-এর মতে শিল্পীরা দুই জাতের : কেউ দেবতা, কেউ বা সেইন্ট। 'দেবতা'র মধ্যে আছেন গ্যেটে আর টলস্টয়, দীর্ঘজীবী, অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী, ভোগে বিলাসে বহুল অভিজ্ঞতার পূর্ণায়ু মানুষ। 'সেইন্ট'-এর উদাহরণ শিলার আর ডস্টয়েভস্কি—রুগ্ন, দারিদ্র্যপীড়িত, মহাপ্রাণ, শিল্পের শহীদ। উদাহরণ বাড়িয়ে যেতে পারি আমরা : দেবতার দলে রবীন্দ্রনাথ, বর্নার্ড শ (অন্তত তাঁর প্রথম-পত্রাবলীর মজিতে), গ্যেটে : সেইন্টের দলে বোদলেয়ার, রিলকে, লরেন্স। আর মান নিজে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে মুহূর্তকাল ভাবতে হয় না। ব্যাধির বিষয়ে তাঁর প্রবল আসক্তির কথা জানি আমরা : 'দি ম্যাজিক মাউন্টেন'-এ সমগ্র ঘটনাস্থল যক্ষ্মার চিকিৎসালয়, নারী ব্যাধিত ব'লেই মোহিনী, পরিবেশ অপ্রকৃতিস্থ ব'লেই দুর্বার আকর্ষণে ভরা। 'ডক্টর ফস্টাস'-এ নায়কের দেহে শয়তান প্রবেশ করলে উপদংশরোগের রূপ নিয়ে; 'দি ব্ল্যাক সোয়ান'-এ বর্ষীয়সীর আকস্মিক নবযৌবন শেষ পর্যন্ত মারাত্মক রোগ ব'লে ধরা পড়লো : 'ডেথ ইন ভেনিসে' প্রেমের উন্মাদনার শেষ পরিণতি ঘটলো কলেরার মহামারীতে। এই সমস্তই আছে, কিন্তু এই সমস্তর ঊর্ধ্বে আছেন টমাস মান্। নির্ভীক দ্রষ্টা তিনি, বিষয়ের নির্মম অধিকর্তা, আর যদিও তাঁর পাত্রপাত্রীর মধ্যে একজনেরও লেভিন বা বা বাটাশার 'স্বাস্থ্য' নেই, তবু ডস্টয়েভস্কির দুঃসহ অস্থিরতাও তাঁর রচনাকে স্পর্শ করেনি। 'দি ব্রাদার্স কারামাজভ'-এর লেখক নিজেই তাঁর পাত্র-পাত্রীর ব্যাধির মধ্যে লিপ্ত হ'য়ে আছেন, কিন্তু মান্কে বলা যায় তাঁর কুশীলবের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষক—বিজ্ঞানী যে-ভাবে শবব্যবচ্ছেদ করেন, কঙ্কাল অধ্যয়ন করেন, তাঁর রচনার প্রক্রিয়া ঠিক সেই রকম। উপরন্তু স্মর্তব্য যে টলস্টয় তাঁর বিখ্যাত 'স্বাস্থ্য' সত্ত্বেও 'ইভান ইলীচের মৃত্যু' নামিক পাতালস্পর্শী গল্প লিখেছিলেন, এবং তাঁর উপন্যাসে মৃত্যু, হত্যা, আত্মহত্যার অভাব নেই। কিন্তু টলস্টয়ের মতোই, মান্কে শেষ পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টির চেয়েও মহৎ ব'লে মনে হয় (যা ডস্টয়েভস্কি বা কাফকাকে কখনো হয় না)—তাঁর রচনাবলী পাঠ করার পরে আমরা যেন তাঁকে দেখতে পাই দূরে কোনো সর্বদর্শী নক্ষত্রের মতো শান্ত হ'য়ে আছেন। অ-'ধার্মিক' টলস্টয়ের মতো, মান্ যা দেখতে পান তাতে অংশ নেন না, : তাঁর আসন দেবতার মণ্ডলে।

সনেটগুচ্ছ

বুদ্ধদেব বসু

কেন ?

এতে নয় জড়িত জনগণের বিরাট নিয়তি—
অভ্যুদয়, পতন, পণ্য, সেবা, স্বাধীনতা। কোনো
ছাত নেই ইতিহাসে। অর্থ আর ঘোড়ের প্রগতি
আনেননি রাষ্ট্রনীতি, তাজিল, সাকো। তবে কেন—কেন ?

ব্যর্থ কাম, ক্রোধের তৃপ্তির জন্য ? প্রতিহিংসার
ছদ্মবেশ ? বিকল অহমিকার কুটিল চাতুরী ?
না কি শুধু—অন্য কিছু নেই ব'লে—এই ছলে কালের প্রহার
ভুলে থাকা ?···কেন, বলো ! এই প্রশ্ন—মনে হয়—মৌলিক, জরুরি।

কিন্তু কোনো উত্তর কোথাও নেই। সবচেয়ে ক্ষয়
কবির অলঙ্কময় উচ্চারণে, যেন সে নিজেরে কোনোদিন
শুধায়নি উদ্দেশ্য, কারণসূত্র, উৎসর্গের নিশ্চিত নিশ্চয় ;

শুধু, কোনো অচিকিৎস্য জরণের ব্যাধির অধীন—
যতক্ষণ পৃথিবী চলার মতো—সে গেছে ঘোরের মতো জ্ব'লে,
আপনারে আলো দিয়ে, লাভহীন, প্রাচীন অনলে।

কবি : তার ক্ষমতার প্রতি

তুমি, যে দিয়েছো সব, সেই তুমি আমার পথের
দুই দিকে ছড়িয়ে রেখেছো কত রঙিন কানন—
বিক্ষেপ, জয়ের নেশা, ত্যাগের চটুল প্রলোভন :
বাস্তবিটা কোথাও ছোটোনি আজো ; শুধু হেয়ফের,

ভ্রমণ, রাত্রিবাস, পাহাড়ালে নতুন শপথ,
আঙিনায় ফলপুষ্প। এইমতো, নিজেরে খণ্ডন ক'রে,
হেমন্তেরে দূরে ঠেলে অবিরল বসন্তবাতাসে
দিয়েছো বিস্তীর্ণ ফাঁকি। আমার প্রকোষ্ঠে তুমি অতীব দুরন্ত।

এখন, মধ্যপথে, এখনো কি আসেনি সময়?
পারি না কি তোমারে ছাড়িয়ে যেতে, যেখানে মলয়
ম'রে যায় বয়সের ষড়যন্ত্রে—সেই গর্ভে সারাৎসার ঢেলে

ক্ষীণ, ছোটো, প্রজ্ঞান, দুর্বল হ'য়ে, যদি কোনো দূরতর মেঘে
কাটিয়ে কঠিন রাত্রি, একদিন বীজের আবেগে
ফ'লে উঠি নিটোল, উজ্জ্বল, পূর্ণ একটি আপেলে!

সনাতন সংঘর্ষ

বাসনা অপরিসীম, কিন্তু কত দুর্বল ইন্দ্রিয়!
হ'য়ে থাকি বধির, যতক্ষণ চক্ষু প্রত্যাশ;
পদ্মরাগ চুম্বনে হারিয়ে যায়; দৃষ্টিহীন কণ্ঠ করে গান
মদের সোনায় কান্তি। অসম্ভব, সম্ভোগে দ্বিতীয়।

বলেছিলো স্নেহনো-এক লিপ্সায় বিবশ প্রেমিক:
'সে আমারে সর্বস্ব বিলিয়েছিলো—রস, ফুল, ঝংকার, চন্দন;
কিন্তু আমি, সনাতন সংঘর্ষে হতাশ হ'য়ে, চেয়েছি একটি নিঃসরণ
স্নেহে নিতে—দেহময়, দেহচ্যুত অ্যাযুক্তির চকল নিরিখ—

অর্থাৎ গলার স্বর। কারে বলে পাওয়া, তা জেনেছি
আঁধারে, দুধের ঘোরে, রক্তের কেবিল চ্যাচামেচি
শান্ত হ'লে—সে যখন ডেকেছে আমার নাম অমল নিঃস্বনে,

আর সেই মুহূর্তের স্নেহের তন্ময়, হৃৎপিণ্ডের অতল গহ্বর
হয়েছে প্রণয়ময়—যেন কোনো পথিকের প্রতীক্ষার সার্থক প্রহর
সমস্ত দুপুর ক'রে ডুবে গেলো দূর টেলিফোনে।'

'দুই পাখি'

যখন রাত্রি নামে—নয়, যাকে লোকে বলে রাত,
কিন্তু নক্ত, নিশীথিনী, শর্বরী, যামিনী, বিভাবরী—
ডুবে যায় যান, গান, দোকানের বৈদ্যুতিক গাগরি,
লাল-চোখ ল্যাম্পোস্টের পাহারায় গভীর কুটপাত

প'ড়ে থাকে, মুছে-ফেলা শান্ত স্লেট, নির্মল বিবেকমান
নিষণ্ণ রিকশাওলা—আর সেই নির্বাণের অবসর বেলায়
ফুরায় লেখক, ছাত্র, দলপতির অধ্যবসায় :—
তখন, ঋষির মতো, আঁধারের স্বাধীন সন্তান,

বিড়াল বেরিয়ে আসে—হিংস্র, মৃদু, গম্ভীর, সুদূর :
যেন অন্ত গুপ্ত কাম ললাটের ছুটন্ত ত্রিশূলে
বিঁধে নিয়ে, চ'লে যায় সহনীয় সংসার ছাড়িয়ে :

আর তৃপ্ত, নিরাপদ, সমাদৃত আমার কুকুর
চেয়ে থাকে তার দিকে, বারান্দার রেলিঙে পা তুলে,
অক্ষুণ্ণ শিল্পীর প্রতি গৃহস্থের ঈর্ষা চোখে নিয়ে।

মিল ও ছন্দ

যাবি, এক অন্তর্যামী মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নিয়ে
ক'রে দেয় আপন গোপন অর্থে সব উন্মীলন ;
ছিঁড়ে ফেলে প্রথম প্রেমের চিঠি : বিরহ, মিলন,
আশা, জীবনের আকাঙ্ক্ষায়ে কৌশলে ছিনিয়ে

তাকে যে-নূতন গানে সেখানে জীবন ব'য়ে যায়।
যানি—কিন্তু জানি না, দেখিনি তারে। অন্তরঙ্গ, সবচেয়ে দূর,
কিছুই বলে না, শুধু ভেঙ্গে ক'য়ে যেন ওঠে সুর—
সুর নয়, শূন্যতায় তার বেঁধে নিঃশব্দে বাজায়

দেবতা, নির্জ্জীব মন, না কি এক চতুর শয়তান ?
তার মুখে অনন্ত রাত্রির মায়া। তাই সে কল্পনা ক'রে
পাঠিয়েছে প্রতিভূ, প্রবক্তা, দূত—ছন্দ, মিল, ধ্বনির ইশারা,

নিরঞ্জন গণিত, অবিহ্বান নিরুক্তের অযোঘ বিধান—
যার পূত শাসনে সঞ্চিত জল, নর্দ্দমায় যেন্তায় না-ক'রে
হ'য়ে ওঠে অধীন, উদ্দেশ্যময়, উজ্জ্বল ফোয়ারা।

বেলা

যাতাল, যাতাল হও—যোষণেয়ার দিলেন বিধান—
অবিরাম পেণ্ডুলামে যে তোমার উন্মাদঘাতক,
সেই ক্রুর কালের চতুরতর হও কালান্তক :—
পুণ্য, প্রেম, যদিরা, কবিতা তাঁর প্রখ্যাত নিদান।

P2935(1)

কবিতা
বর্ষ ২০, সংখ্যা ১

তাঁর আজ্ঞা অমোঘ : অথচ দান, জপ, তপ, ব্রত-
এ-সবের ক-অক্ষর আশৈশব সোমাংশে আমার,
দিগন্তে মিলায় ক্রমে রক্তিরাগ প্রেমান্ত-সন্ধ্যার :
এবং তন্মাত্র চাঁদে পানপাত্র দূরপরাহত।

বাকি থাকে কবিতা—অস্তিত্বময় অপূর্ব বন্ধন,
হ্লাদিনী, ব্যাধির বীজ, উন্মাদক, বিষুব, অসুখী,
সরস্বতী, ভেনাস, অমিত লক্ষ্মী, অনন্ত বাসুকি—

যেটাতে আমার তৃষ্ণা আষাঢ়েই করে সে যখন !
ভালো—কিন্তু বলো দেখি, হ'তে হবে আর কতকাল
একাধারে ট্রাফাল্গার, বজ্রযন্ত্র, শুঁড়ি ও মাতাল !

কর্কটক্রান্তি

দীর্ঘ দিন শেষ হ'লো : প্রভু, ধন্যবাদ।
এখনই, উত্তর দেশে, নিশীথেও নেয় না বিদায়
যদিও গোধূলিরাগ, পর্দা টেনে, তবে খুঁজে পায়
পথিক, প্রার্থিত ঘুম, প্রেমিকেরা, ঘুমার আস্বাদ :

তবু এই দীর্ঘতম দিবসেরই অমোঘ সন্তান
কুয়াশা, সুন্দর হিম, বয়সের শান্তির সংহতি ;—
জানি না এ গ্রীষ্মের চরম, না কি শীতের উত্থান,

শেষ, না আরম্ভ মাত্র ; কৈবল্য, না কুমারসম্ভব :
কেবলা মহাকালের নৃত্যে নেই ভাবী ও সম্প্রতি,
আছে শুধু তালের তরঙ্গে কোটা নূতন উদ্ভব,

বিনয়রূপালে পরু, অবনতি যৌবনচূড়ায়।
সময়নির্ভর সব সম্ভাবনা। হয়তো বা আমারেও তবে
অন্তরের ক্ষমাহীন হিলোলিমা, রূপের বাস্তবে
ধরা দেবে একদিন—শুধু যদি অপেক্ষায় ধৈর্য না ফুরায়।

অপেক্ষা

উদ্রোল দিনের পর দিন, আমি তোমারই উদ্দেশে
নিজের নিরতিশয় অন্তঃসার যাচিয়ে চলেছি ;
অপচয়, অনিশ্চয়, অবজ্ঞের উর্ধ্বে যা আছি,

যদিও মুখোশ প'রে সময়ের করে অভিনয়—
শুধু তা-ই নিতে পারে, প্রিয়তমা, যা তোমার নয় ;
চালুনির অবিরল ব্যতিচারে তবু ঠেকে যায় অবশেষে

গ্লানি, কাম, বুদ্বুদের পরপারে এক কণা অব্যয় কস্তুরী,
কঠিন ছিপিতে আঁটা, ঋজুতায় সঞ্চিত আঁধার ;
অথবা, প্রপাত যার অভিপ্রায় কোনোদিন চুমি
ক'রে নিতে পারবে না—সেই দূরনিবদ্ধ নীহার।

মাঝে-মাঝে মনে হয়, দেবযানী, বুঝি বা তুমিও
আমার সন্ধান বুঝে, একদিন ভেঙে দেবে বাঁধ ;
অথচ যেহেতু শুধু অপেক্ষাই অক্ষয়বেদ্য,
না যদি জানাও, তবু এই ঘুম মানি রমণীয়।

ভ্রমণ

শার্ল বোদলেয়ার

উৎসর্গ : মাদাম স্যা কা

পত্রিকা, রঙিন ছবি, বালকের হৃদয়চুম্বন,
দেখায় বিশ্বেরে তার অতিকায় ক্ষুধার সমান :
যে-বিশ্ব বিরাট হ'য়ে দীপ্ত করে সন্ধ্যার লণ্ঠন,
স্মরণের দৃষ্টিকোণে কত ক্ষুদ্র তার পরিমাণ !

একদা প্রভাতে যাত্রা ; মস্তিষ্কের বিবরে অনল,
হৃদয়ে বিষের, না কি তিক্ত কাম, কে করে যাচাই !
তরঙ্গের ছন্দের পিছনে ছুটে, চিত্তোলে চঞ্চল,
আমাদের অসীমের সমুদ্রের সীমায় বাচাই।

কেউ ছোটে দূষিত স্বদেশ ছেড়ে মোহন অয়নে,
শৈশবের বিভীষিকা পার হ'তে উৎসুক আস্তেল,
ক্বচিৎ জ্যোতিষী কেউ ডুবে ঘরে নারীর নয়নে—
মদমত্তা সার্সি কোন, মায়াময় অনুবাসে ঘেরা।

জান্তব রূপান্তরে পরিণতি সন্ধানে ঠেকাতে
তারা হয় মাতাল আকাশ, আলো, দীপ্ত নীলিমায় :
তুষারের তীক্ষ্ণ ছল, তাম্র-জলা রৌদ্রের সম্পাতে
ক্রমশ চুম্বনচিহ্ন লুপ্ত হয় দিগন্তসীমায়।

কিন্তু শুধু তারাই যথার্থ যাত্রী, যারা চ'লে যায়
কেবল যাবারই জন্যে, হালকা মন, বেলুনের মতো,
নিয়তি নিয়তি ফেলে একবার ফিরে না তাকায়,
কেন, তা জানে না, শুধু "চলো, চলো" বলে অবিরত।

তাদের থাকেনা পায় মেঘপুঞ্জে উজ্জ্বল বিন্যাস ;
স্বপ্নে হানা দিয়ে যায়—সৈনিকের যেমন আহ্বান—
পরিবর্তনীয় দেশ, মহাশূন্যে ইন্দ্রিয়বিলাস,
যার নাম কখনো জানেনি কোনো মানবসন্তান।

কী বিকট! লাটিম, বলের মতো ওষধলতের তালে
উল্লোল আবেগে নাচি ; কৌতূহল—প্রমত্ত বিদ্যুৎ—
ঘুমের ঘোরেও তার যন্ত্রণার আন্দোলন ঢালে,
স্বর্গের চাবুক মারে ক্ষমাহীন কোন দেবদূত।

খেয়ালের খেলা, যার লক্ষ্য শুধু পিছিল প্রমাদ,
কোথাও তা নেই, তাই মনে হয় নেই কোনখানে।
মানুষ, হৃদয়ে যার দুরাশার নেই অবসাদ,
অবিরাম উন্মাদের মতো ছোটে শান্তির সন্ধানে।

আমাদের প্রাণ তার ইকারীয় [১] এসপে আকুল
ডাকাত-নৌকোর মতো। তক্কা কাঁপে—"খোলো, খোলো চোখ!"
উন্মাদ উত্তপ্ত কণ্ঠ হেঁকে ওঠে উন্নত মাস্তুল,
"প্রেম···কীর্তি···পুরস্কার!" ঠেকে চরে—সেই তো নরক।

১। Icaria : আধুনিক গ্রীক নাম Nikaria : এশিয়া মাইনরের নিকটবর্তী দ্বীপ। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ফরাসি সোস্যালিস্ট এতিয়েন কাবে (Etienne Cabet) প্রণীত Voyage en Icarie গ্রন্থটি সমগ্র সাম্যবাদলোকে প্রসিদ্ধ ছিলো। তাতে লেখক তাঁর কল্পনিত আদর্শ রাষ্ট্রকে ইকারী দ্বীপে স্থাপন করেছিলেন।

যাত্রার বিহ্বল চোখে প্রতি ক্ষুদ্র দীপের আভাস
হ'য়ে ওঠে আরেক এলদোরাদো. মিহিচিত্রদীপ,
ব্যতিচারী কল্পনার উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ভিন্ন উল্লাস
ভোরের আলোর ভাষে শুধু ধন্য পাথরের দীপ।

হায় যে সিন্ধুর পারে রূপকথা-রাজ্যের প্রেমিক!
বেড়ি ছেঁড়ে জলে তারে ফেলে দাও—এই তো সময়!
উদার আমেরিকার উদ্ভাবক মাতাল নাবিক,
যার জন্য তরঙ্গেরে ক'রে তোলে আরো বিস্ময়।

এই বুড়ো বাউণ্ডুলে, পায়ে ঠেলে কাদার কাণ্ডরা,
উদাসিক, তৃপ্তিহীন, স্বপ্ন তার অসহ্যীর দিষ্টি,
মন্ত্রমুগ্ধ চোখে চেয়ে ভাবে তবু ভাবর কাপুয়া[২]
যেখানেই বত্তির ধোঁয়াটে বাতি জ্বলে মিটিমিটি।

৩

অদ্ভুত যাত্রীর দল! তলহীন, সমুদ্রের মতো,
বিলোল নয়ন ভ'রে নিয়ে এলে প্রোজ্জ্বল কাহিনী;
স্মৃতির ভোরঙ্গ খুলে দেখাও, সেখানে আছে কত
নীলিমার, নক্ষত্রের মণিহার, মুকুট, কিঙ্কিণী।

আমরাও যাবো দূরে, বিনা পালে, বাষ্পব্যতিরেকে—
আমরা, আজন্ম বন্দী, বক্ষে চাপা নির্বেদের ভার,
অকস্মাৎ উন্মোচিত আত্মার বলাকে দাও ঐঁকে
দিগন্তের চালচিত্রে পুলকিত স্মৃতির সম্ভার।

বলো, বলো, কী দেখেছো, বলো!

২। Capua: দক্ষিণ ইটালির শহর, বর্তমানে নগণ্য, কিন্তু রোমক সাম্রাজ্যের সময়ে ক্যাম্পানিয়া প্রদেশের প্রধান নগরগুলির অন্যতম এবং বিলাসিতার জন্য বিখ্যাত ছিলো।

৪

"দেখেছি অপরিমেয়
আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ, বালুতট তরঙ্গপ্রহত ;
এবং অচিন্তনীয় প্রলয়ের সংঘাত সত্ত্বেও
মাঝে-মাঝে হৃদয় হয়েছে ক্লান্ত, তোমাদেরই মতো।

বেগনি-রঙা সমুদ্রে মহান সূর্য কেলিপরায়ণ,
গভীরান অস্তরাগ নগরেও উদ্ভাস বিলাসে,
দেখে-দেখে চেয়েছে আবেগহীন শান্তিহীন মন
ডুবে যেতে লোভন বিচ্ছুরণে রঞ্জিল আকাশে।

রমণীর মনলখে, নগরের সমৃদ্ধ প্রাসাদে
কখনো স্পর্শেনি সেই রক্তের গভীর আবেগ,
যা পেয়েছি পুঞ্জিত মেঘের মধ্যে, দৈবের প্রসাদে ;
আর ছিলো হৃদয়ে অনবরত কামের উদ্বেগ !

—পুলকের অত্যুদয় কামনায় বাড়ায় ক্ষমতা।
হে কাম, প্রাচীন বৃক্ষ, সুখময় তোমার প্রান্তর,
যদিও বল্কলে বাড়ে দিনে-দিনে কঠিন মমতা
ডালপালা ঊর্ধ্বে উঠে সূর্যেরেই খোঁজে নিরন্তর।

বনস্পতি, বৃক্ষরাজ, সাইপ্রেসের চেয়ে দীর্ঘজীবী,
অনন্তবর্ষিষ্ণু তুমি !—যদে তবু করেছি চয়ন
ক্ষুব্ধাতুর তোমার পুঁথির যোগ্য অতিপক্ক ছবি,
আমরা, ধূসরমুগ্ধ, সৌন্দর্যপিয়াসী ভ্রাতৃগণ।

দেখেছি অবাক চোখে সিংহোলা বিরাট প্রতিমা,
নক্ষত্রপুঞ্জের মতো সিংহাসনে রত্নের সম্ভার,
উৎকীর্ণ প্রাসাদ, যার জাদুকর কান্তির গরিমা
জোগাতে, বনস্পতির সর্বনাশ হবে অচিরাৎ ;

বসন, দর্শনমাত্রে, ব্যাপ্ত করে মদির আবেশ,
মোহিনী রমণীদের বর্ণলিপ্ত নখর, দশন,
সাপুড়ের কণ্ঠ ঘিরে সাপিনীর নিবিড় আশ্লেষ।"

তারপর, বলো, তারপর ?

৬

"হায় রে অবোধ মন !

সার কথা শোনো তবে, সনাতন, অবিস্মরণীয়,
ঊর্ধ্বে, নিম্নে সোপানের যত আছে ধারাস্থক ধাপ,
সর্বত্র দেখেছি শুধু—সাধ ক'রে খুঁজিনি যদিও—
ক্লান্তিহীন মকে খেলে ক্লান্তিকর, মৃত্যুহীন পাপ :

রমণী, আজন্ম দাসী, হাস্যহীন, যান্ত্রিক, নির্বোধ,
কিছুতে ভক্তার নেই—আত্মরতি, আত্মোপাসনায় ;
পুরুষ, লম্পট, লুব্ধ, অত্যাচারে নেয় প্রতিশোধ,
দাসীর দাসত্ব করে বর্ষায় ক্লেদাক্ত কেনায়।

শরীর, ক্রন্দনে রত, আনন্দিত, সপ্রেম মাতৃক,
বক্ষের সৌরভ মাখা উৎসবের মত আয়োজন,
শক্তির স্ফুটিল বিষে অবসন্ন লোকাধিনায়ক,
চাবুকের আস্ফালনে জনগণ নতিস্বীকার :

অনেক আশ্রম, ধর্ম, সিঁড়ি ভেঙে স্বর্গে যাবমান,
আমাদেরই অনুরূপ : যাকে বলে পুণ্যের প্রভাব,
তাও, যেন ভোগক্লান্ত শালকের শয্যায় শয়ান,
কণ্টকিত চটেও প্রকট করে আমুক স্বভাব।

প্রগল্ভ মানুষ, তার প্রতিভার পীড়নে মাতাল—
সঙ্গী তার অচিকিৎস্য, চিরায়ত চিত্তের বিকার—
বিধাতারে জানায় যন্ত্রণা, ক্ষোভ, আক্রোশে উত্তাল :
"তবে নাও অভিশাপ, প্রভু আর প্রতিভূ আমার!"

আর যারা কিঞ্চিৎ সজ্ঞান, তারা কঠিন সাহসে
জানায়ের জানায় প্রেম : অদৃষ্টের শৃঙ্খলে নাচার,
ভোবে, গজ্জলিকা ছেড়ে, আকিবের বিশাল প্রদোষে
—আজন্ম জগৎময় চিরন্তন এ-ই সমাচার।"

৭

অতি কটু সেই জ্ঞান, সজ্ঞবদ্ধে যারে যায় পাওয়া,
একতাল, সংকীর্ণ এ-পৃথিবীর আকাশে, বায়ুতে
আজ, কাল, চিরকাল খেলে শুধু আমাদেরই ছায়া,
আতঙ্কের মরুস্নান নির্বেদের বিস্তীর্ণ মরুতে।

যাবেই ? পারো তো ঘরে ব'সে থাকো, আর
যদি না-গেলেই নয়, যাও, ছোটো, কিংবা দাও হামা,
কাঁকি দাও সফরে, নিষ্পলক চোখে যে করে সংহার—
সময় ! হায় রে যাত্রী, যাবমান, নেই তার থামা,

অস্থির উর্বশি যেন, কিংবা পীন, বর্ষের যাজক,
কিছুই পায়ের নেই, অশ্ব, রথ, কিংবা জলযান,
এ-দুর্থসিত মরোরে পলাবে ব'লে নিয়ত ব্রাজক ;
অন্য কেউ আছড়েই শিখে নেয় তার মৃত্যুবাণ ।

অবশেষে যখন পা দিবে চেপে, ছিঁড়ে নেবে টুঁটি,
সাধ্যে তবু কুলোবে আমার বাণী : হও আগুয়ান !
যেমন ভেসেছিলুম, পুরাকালে, উপড়ে ফেলে খুঁটি,
সুদূর চৈনিক তটে, রক্ত কেশ, নিষঙ্গ নয়ান ।

এবার তাহ'লে যাত্রা তমসার অতল সাগরে,
সঙ্গ-পথিকের মতো পুলকিত হৃদয় উধাও,
শোনো, কারা শবযাত্রী গান গায় মোহময় স্বরে :
"এদিকে, এদিকে এসো, যদি কেউ স্বাদ নিতে চাও

মদগন্ধ কমলের । এই হাটে তারে যায় কেনা,
যে-অলোক ফলগন্ধে নিত্য ঘরে ক্ষুধায় কোরাস ;
এখানে প্রদোষ নেই, অপরাহ্ণ আর ফুরোবে না,
এসো না, মাধুরী তার গান ক'রে চবে মাতোয়ারা ।"

ওপারে বাড়ায় বাহু পিলাদিস," এখনো তেমনি,
প্রেতেরে চিনিয়ে দেয় পুরাতন গানের গুঞ্জন।
"শাঁখের ঘর ইলেক্ট্রাকে, সে-ই তোর বিপল্যক্সরী!"
বলে সে, একদা যার আঙুলটি করেছি চুম্বন।

৮

হে মৃত্যু, সময় হ'লো! এই দেশ নির্বেদে বিধুর।
এসো, বাঁধি কোমর, নোঙর তুলি, হে মৃত্যু প্রাচীন!
কাণ্ডারী, তুমি তো জানো, অন্তরায় অন্তর, সিন্ধুর
অন্তরালে রৌদ্রময় আমাদের প্রাণের পুলিন।

ঢালো সে-গরল তুমি, যাতে আছে উজ্জীবনী বিত্ত!
জ্বালো সে-অনল, যাতে অতলান্তে খুঁজি নিমজ্জন!
হোক স্বর্গ, অথবা নরক, তাতে এসে যায় কী-বা,
যতক্ষণ অজানার গর্ভে পাই নূতন—নূতন!

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

৬। Pylades : গ্রীক পুরাণে অরেস্টেস-এর বন্ধু। অরেস্টেস যখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে ভগিনী ইলেক্ট্রাকে উদ্ধার করেন, পিলাদিস ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়। ফ্রয়েড দেখেন পিলাদিস বন্ধুতার প্রতীক, আর ইলেক্ট্রা কর্মনীড় বাহিরের।

ফরাসী কবিতা

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

শার্ল ক্রু ও'রলেআ : ক্লঁসেল

পালান সব এখান থেকে পালান,
দুশ্চিন্তা দুঃখ জ্বালা যন্ত্রো।
আমার সারাজীবন অবিরত
দাবড়ে রেখে চলবে খানদান?
জানিয়ে দিই; যদিও না যান,
মুক্তি এসে জয়বে পদাবত,
পালান সব এখান থেকে পালান।

আবার যদি দেখান পিছুটান
মদাহদের কেউ বা অপগত,
ঈশ্বরকে ডাকব, শাপাহত
দয়াই হোন, ধাগব বস্ত্রদান,
পালান, সব এখান থেকে পালান॥

ফ্রাঁসোআ ভিলঁ : লে, বা বরং ক্লঁসো

মরণ, কাঁধালি নিষ্ঠুরতার জোরে,
নিয়েছিস তুই আমার প্রিয়ার প্রাণ,
তাতেও কি তোর অতৃপ্তি অম্লান?
আমার সকল শক্তি যে যায় ম'রে,
এনেছিস আধি আমার বিষাদভোরে,
সে বাঁচলে তোর কিবা হত লোকসান,
মরণ?

দুজনে ছিলাম একটি হৃদয়ডোরে,
সে মৃত, আমিও মরণে মুহ্যমান,
দেউলে খোদাই দন্ত সাধু সমান
বেঁচে কিবা লাভ, জীবনই নেই যে ওরে
মরণ।

পিএর রঁসার : সনেট

যখন অত্যন্ত বৃদ্ধা হবে তুমি, সাঁঝের বাতিতে
মন্ত্রিকাঁথা বুনে যাবে অন্তঃপুরে, অন্ধরে আসীন
শুনবি আমার গান বলবে, 'হায়রে সেই দিন
যখন যৌবন ছিল গাইত রঁসার আরতিতে!'
তোমার সঙ্গিনী যতো শোনামাত্র, এই কথাটিতে
অকৃত কর্তব্য ফেলে যাবে, হবে ক্লান্তিও বিলীন,
উঠবে চকিত হ'য়ে, পুণ্যবতী তুমি বৃদ্ধাহীন
প্রাতঃস্মরণীয়া হ'লে পূজা দেবে তোমায় ভক্তিতে।

সে সময়ে মৃত্তিকার নিচে আমি নিদ্রার সন্ধানে,
করবীর পত্রছায়ে আমি শুধু ছায়া একখানি,
ওদিকে তখন তুমি দীপালোকে জরতী বৃদ্ধায়ী
তোমার যৌবনগর্ব ভাবো মনে স্মৃতির বিলাপে—
মরুক ভালোইবেসো, এখনও সময় আছে জানি,
বর্তমান আজও হাতে, এসো তুলি গোলাপ ছড়াই।

শার্ল বোদলেয়ার মাতাল হও

সব সময়ে মাতাল হ'তে হবে। ওতেই সব : ঐ একমাত্র বিবেচ্য। যদি বোধ করতে না চাও মহাকালের ভয়ানক ভার, যাতে তোমার ঘাড় ভেঙে যায় আর তুমি হেঁকে পড়ো মাটির দিকে, তবে তোমাকে মাতাল হ'তে হবে অবিরাম।

কিন্তু কিসে? মদে, কবিতায়, সৎকার্যে, তোমার যা রুচি। কিন্তু মাতাল হও।

এবং যদি কখনও, প্রাসাদের সিঁড়িতে, বা নালার সবুজ ঘাসে বা তোমার ঘরে বিষণ্ণমন্দ নৈঃসঙ্গ্যে জেগে ওঠো আর মাতালপনাটা কমেছে বা চ'লে গেছে দেখ, তখন জিজ্ঞাসা কোরো বাতাসকে বা ঢেউকে বা তারাকে বা পাখিকে বা ঘড়িকে, যা-কিছু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বা গুঙিয়ে বা দোলে বা গায় বা কথা কয়, জিজ্ঞাসা কোরো কটা বেজেছে, দেখবে তুমি জবাব পাবে : "এই তো মাতাল হবার সময়। মাতাল হও, যদি না মহাকালের গায়ে উৎসর্জিত দাস হতে চাও, মাতাল হও অবিশ্রাম। মদে, কবিতায় বা সৎকার্যে, যা তোমার রুচি।"

বৌ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

কোথাও এমন বিন্দু নেই
যেখানে মেয়েছে এসে প্রাণের কলকী ইতিহাস,
সমুদ্রের গান শোনে সাইক্লোনে ঘাস।
কোথাও পাপের ক্ষয় রাখেনি তেমন কিছু পরিচয় যেই
পাবকের মতো, যার নীল বাষ্পশ্বাস
পাবো নদ-নদী-হ্রদ-সমুদ্র-সিনানে।
তবু অন্যান্তক দিবে খুঁজে নিতে হয় যদি না-থাকার মানে
তোমাকে দেব না আমি খেতে
কোনো বিষাহিত-রাত্রি-ঝলসানো আগুনের ক্ষেতে
পাছে আলোকিত ফলে ক্ষত খুব পাও
যা তুমি, অথবা হতে পারে ধারা-সবুজ ক্ষতাও
যা তুমি অনেক জন্মে ছিলে
আমি উনপঞ্চাশের ফলতরু পঞ্চভাল নীলে।

সন্ধ্যা যখন নামলো

আরতি আচার্য চৌধুরী

তরী সন্ধ্যা পরলো
হলুদ আলোর রেশমি
পাখনা কোমল কাঁচলি।
চুলের গুচ্ছে গাঁথলো
শুভ্র রজনীগন্ধা।

আঁট ক'রে বেঁধে
রক্ত আঁচল
সোনা-মাখা বনে
নামলো।

খড়ের ছোট্ট ঘরে
ওঠে মায়ের ধোঁয়া—
সেখানে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা,
চোখে সুন্দর স্বপ্ন।

বাঁকানো আলের ধারে
উৎসুক চোখ নাচে
সন্ধ্যা যখন লাউ-মাচা বেয়ে
ধীরে এসে ঘরে ঢুকলো।

তখন অন্য কোথাও,
সোনা-পড়া মেয়েগুলো
ঠোঁটে, গালে রং মেখে
তীব্র চাবুক হানলো
ঘরলা হাওয়ার গলিতে।

কেউ হাত ধ'রে
টেনে নেয় ঘরে
পশু মুখ তুলিকে।

করুণ ক্লান্ত ছায়া
রাত্রির চোখে ঝরলো।

দুটি কবিতা

সৈয়দ শামসুল হক

দুইজন

চুপ ক'রে থাকে সে আড়ালে

হাজার মনের ভিড়ে কখন যে ফোটে
রাত্রির ফুলগুলো লাজুক, অবুঝ,
এক মন উন্মন করে

রাত আসে পাশাপাশি
সোনালি নদীর ধর দুজন বিজনে

একজন যন্ত্রণায় কাঁপে

একজন থাকে সে আড়ালে।

স্টাডি

আকাশে আঁকতো আঁকা মিষ্টি বিকেল
উদাস হ'লো কার বুক?
আকাশিয়া পলাশের আকাশের রেখা টানে
বিস্ময়ে ছায়া ওড়ে বক

পুরোনো হ্রদের পাড়ে: গভীর চোখের মতো
ছায়া কাঁপে বক।

ভিক্টোরিয়ার থেকে ব্যাচিলর বিলেতি সাহেব
বিকেলি সৌরভ মেখে মেহগেনি ছড়ি হাতে
নামলেন, তাকালেন,

হয়ত সে এসেছিল অন্তরেণু ঘন
অথবা সে এসেছিল খাতাস যেমন
এমনও তো হতে পারে কোনোদিন আদৌ আসে নি।

বিকেলের যমনায় বিলেতি সাহেব
চাই তোলে. যাক—হোটেলে পাঁচটা বাজে
বিসেস ম্যাকেন্টায় ককটেল কিছুক্ষন পরে :

এবেশ ওবেশ জুড়ে সেই এক নিশ্চল আকাশ॥

দুটি কবিতা

সুকুমার রায়

বাগানবাড়ি

ঘন ঘামে বা মশীর কালো চোখ
নৌকোগুলো অমন কেন করে ?

অমন কেন মন
কাঁপছে যেন কথার কালো ঝড়ে—
ঝুলকি চালে ওড়ে আলোর ঝাড়,
দুলতে থাকে মায়ার সংসার ;
কোথায় এক জানলা ভেঙে পড়ে।

বাগানবাড়ি চলছে তাড়াতাড়ি,
নৌকোগুলো অমন কেন করে ?

ভুলি নি

ভুলি নি।
ধুলোয় ধোঁয়ায় আলোর ছায়ায়
বেন্দিছে হেলানো ভুমি
ভুলি নি।

দুটি কবিতা

প্রতিমা পাল

বিকেল

নীল বিকেল।
একা বসে আছি ঘাসের ওপর।
সোনা-গলা রোদে ঘুমের গান,
পলাশ গাছটায় ধরেছে অনেক ফুল,
লাল তাদের রঙ।
দূরে স্কুলের পেটা ঘড়িটায় পাঁচটা বাজলো।

মাটির বুকে
ঝিরঝির ক'রে কাঁপছে গোধূলির গন্ধ।
রাত্রির লোভী স্পর্শ এখনি সেটুকু নেবে লুটে,
তাকাও আমার সবুজের সঙ্গে যাবে মিলিয়ে।
তবু আমার ভালো লাগে এই প্রতীক্ষা
ভালোবাসি রোদের শেষ চুমোয় নিজেকে ও'রে তুলতে
এই নীল—নীল বিকেলে।

রাত্রিশেষে

বাইরে নেমেছে বৃষ্টি,
ঝড়ো-ঝড়ো হাওয়ায় প্রাণের স্পন্দন,
পিচ-ঢালা রাস্তার ওপর গ'লে পড়ছে
নক্ষত্রের কান্না।
তুমি ঘুম থেকে উঠে এলে আমার পাশে
প্রদোষের অন্ধকারে ভেজা তোমার চোখ,

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬২

তোমার চুলের গন্ধে মুখ ঢেকে বললাম—
"আজ তুমি যেয়ো না।"
পিঠে হাত রেখে বললে—"আমার যে কাজ।"
কারখানায় বাঁশি বেজে উঠলো।
ঘুম ভেঙে
দরজা খুলে তুমি বেরিয়ে গেলে।

কবিতা
বর্ষ ২০, সংখ্যা ১

সে-মেয়ে

গোপাল ভৌমিক

দুটি হৃদয়ের সেতুবন্ধন পেরিয়ে
সে-মেয়ে এসেছে নীড়ে
কৌতূহলের উদ্যত চোখ এড়িয়ে
আমার এবং তারার এবং তোমাদের—
সেই মেয়ে আর আমি হয়ে গেছি
সাথক, সুরের সাধনের।

দেখিনি শ্রাবণ পল্লীতে তাকে
কিংবা দুপুর এ মহানগরে ;
কল্পলোকের ছায়ানটী হয়ে
তবু সে বাঁচে ও ঘরে,
হাসায়, কাঁদায়, ভালোবাসে, ঘৃণা করে—
সে রয়েছে, তাই গানের শ্রাবণ ঝরে।

সে-মেয়ে, আমি, অনন্তা ;
ইতিহাস তার নাগাল পায় না খুঁজে :
সে নয় দিনের, রাত্রির নয়,
তবু সে গান বুঝে
গভীর গোপনে হৃদয়ে লাগায় দোলা—
শুধুই অনাবিষ্কৃতে আমি তখনই আত্মভোলা।

কবিতা
আশ্বিন ১৩৬২

উড়ো চিঠি

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তবে শোন বলি তোরে : কেন তুই কিটেবাটি ছেড়ে
চ'লে এলি এই হিংস্র জটিল নগরে ? টাকাকড়ি
যা ছিল খোয়ালি সব, যতই না আস্ফালন করি,
ফুরাড়ি দিনের কাছে বারংবার যাই না কি হেরে ?

তবু এলি, তবু এলি দেশ ছেড়ে এ কোন বিদেশে
আবার বাঁধবি বাসা এই ভেবে। শহরের শিলাস্তূপে
কোথায় সে গ্রামান্তের নীল। তীব্র আকাঙ্ক্ষার বুকে
মাথা রেখে শিলাসনে দেহরক্ষা হ'লো অবশেষে।

তুই এলি, তুই গেলি। সহস্রের ভিড়েই খোয়ালি
পুলিশের আশার চিহ্ন ; গাড়ি, ঘোড়া, পদাতিকে তারি
এ শহরে কেন এলি ? কোন বুকে দিলি চুনকালি
শিলাদিত্য সভ্যতার, উদ্বাস্তু কি এতই আনাড়ি ?

সব চেয়ে বড়ো লজ্জা : তোর বউ আদুখানু বেশে
বুক চাপড়িয়ে কাঁদে, তারপর ওঠে হো-হো হেসে ॥

দুটি কবিতা

শামসুর রাহমান

নির্জন দুর্গের পাখা

যাবিনি জীবন সমুদ্রসন্ধানে
চোরাবালিতেই পরম শরণ নেবে।
আশার পণ্যে পূর্ণ জাহাজ সে-ও
ডোবা পাহাড়ের হঠকারিতায় ঠেকে
হবে অপহৃত—ভাবিনি কখনো আগে।

দিনের সারথি যখন গুটিয়ে নিলে,
যখন রাত্রি কৃষ্ণ কবরী নেড়ে
আনে একরাশ তারা-ফুল ঘরময়,
দু'হাতে সরিয়ে জানলার গাঢ় জাল
চেয়ে তাকাই আমিও মজ্জমান।

ভবিষ্যতের ফাঁসির অন্ধকারে
যা-কিছু রয়েছে আমার জন্যে সেবে
সবি নিতে হবে দৈবের দয়া মেনে।
ব্যর্থদৃষ্টি আড়ালেই ঝলসায়।

নির্জনতার কারাগারে শ্বাস
আত্মদানের বহৎ দুর্গ গড়ি।
যদি সে প্রাকারবিরোধী অশ্বখুরে
অচিরাৎ তার দৃঢ় নির্ভর ভোলে,
যদি দর্পের দর্পণ হয় গুঁড়ো,
ঝড়ের সামনে ভাগ্যের পাখা মেলে,

তাকে পর ভেবে কাকে যা আপন জেনে
সাধের প্রদেয়ে দিব যে জলাঞ্জলি।

যদি হ'তো ঐ তারাদের মতো চোখ
তারার মতন নিবিড় লক্ষ কোটি,
দু'দিনের ঘরে হয়তো পেতাম তবে
বেলা না ফুরোতে তাকে এই চরাচরে
চোখের তৃষ্ণা মিটিয়ে দেখার সুখ।
অবুঝ আমার আশা উধাও তবু।

বিরূপ পতার গন্ধে জড়িয়ে শিং
কালো রাত্তিরে তৃতীয় প্রহরে একা
কাঁদে প্রত্যহ হরিণ-হৃদয় যার
তাকে নেব চিনে : প্রাণের দোসর সে-যে।

সম্মুখে কাঁপে অযোধ সর্বনাশ।
বিষের তপ্ত পশ্চিমে হয় জড়ো,
অনেক দূরের আকাশের গাঢ় চোখে
রাত্রি পরায় অতল কাজল তার।
এমন নিবিড় স্মৃতি-নির্ভর ক্ষণে
বলি কারো নাম, হৃদয়ের ঘরে বসি।
অলি অনিবার নিজেরই অন্ধকারে।

এতকাল ধ'রে আমার আত্মাকে
যাতক চেয়েছে তীক্ষ্ণ কুঠার ধারা,
সেই যূপকাঠে নিজেই বলির পশু।

উঁচু মিনারের নির্জনতায় ব'সে
ভেবেছি সহজে বিশ্বের মহাগান
আমার প্রভাতে সন্ধ্যায় আর রাতে
ঝর্ণাধারায় আনবেই বরাভয়।
সেই বাসনায় প্রকৃত আধার খুঁজে
সূত্রে খুঁড়েছি দুরাশার শত টিল।

প্রতি পক্ষের কূটচক্রের তান
পশেনি কর্ণে, ওদের বর্মবোধে,
সাম্যতাষায় করিনিকো দৃক্‌পাত।
কবন্ধ যারা নিত্য জমাবধি
অন্ধের মতো তাদের দৃষ্টি ধ'রে
বন্ধের ঘোরে ছুঁইনি গতির বুড়ি।

বিমল গাঙ্গ

ইচ্ছা আর অবিদ্যায় জীবনভোর কলম ঠেলে
হায়রে তুমি কী-ই বা পেলে?
দিনরাত্রি খুঁথির শত পাহাড় খুঁড়ে বেখলে শেষে
পোড়া কপাল। ঘুষিক মেলে।
কালের মেঘে অকাল সাঁঝ নিয়েছে এলো হঠাৎ ভেসে:
বেখলে শেষে যৌবনের পরম গতি নিরুদ্দেশে।

প্রেতের মতো একাকীত্বে সব পন্থা ঘুইয়ে এসে
কন্থা গায়ে বলবে কাকে মহান প্রভু?

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬২

যাকেই বলো হারানো গান পাবে না তবু।
কঠিন পথে আমার ঘর ভাঙিয়ে দ্রুত কোথায় এলে?
কার সে হাতে আত্মা স'পে
জীবনভোর জীবন সেই নাবটি জ'লে।
মনের মত হঠকারিতা গুঁড়িয়ে ফেলে
হায়রে তুমি কী-ই বা পেলে?

বোদলেয়ার অবলম্বনে

বুদ্ধদেব বসু

কয়েকটি বিষ

মদের নেশা লুকিয়ে রাখে বোকারা গলি
অলৌকিকের স্বর্গচোরা কলনাদিতে,
খেয়ালি তার রঙিন কেনার তলানিতে
জেগে ওঠে তোরণ ছুঁড়ে মীনারাবলি
অস্তরাগের রশ্মি-জ্বলা কাহিনীতে।

আফিম আনে সীমাহীনের সম্ভাবনা,
দীর্ঘ করে মুহূর্তের চলার তালে ;
কণ্ঠা হয় গভীর, তার রঙ ঢালে।
হৃদয়, সুখে ক্লান্ত হ'য়ে, উন্মাদনা
নিংড়ে নেয় ঘুমঘিয়ার অন্তরালে।

এরাও নয় তার কাছে এক কানাকড়ি,
সবুজ চোখে খেলায় তুমি ডাকো যে-ঘর,
এই হৃদয়ের ডুবে মরার অতল দহ ;
এগিয়ে যাবো, বেপরোয়া ঝাঁপিয়ে পড়ি,
ঘন্দ্র মেটে, দীর্ঘশ্বাসের কেনাও রহ।

কিন্তু তোমার বিষ্ণীবনের সেই ভুলনা—
বেঁচার ছল, মরার জ্বালা। সকল মন
বিস্মরণের আঘাত করে সমর্পণ,
জীবন ভ'রে জমিয়ে-তোলা সব ভাবনা
তরঙ্গিত প্রলয়ে দেয় বিসর্জন।

ছাতড়া-কুড়ুনির মন্ত্র

বস্তির সর্পিল পথে বার-বার তারে যায় চেনা—
যেখানে কৃষির বংশ উগরে তোলে বিষময় ফেনা
পচিল পঙ্কিল, আর মধ্যরাতে স্টীমলাঞ্চ চাওয়া
প্যাসেঞ্জারের নাড়া দিয়ে ঢেলে দেয় রক্তবর্ণ ছায়া—

জন্মিয়তি ভক্তিতে সে মাথা নাড়ে, ছাতড়া কুড়ায়,
রাজরে অপ্রতিহত, তুচ্ছ করে নৈশ পাহারায়;
সেখানে চোরের খেয়ে, কবিদের মতো অন্যমনা,
শুরু করে রাত্রিতার মহাপ্রাণ, তারার সাধনা;

যেন রাজ-পথ, যেন জনগণে মঙ্গল-সংহিতা,
দুঃখে দান, দুর্জনের বিদীর্ণনে খ্যাতিমান পিতা—
আকাশে আস্তীর্ণ তার প্রভাবের প্রামাণ্য সভায়
নিখিলনক্ষত্র, তাপে, দীপ্ত তারই পুণ্যের প্রভায়।

তা-ই বটে! এরা সব, শতভিষ্ক সংসারের চালে,
পিষ্ট হ'য়ে পরিশ্রমে, ব্যর্থক্যের অকালসজ্ঞানে,
ছুরে-পড়া কাঁধে তুলে কদর্যের স্তূপ সঞ্চয়ন—
অতিকায় প্যারিসের অনর্গল, বিচিত্র যবন—

ঘরে ফেরে, শিশু-সন্তী গরিমায় অরণে উজ্জ্বল,
সঙ্গে নিয়ে বয়োবৃদ্ধ পিতামহ-বান্ধবের দল—
যাদের শুষ্কের স্রোত পদক্ষেপে পতাকা ওড়ায়।
—নারায়ণ বিষ্ণুরূপে অকস্মাৎ সম্মুখে দাঁড়ায়

মশাল, ফুলের মালা, বলীয়ান বিজয়-তোরণ :
প্রত্যাবর্তনের পথে অঙ্গুলিত মঙ্গলাচরণ
ঢাক, ঢোল, বাঁশির উল্লাস ফুলে, উষার উঠানে
ভ'রে দেয় প্রেমের নেশায় মত্ত ক্ষিতির সন্ধানে।

জীবনের প্রহরনে, এইমতো, দিগন্তে ছড়ায়
যদিরা, সোনার মাখা পাক্তলস,[1] প্রোজ্জ্বল ধারায়।
মানবের কণ্ঠে তার ক্ষমতার সাক্ষাৎ ঘটনা,
দানমুখে রাজরাজিতায় তার সামান্ত ঘটনা।

সুষুপ্তি, আলস্তে স্নিগ্ধ, বিস্মৃতির অমল কন্দর,
ঘরে-ভাজা দুর্ভাগার নির্বাণের অন্যায়ী নশ্বর—
অন্নতপ্ত মাতার সন্ধী সে ; আর মানুষের দান
যদিরা, স্বর্গের ঘাস, মৃত্যুহীন, স্বর্গের সন্তান।

বিলাস মানুষের মন

যেমন, অন্ধোদ্ভূত, প্রতীক্ষায় নিষ্পন্দ নিটোল
ফুলে ওঠে আনাবিলী চন্দ্রমার মৃদু শিহরণে
অলস অঙ্গের ভঙ্গে, লাস্যময়, চঞ্চল কিরণে—
সেইমতো প্রমদার আধারুণ কটাক্ষ বিলোল ;

ফুরাড়ির হাতে শেষ, অবশিষ্ট গোটা কয় টাকা,
ফীণাঙ্গী আদেলিনার মদকল-বিহ্বল চুম্বন ;
স্মরণে চিরায়মান সনির্বন্ধ সুরের বলাকা,
যার বুকে মানবের অবিকল দুঃখের গুঞ্জন ;—

[1] Pactolus (গ্রীক Pactolos) : গ্রীক পুরাণে বর্ণিত নদী, যার বালু অর্ণরেণুতে অঙ্গুলিত।

এল নব সমকক্ষ, যে গভীর, দুরুহ্ যোজন,
তোমার উদয়চ্যুত, দুরাবলেহন চিকিৎসার,
পুণ্যাত্মা কবির প্রাণে সান্ত্বনার অক্ষয় উৎসার—

তুমি দাও দুরাশা, নবজীবন, যৌবনের বল,
এবং গৌরব, যার বরমাল্যে আমরা তিথারি
হ'য়ে উঠি দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বর্গের শিকারি।

প্রেমিক-প্রেমিকার গান

সকল দিক আজ বাদুরীবন !—
অবাধ, অবারণ, অসংশয়,
আমরা মদিরার অপারোহী,
অলোক দ্যুলোকের দিগ্বিজয়ী।

যুগল দেবদূত, অনির্বাণ
অন্নের যাতনার বেদনুমান,
ভোরের নীলিমার স্বচ্ছতায়
স্বর্গটিকে খুঁজি দূর মরীচিকায়।

পুলকে প্রতিযোগী পরস্পরে—
আমরা সমতার স্বল্পহীন
চেতন কল্পার পাখার 'পরে :—

বোন আমার, বল, বন্ধহীন
পাগল গতি এই কোথায় যাবে ?
—স্বপ্নে-পাওয়া বৈকুণ্ঠধামে !

গহ্বর

পাকেল, জগৎ ছুড়ে, দেখেছেন কেবল গহ্বর।
সব যেন তলহীন—বাক্, স্বপ্ন, উদ্যম, বাসনা!
আমিও অনেক বার জেনেছি সে-বিকট যাতনা
উন্নত মাথার দেশে, আতঙ্কের বাতাসে অধীর।

ঊর্ধ্বে, নিম্নে, দশ দিকে, মেপে যায় অবিরল খাদ,
সীমান্ত, নিঃশব্দতা, নীলিমার ভয়াল বন্ধন।
রাত্রির বেশ্যায় দেখি ঈশ্বরের অঙ্গুলি-লেখন
এঁকে যায় বক্রতন্বী দুঃস্বপ্নের অনন্ত বিষাদ।

ঘুমেও নিস্তার নেই, বিরাট গর্ভের মতো সে-ও,
ওঁৎ পেতে আছে অস্পষ্ট বিভীষিকায়, উদ্দেশ্যবিহীন,
অসীমের নখ ক'রে খুলে দেয় সকল জানালা।

তাই তো আমার আত্মা, অবিরাম মূর্ছায় বিলীন,
ঈর্ষা করে অজ্ঞান শূন্যেরে, চায় ঘুমিত, ঘুমের
সত্তা, সংখ্যা, বাস্তবের মুক্তিহীন মায়ার শৃঙ্খলা।

বাসনা

মানুষ যেখানে যাক, সিন্ধুপারে, কিংবা আরো দূরে,
অগ্নিময় মরুতলে, কিংবা যেথা তপন ঘুমিয়ে,
দিক সে পূজার অর্ঘ্য আদ্রোমিতে অথবা বীশুরে,
কল্পকে আদর, কিংবা দারিদ্র্যের ঘিরে মলিন :

নাগরিক, বাইস্কুপে, গ্রাম্যজন, শুভ্রমহাশয়,
চোখ তার যন্ত্রিক যন্ত্রর, ক্ষিপ্র, জিংবা ক্ষুরধার—
চরাচরে পরিব্যাপ্ত এই এক অন্তহীন তার,
ঊর্ধ্বে যদি চক্ষু তোলে, ছৎপিণ্ড কেঁপে ওঠে তার।

ওখানে আকাশ, এই কুটুরির ক্রুর পামিয়ানা,
বিহরে প্রলম্বিত মঞ্চে আলোকের চঞ্চল বিশানা,
মেতে ওঠে মঞ্চে পাঁকে প্রহসন-পুতুলির মেলা ;

লম্পটের বিভীষিকা, ছলনীর অলীক মায়ুরী—
কটাক্ষ-ঢাকনার নিচে মানবেরা দেখে হাতাগুড়ি,
তার ঊর্ধ্বে অতীশার অবরুদ্ধ সকল অর্গল।

কমল

নিত্য সে আমার পাশে, বাতাসের মতো নিরঙ্কুশ,
বেড়ায়, সাঁতার কাটে, কাঁদয়ে ওঠে, অতনু পরভাস ;
সে আমার পানীয়, প্রহারময় বিষাক্ত ফুলফুশ,
ছতাশা, দুরভিসন্ধি, যন্ত্রণার উৎস অফুরান।

মাঝে-মাঝে, শিল্পের প্রেমিক আমি জানে ব'লে, নেয়
নারীর মোহিনী মূর্তি : এই মতো, কপট কৌশলে
আমারে সে মজিয়েছে তিলে-তিলে, কানায়-কানায়,
অকথ্য মকরধ্বজে, নরকের লোলুপ কোহলে।

কিছুই রাখেনি বাকি ;—ধাবমান আমার ক্লান্তিরে
ফুলিয়ে, অনতিক্রম্য, অনহীন, গভীর প্রান্তরে—
যেখানে ঈশ্বর নেই, আছে শুধু নিঃসীম নির্বেদ—

মেয় সে আমারে ছুঁড়ে পলে-পলে ঘরণের ভালি,
ঘণানের রক্ত-মাখা বোমারা, ছেঁড়া হাড়গোড় কালি,
ঘরণের সকল অর্ঘ্য—ত্রাস্তি, ত্রাস, অবসাদ ক্লেদ।

রোমান্টিক সূর্যাস্ত

কী সুন্দর সূর্যের জ্যোতির্ময়, নয় বিস্ফোরণ,
আকাশেরে যখন রাঙিয়ে দিয়ে যেয় সে বিদায় ;
বড় সে, যে সূর্যাস্তে ডুবিয়ে চোখ, সোনার বরন
অন্তিম হাসির প্রেমে ঘুরে পড়ে মুগ্ধ বন্দনায়।

তার সেই দৃষ্টিপাতে, আত্মহারা হৃদয়ের মতো,
দেখেছি, মূর্ছায় ঝরে ফুল, জল, মাটির কাটল।
চলো দিগন্তের দিকে। বেলা যায়। এখনো—হয়তো—
খুঁজে পাবো অন্তরাগে শীরমান আলোর অঞ্চল।

কিন্তু না, মৃত্যুই ছোটা ! অপস্রিত আমার ঈশ্বর।
রাত্রি, অপ্রতিরোধ্য, স্যাঁৎসেঁতে, ভয়ঙ্কর, ধ্বংসের,
ছড়ায় সাম্রাজ্য তার, আতিথ্যর, চেতনারহিত।

পথ চলি : অন্ধকারে ঘরণের গন্ধ ওঠে জেগে,
পা ঠেকে খানায়, গর্তে, নর্দমার শীতল শরীরে,
অচিন্ত্য ব্যাঙের গলা ঘাড়ে করে বিষাদসঙ্গীত।

একটি মুখের প্রতিচ্ছবি

পাণ্ডুবরনী, ভালোবাসি যাঁকা ভুরু তোমার,
দীপ্ত, তরল, অমার যুগল করনা :
এত কালো চোখ, তবু সে যষ্ঠী যে-ভাবনায়
তাতে নেই শবযাত্রার অবতারণা।

সেই চোখ, যার ছন্দ তোমার নিবিড়, ঘন,
ক্ষুব্ধ কেশের চঞ্চলতায় বেলার তাল,
সে-কালো চোখের লাজ আমায় বলছে : "শোনো—
যদি ভালোবাসো বন্যকলার ইন্দ্রজাল—

এসো না তাহ'লে, যে-আশা আমরা দিয়েছি মেলে—
এবং তোমায় করবারেও—করবে জয়।
নাভিমূল থেকে নিতম্বের প্রমাণ পেলে—
দেখবে আমরা পণরক্ষায় অকুতোভয়।

মোহন, পৃথুল, যুগল স্তনের বৃন্তে
রোদ্রের দুটি নিটোল মুক্তা পড়বে ধরা,
আর উদরের সীমায় পারবে চিনতে
মখমল-কালো, ঘৌতের মতো মসৃণ ভরা,

কোমল রোমের ঐশ্বর্যের অন্ধকার,
এই কেশরের সত্য সোদরা, সর্বজিৎ,
কোঁকড়া, নাদুস, চলন্ত, গভীর—ঘুমন্ত যার
শুধু অমানিশা, তারাহীন নিশা, তমস্বিনী।"

সুন্দর জাহাজ

অলস মায়াবিনী, বলবো তোরে, শোন,
অঙ্গে শোভে তোর কত না আভরণ।
আঁকবো অপরূপ মাধুরী—
বালিকা-মহিলার মিলন-মোহানার চাতুরী।

যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিমান,
তখন মানি তোরে স্বতন্ত্র তরণীর সাগর-অভিযান।
তেমনি চঞ্চল, উত্তাল,
শিথিল, মন্থর ছন্দে হেলে-দুলে ছড়িয়ে দিলি পাল।

দৃপ্ত গ্রীবা তোর, নব সজ্জার আয়োজন
দেখায় মাঝারীর কত যে অদ্ভুত বিকিরণ;
লৌহ্য বিজয়ের নির্যাস
ছড়িয়ে, ওরে শিল্প-রাজ্ঞী। তোর পথে হেলায় চ'লে যাস।

অলস মায়াবিনী, বলবো তোরে, শোন,
অঙ্গে শোভে তোর কত না আভরণ।
আঁকবো অপরূপ মাধুরী—
বালিকা-মহিলার মিলন-মোহানার চাতুরী।

এগিয়ে আসে তোর বিটোল স্তনভার বেশবে অবিরাম,
অনেক বৈভবে বিজয়ী ওরা দুই বর্ম অভিরাম—
দুলল ঢাল ধরে কত না
সুগোল, রেখায়িত আলোক-রশ্মির ছোঁয়া।

উগ্র ঢাল, তার তীক্ষ্ণ শরমুখ রক্তিম, ভোপনীয়,
রেখেছে সঞ্চিত যা-কিছু মারাত্মক, মধুর, গোপনীয়—
আসব, সুরা, সৌগন্ধ্য—
বুঝি যাদুচাল, হৃদয়ে প্রলাপের ছন্দ।

যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিযান,
তখন মানি তোরে সুতনু তরঙ্গীর সাগর-অভিযান।
তেমনি চঞ্চল, উত্তাল,
পিছিল, মধুর ছন্দে হেলে-দুলে ছড়িয়ে দিলি পাল।

মহান জখমে আঘাতে বসনের আলোড়ন
জাগায় যাতনায় আঁধার বাসনার আবেদন।
যেন যে ডাকিনীরা দু-জনে
গভীর বলে নাড়ে কালিমা-ঘন এক পাঁচনে।

প্রবল নায়কের বিরোধী খেলোয়াড় অকাতর,
ও-দুটি বাহু যেন কান্তিকলঙ্কিত অজগর;
প্রেমিক বাঁধা পড়ে, ক্ষমাহীন
অতি কঠিন তোর হৃদয়-কারাগারে, চিরদিন।

মৃদু গ্রীবা তোর, নধর স্কন্ধের আয়োজন
যেথায় বাধাটির কত যে অদ্ভুত বিকিরণ;
সৌম্য বিজয়ের নির্বাস
ছড়িয়ে, ওরে শিল্প-রাজ্ঞী। তোর পথে হেলায় চ'লে যাস।

তিনটি কবিতা

কৃষ্ণকান্তি

প্রতীক্ষা

সে আসে নি,
—চুপুর গড়ায়।
শূন্য ঘর
নিঃসঙ্গ প্রহর—
বৃষ্টি-ভরা আশঙ্কা দিনের
ছায়া ঘরে,
কত কথা
ছায়ায় অক্ষরে।

পান্থ

ক্লান্তিকর রুক্ষ দিন, রাত্রি কাটে ঘৃণের বিকারে।
উদ্‌ভ্রান্ত চলি আমি দাবদগ্ধ দুস্তর সংসারে
রৌদ্র ঝড়ে ধূলি ধূসরিত পথে, আশাবদ্ধ মনে,
হে সুন্দর, অনির্বাণ, তোমার মুকুর অন্বেষণে।
মৃত্যু আনি হারাসহচর, আর জমা শোক তব
সেও আছে ; নীরব কান্নায় ভেঙে পড়ি, এ হৃদয়
কী দুঃসহ যন্ত্রণায় ক্ষয়কীট যায় ঝুরে ঝুরে।—
শান্তি চাই, নতুবা সমস্ত ব্যথা সবের চাদরে দাও মুড়ে।

অন্ত

কী যে শান্তি নীলিমায়, ঘাস, গাছ মাঠের প্রান্তরে
মেখে মেখে আঁকা। দূর দিগন্তরে বর্ণধূলি ঝরে,
রোদে নীল প্রজাপতি ; ফুলগুলি গাছের শাখায়।
সন্ধ্যার অঞ্জনে ঘরের ঈশান কোটে একক তারায়,
নির্জন রাত্রির মূর্তি চুপি-চুপি লঘু পদপাতে
নিঃশব্দে দাঁড়ায় এসে ছায়াম্লান শুভ্র জানালাতে।
বিকীর্ণ অজস্র ছবি আলোর স্ফটিক আঙিনায়—
এর মূল্য কানাকড়ি। খোলা ক'রে সময়ের জল,
অস্থির কুটিল পথে মানুষের যাত্রা অবিরল,
অবশেষে নিশ্চিন্ত আরাম নেয় মৃত্যুর গুহাতে
পতঙ্গচিত্র কীটদষ্ট সময়ের শুষ্ক ঝুলি হাতে॥

শিলিপিগ

বুদ্ধদেব বসু

পুরোনো উদ্যানপ্রান্তে নির্জন নিমের ছায়া ব'য়ে
শিশিরবিন্দুর মতো দূর্বালোক যেই নামে ঘাসে,
দিনের আহার্য নিতে ক্ষুধাতুর শিলিপিগ আসে
শঙ্কাহীন পদক্ষেপে, সন্তর্ক দু'কান খাড়া ক'রে।
শাদা-কালোমিশে যেন সুচিক্কণ রেশমের ভিতরে
শর্করাক্ত জীবলীলা। দুপুরের নিঃসঙ্গ বাতাসে
গোলাপি পা দিয়ে তার খাড়, মুখ ব'য়ে অনায়াসে
আধাখে দু'চোখ বোজে শেষাষার প্রশান্ত কোটরে।

তবু কেন মাঝে মাঝে উচ্চকিত মনে হয় তাকে?
ঘাস খেতে ভুলে যায়, রুচিপাতা খোঁজে নাকো আর।
কোন দূর দিগন্তরে কালো হাওয়া ওঠে আশঙ্কার,
যোজন-বিস্তৃত ভয়ে প্রাণীদের পথঘাট ঢাকে?
আরক্তিম নেত্রে তার মৃত্যুর নিষাদ-মূর্তি আঁকে—
সে কি বিড়ালের থাবা কিংবা কোনো চিলের চিৎকার?

২

এদিকে দিনের শেষে অতর্কিতে সীমান্তের বনে
শাখা হতে শাখান্তরে ছুটে চলে দাবানল-শিখা;
পলাতক পশুদের চোখে মুখে ত্রস্ত বিভীষিকা,
মুহূর্তে অদৃশ্য হয় দিশাহারা উন্মত্ত দাবনে।

আশ্বিন ১৩৬২

এলোমেলো পাখি-ওড়া সীসা-মাখা আকাশের কোণে
একলা বসির মাথে এঁকে দেয় গাঢ় লাল টিকা—
কী আশ্চর্যে মুখ ঢাকে নবনারী বালক-বালিকা,
তেজস্ক্রিয় মেঘ ঘোরে রক্তকলা সন্ধ্যার গগনে।

সুখোনো উদ্যানপ্রান্তে গিনিপিগ কেরে খাস খুঁজে,
তখনো বা শুয়ে থাকে আমলকি গাছের ছায়ায়।
কেউ মৃত, স্মৃতি তিক্ত—আমাদের মন শুধু চায়
তাদি মতো ডুবে যেতে পৃথিবীর অক্লান্ত সবুজে।
কিন্তু সেও জানে নাকি জীবনের সাথে যুদ্ধে-যুদ্ধে?
মাঝে-মাঝে উচ্চকিত ঘাড় তুলে কেন সে তাকায়?

স্বপ্নের পুতুল

জ্যোতির্ময় দত্ত

তার স্বপ্নের পাখি সুখের চলো না।

শুধু একলা জলা চুপুরে। বাদাবি বনে
উলঙ্গ, নির্বাসন মেয়ের একাকী উদ্যানে
আত্মহত্যার মতো। শুধু স্বপ্নের মতন।

কোনোকালে এরও ছিল সবুজ আয়ের বসন্ত।
রাতে কখনো-কখনো সেই কালো ঘোড়া তাকেও জলস
কেশরে ঝেঁধে অন্ধকারে গেছে নিয়ে ;
স্বপ্নের ওপার বসন্তের নিষ্ঠুর শিকারী
তাকে করেছে হরণ। নির্ঘুম রাতে এই মেয়ে
জেগে-জেগে বাসনায় ক্ষণে-ক্ষণে হয়েছে কেয়াদি।

হরিয়ালের যাযাবর ঝাঁকের সবুজ আলমারি নদীতে
ভাসিয়ে আনতো বিদেশী ভাষা। বিদেশী পুরুষ,
তাতার কাফতান গায়ে, মাথায় রঙিন উষ্ণীষ
পাখিদের চোখে চিঠি পাঠাতো। চকিতে
আবিষ্কার করতো সামনে দুর্বৃত্তেন সওয়ার। ফুলাদি হায়ার,
কিছু গল্প, গাঁয়ের মেয়ের, বসন্তের সার্বজনীন ভাষায়।

কিন্তু সে-বসন্ত অদ্বিতীয়। পরের বছর
তার বিয়ে হ'লো, বড়ো চাকুরে। তারপর
সকাল-বিকেলের স্থূল-কয়লা-কালি
ঘুরে আবার সকাল-দুপুর। ঘুকোর মতো নিটোল-গঠন
দেহ এখনো সুঠাম আছে। কিন্তু নিভৃতে খালি
আর গর্ভ কৃপাহীন। সে সূর্য-বীজের বপন
তার স্বামী করেন নি। আষাঢ়ের উদয়ে তার
যে-কোনো বন্ধ্যা মহিষের মতো শুধু শূন্যতার ভার।

সদ্য-বিবাহিত খালির মেয়েটিকে অবচ দেখ। সকৌতূহলে
সে মেয়েটিকে গোপনে প্রশ্ন করে। মেয়েটির
নতুন-পাওয়া রূপ শ্রাবণে গাছের মতন
নতুন তাওলাট মতো চকচকে ; সুখ যেন শিশির,
অবিরল করবে তাকে একটু ঝাঁকালেই।
মেয়েটির দেহটি নিটোল, যেন পেটানো পিতল ;
পুরুষের গায়ে নাকি গ'লে গেল, গ'লে হ'লো জলের পুতুল ;
এখন সে নাকি তার আদরে-শিশুকে দেখে চোখ বুজলেই।

দুপুর ক্রমে সন্ধ্যা হয়। সে সোজা হ'য়ে ব'সে—
ভিত্তিতে শিকারি জেলের মতো নিশ্চুপ, সজাগ। কোনো
অসম্ভব কল্পনা সে তার তীব্র শ্বাসবায় রুদ্ধে
নীরবে এক হংসীর মতো তা দিচ্ছে।

শীতের রাত্রে যেমন কৌটায়-কৌটায়
খেজুরের গাছ ঘ-দেহের রসে পাত্র ভরায়
তার বাসনা আর বেদনা জ'মে-জ'মে এতকাল পরে
আজ উপচে পড়লো। বাসনায় মাধব মইলের প্রভাবে
সে হয়ত তার ইচ্ছার তীব্রতা দিয়েই, উচিত স্বামীর অভাবে,
ওরসে সন্তান আনবে। অথবা
তার চিত্তে
কোনো সহজ সুক্ষ্ম, বিষাদের মত মন্দ,
মালির মেয়েটির মতো জীবনের আহেলি,
যে বৃষ্টি আনবে। নিস্তব্ধের থালি
ভ'রে দেবে আকাঙ্ক্ষিত ধ্বনে। এতকালের ফাঁকি
ঘুচবে তখন, নামবে সুখের পাখি।

ইতিহাস

শঙ্খরাজ মুখোপাধ্যায়

সিন্ধুসভ্যতার মোড়া দীর্ঘ ইতিকথা।
তোরঙ্গের এক কোণে ঘুম গুঁজে আছে,
শত নাম, নামাবলী কত অখণ্ডতা
প্রসাধন দ্রব্য, দাগ আয়নার কাছে ;

যাদুর পুরুষ-নারী রটে মুখে-মুখে,
কৌলীন্য গর্বের বস্তু অধম সেকালে—
লক্ষ প্রেমে দিন কাটে কী জানি কী সুখে,
সিন্ধুসভ্যতার ব্যথা বুঝি না একালে !

কবিতা
বর্ষ ২০, সংখ্যা ১

যৌবন

হুমায়ুন কবির

তোমারে চলিতে হবে অতীতের দীর্ঘ ইতিহাস।
সহস্র বৎসর ভরি ভারতের একপ্রান্ত হতে
অন্য প্রান্তে বহিয়াছ যৌবনের দুর্নিবার স্রোতে
চূর্ণ করি জীর্ণ জরা। জীবনের নবীন আশ্বাস
রচিয়াছ ছন্দে গানে রূপতির ভাস্কর পাষাণে।
মানো নাই কোনো বাধা, আচারের প্রাচীন নিষেধ,
ভেঙেছ উল্লাসভরে বর্ণ শ্রেণী জাতি ধর্ম ভেদ,
রক্তে মিশিয়াছে রক্ত, প্রতিধ্বনি প্রাণ হতে প্রাণে।

কী মোহে হয়েছ অন্ধ? মুক্তি কোথা বন্ধনের মাঝে?
লঙ্ঘি দেশ জাতিভেদ আজি বিশ্বমানব চলিছে
এক-যাত্রা-লক্ষ্য পানে যৌবনের বেগে দুর্নিবার—
সেই অগ্রগতি তুলি ফিরিয়া আসিবে আজি পিছে
সংকীর্ণ সীমার মাঝে অতীতেরে করি অঙ্গীকার?

পশ্চাতে ফিরিবে যারা মুগ্ধ হবে অপমানে লাজে।

চন্দ্রকুমার পাল্লী

বিষ্ণু দে

বহু দীর্ঘ পরিক্রমা, নীল কন্যাকুমারিকা থেকে
নদনদী মাঠক্ষেত পাহাড়পর্বত পার হ'য়ে
ডিঙিয়ে অগস্ত্যবিন্ধ্য, গঙ্গার মুক্তির গাহনে
লঘিমা সর্বাঙ্গে মেখে দুর্গটির জটা ব'য়ে শেষে
মন্দাকিনী নির্ঝরের শীকরবীজন দুর্জ্ঞেয়নে
এসেছি, এখানে হাওয়া স্বচ্ছ নীল অনিমা বিথারে,
প্রৌঢ়ের প্রশান্তি মেলে থেকে থেকে ঈথারে নিশ্বাস ;
তন্দ্রযান্ত দিবাস্বপ্নে ভাসে মেঘি স্থবির বুদ্ধের
সম্পূর্ণ স্মৃতির রাত্রি আসমুদ্র হিমাচলে স্থির :
কন্যাকুমারিকা থেকে অভিযাত্রী আমি শ্রান্তিহীন
এবারে পৌঁছব বুঝি কৈলাসের দিন পার হ'য়ে
সাংগের উৎসের জলে সর্বগ্লানি মুক্তির রোদনে
ধুয়ে দেব, শুভ্র হিমে আমৃত্যু রইব শুধু চেয়ে,
সৌন্দর্যে বিধুর শুব্ধ, ত্রিনয়নে যেমন পার্বতী।

গান

অমিয় চক্রবর্তী

ভালোবাসার বদলে আর কী বলো যায় দেয়া,
কেবল ভালোবাসা—
সব-হারানো সব-পাওয়ানো তাহার ভরা ভাষা
চোখের জলে ভাসা গো
স্বর্গ খেলায় স্বর্গ-নেয়া-দেয়া।

কখন দূরের ছায়া আনে সুদূরদিনের সোনা
গগন ছুঁড়ে শুরে ব্যথার কোণা—
গাছের শব্দ যত্ন শোনায় গো,
অনেক দুখের আশা, বঁধু, অনেক সুখের আশা—
ভালোবাসায় দিনে তখন কতই কাঁদা হাসা—
তাইতে যাওয়া-আসা গো,
চিরদিনের বাসা॥

কলকাতা
৩০ জুলাই, ১৯৫৭

দুই

কেউ বা আলো কেউ বা আগুন কেউ বা জল
তোদের নাম কী বল।
ভুবনডাঙার মানুষ আমি এলেম তোদের অনুগামী
ডাকনামেতে জানি ডাকার ছল।
ও সাথের কানু মধু, কাসের তামিজ নিমাই যদু,
আসল নাম কী বল।
কেউ বা ভুলো, কেউ বা ধুলো, কেউ বা কল॥

ঘাব গাঁয়ের পার
হাটের বেলা শেষ হ'লে যাই শাঙন নদীর ধার—
তোদের নাম কী বল ?
কেউ বা মাসি পিসি খুড়ো সঙ্গী সাঙাৎ মোড়ল বুড়ো,
ভুবনডাঙার মেয়েছেলের দল।
শর্ষে ক্ষেতে বৌমাছি ঘুল, নামে নামে মন ভ্রমকুল
আসল নাম কী বল ॥

ওয়াল্ট হুইটম্যান—একশো বছর পরে

'Do I contradict myself ?
Very well, then, I contradict myself :
(I am large—I contain multitudes.)

—'Song of Myself'

কোনো কবিকে যাচাই করবার পক্ষে একশো বছর সময় বিতান্ত কম বলব না। কিন্তু কবি হিসেবে ওয়াল্ট হুইটম্যানের আসন এখন পর্যন্ত কেমন অনিশ্চিত থেকে গেছে, সকলের চাইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র। যেন এখনো আমরা তাঁর বিষয়ে ভালো করে মনস্থির করতে পারছি না। এবং এ-অবস্থাটা গত একশো বছর ধ'রেই চলছে। একদল আছেন, হুইটম্যান যাঁদের কাছে গণতন্ত্রের মহাকবি তো বটেই, তার চাইতেও আরো কিছু। হয়তো বড়ো কিছু। তাঁদের কাছে তিনি পরমপুরুষের অবতার, ভাবী যুগের স্বপ্ন সফল করার বীজ বুনেছেন মানুষের প্রাণে, আধুনিকতম বিপ্লবের প্রথম চারণ কবি তিনি। এঁদের মনের মধ্যে হুইটম্যানের যে দেবদুর্লভ শক্তিধর মূর্তি আঁকা তার সঙ্গে টলস্টয়ের সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। একটু হয়তো বেশি ছিটকাট, কিন্তু মাথা ভরা সেই এলোমেলো শুভ্র কেশ, টল্‌ষ্টয়েও যা চাপা

পড়েনি : বিস্তৃত শ্মশ্রুরাশি আগুনের খেত শিখার মতো মুখটিকে ঘিরে আছে : বিশ্বের বেদনা ভরা গম্ভীর ডাগর চোখে দৃঢ়তা আর প্রত্যয়। হুইটম্যান বলতে এই 'good gray poet'-এর কথাই মনে পড়ে তাঁদের, যিনি লিখেছেন :

> I speak the pass-word primeval—I give the sign of democracy :
> By God ! I will accept nothing which all cannot have their counterpart of on the same terms.

এবং যাঁর কবিতা পড়ে এমার্সন বলেছিলেন : 'incomparable things, said incomparably well'। অন্যদিকে ছিলেন সমাজের প্রতিপত্তিশালী আর এক বৃহৎ গোষ্ঠী, হুইটম্যানকে যাঁরা কোনোদিন ক্ষমা করতে পারলেন না। সুনীতিকাতর সাধু ভিক্টোরীয় ইংলণ্ড যখন টেনিসনীয় গুঞ্জনে মুখর, সমুদ্রের অন্ত পারে, আজ থেকে একশো বছর আগেকার আধা-শহর ব্রুকলিনে ব'সে, পাঠকের অনভ্যস্ত ভাবে-ভাষায় এ-ধরনের ইংরেজি কাব্য রচনা করা নিশ্চয়ই স্পর্ধার কথা। এবং সে-স্পর্ধাকে ভদ্রভাষায় ঘোলায়েম ক'রে বলারও কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না সেই যুবকের রচনাতে। ১৮৫৫ সালে লেখকের নিজের খরচে ছাপা '*Leaves of Grass*'-এর সেই 'আদি সংস্করণ প্রায়ই কয়েদ না কেউ-কেউ। চিরাচরিত সমিল-অমিল ছন্দের আবাধিক শৃঙ্খলা নেই এ-কবিতায় ; বিষয়বস্তুর বাছবিচার নেই কোনো ; বিশ্বপৃথিবীর সব কিছুই নির্বিচার উৎসাহ নিয়ে কাব্যের কটাহে ঢালা হয়েছে। এ-জিনিস সহ্য করা বাস্তবিকই কঠিন। তাছাড়া ওত্র সজ্জনের মতো টেনিসন তাঁর কাব্যে মাতৃস্তন্যের উল্লেখও যখন সলজ্জভাবে এড়িয়ে চলছেন, অকাব্যিক স্থূলবস্তু জ্ঞানে যাহ জিনিসটার মতো নিরীহ একটি প্রাণীর স্পষ্ট প্রসঙ্গও যখন পোয়েট-লরিয়েট-এর রচনা থেকে নির্বাসিত, তখন হুইটম্যান কিনা মানুষের যৌন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সংগমাদির কথা পর্যন্ত অক্লেশে চালিয়ে দিলেন তাঁর কবিতায় ! শুধু চালিয়ে দিলেন না, রীতিমতো তর্কিতভাবে তার স্তব রচনা করলেন। এই সব গোপনীয় 'লজ্জা'র কথা এত স্পষ্ট ক'রে কবিতায় যে বলা যায়, বলা উচিত, একশো বছর আগে তা কল্পনায় ছিল না কারো। ভিক্টোরিয়ানদের তুলনায় রানী এলিজাবেথের প্রজাবৃন্দের মনে

লক্ষ্যভ্রষ্ট যথেষ্ট পরিমাণে কম ছিল বটে, কিন্তু দেহের বন্দনায় এতদূর রক্তস্নান উল্লাস এলিজাবিথান কাব্যেও নেই।

If anything is sacred, the human body is sacred.
And the glory and sweet of a man, is token of manhood untainted:
And in man or woman, a clean, strong, firm-fibred body is beautiful
as the most beautiful face.

কিংবা

I have said that the soul is not more than the body.
And I have said that the body is not more than the soul;
And nothing, not God, is greater to one than one's self is.

এ-ধরনের নাস্তিকজনোচিত কথা উচ্চারণ করার জন্য জাত-খোয়ানো ধর্মদ্রোহীর কোনো কবির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেকালের বিবেকবান সজ্জন পাঠকমণ্ডলীর অতটা সহ্য হয়নি। তারপর ক্রমে যখন শুধু নারীর প্রতি নয়, পুরুষের প্রতি পুরুষের ভালোবাসার কথাও বিনা কুণ্ঠায়, অসংকোচে কবিতা ক'রে লিখতে পারলেন হুইটম্যান তখন, তাঁর ভক্তবৃন্দ যা-ই বলুন, সমাজের গণ্যমান্যদের পক্ষে মুখ বুজে সহ্য করা কঠিন হোলো। 'অশ্লীল' লেখার দায়ে ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টিরিয়র থেকে চাকরি গেল হুইটম্যানের। অথচ আশ্চর্য এই—তাঁর কাব্য বিষয়ে এত রকমের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও প্রতি নতুন সংস্করণে *Leaves of Grass*-এর কলেবরের মতোই হুইটম্যানের খ্যাতি প্রতিপত্তি দিনে দিনে বেড়েই গেছে। এমন কি যাঁরা তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামটিই শুধু শুনেছেন, তাঁদের কাছেও এ-কথা অজানা নেই যে দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে 'অমর'দের সঙ্গে আসন নিয়েছেন এই কবি।

ব্যক্তিগত জীবনে নিতান্ত নিরীহ নির্বিবাদী ভদ্রলোক ছিলেন হুইটম্যান। বিক্রম, তেজ, পাণ্ডিত্যাভিমান—কোনো কিছুরই পরিচয় দেননি তাঁর কার্যকলাপে। ব্যায়রনের মতো বেপরোয়া মাতব্বরি চালান দেবার চেষ্টা করেননি কোনোদিন, ড্যান গোর মতো বীর কর্তৃক্ষেপ করেননি কোনো উন্মাদ মুহূর্তে। খবরের কাগজের আপিসে টাইপ সাজিয়েছেন, প্রুফ দেখেছেন, সম্পাদনার কাজও

করেছিলেন কিছুদিন। ঐ পর্যন্ত। তারপর সামান্য কিছুকাল নিউ অর্লীন্সে কাটিয়ে আসার পর কী ক'রে কী আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটলো তাঁর জীবনে, তা জানা যায় না। সলজ্জ কুণ্ঠিত অস্ফুট যার গলায় আবৃত্তি ঘরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ঠিকমতো পৌঁছত না, বন্ধের মতো আত্মপ্রত্যয়ের প্রবল নির্ঘোষে হঠাৎ তাঁর কবিতায় যেন আকাশ ভেঙে নেমে এলো :

Walt Whitman am I, a Kosmos, of mighty Manhattan the son.
Turbulent, fleshy and sensual, eating, drinking and breeding :
No sentimentalist—no stander above men and women, or
apart from them ;
No more modest than immodest.

Through me many long dumb voices :
Voices of the interminable generations of slaves
Voices of prostitutes, and of deform'd persons :
Voices of the diseas'd and despairing, and of thieves and dwarfs...
I believe a leaf of grass is no less than the journey-work
of the stars. .....

স্বীকার করতেই হবে—আশ্চর্য উন্মাদনায় ভরা এ এক সম্পূর্ণ নবীন কবির কণ্ঠস্বর, ইংরেজি কাব্যের ইতিহাসে এমনটি আর শোনা যায়নি। ক্লান্তিকর দীর্ঘতা এবং কাব্যের নামে নানা বিচিত্র জিনিসের একঘেয়ে তালিকা করার দিকে ঝুঁকার প্রবণতা সত্ত্বেও এ-কবিতার সম্মোহন এড়ানো কঠিন। অনুচ্চার্য যৌন প্রসঙ্গের অস্পৃষ্টতা কোথায় ভেসে চ'লে গেল। দূর হয়ে গেল আত্মার মুক্তির জন্য দৃষ্টির উদ্বেগ-আর ব্যাকুলতা। ব্যক্তির বে-কৈবল্যকে মানুষের মহামূল্য অধিকার ব'লে আজ আমরা স্বীকার ক'রে নিয়েছি, তার সপক্ষে প্রথম প্রবল কণ্ঠ শোনা গেল এই কবিতায়। কিন্তু এই বিস্ময়কর আত্মকীর্তনের নায়ক, কে এই 'I, Walt Whitman'? প্রেমে ব্যর্থ, জীবিকায় ব্যর্থ, নামগোত্রহীন কোয়েকার পরিবারের ছেলে, ব্রুকলিন নিবাসী কয় সাংবাদিক Walter Whitman-এর মধ্যে 'turbulent, fleshy and sensual, eating, drinking and breeding' নায়কটিকে আবিষ্কার করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র।

'লীভস অব গ্রাস' প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে তাকে মহৎ কাব্য ব'লে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন যিনি, সেই এমার্সনও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি যে 'Walt Whitman' -সত্যি-সত্যি কোনো জীবিত ব্যক্তির নাম এবং চিঠি লিখলে রুক্সলিনের ডাকঘর তা যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দিতে পারবে। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত জীবনের লেখকের সঙ্গে শিল্পীর ব্যানমূর্তিকে তিনি একাকার করার কথা ভাবতে পারেননি। অথচ, তাঁর অন্য ভাবকদের মতোই, সেই ভুলটি ক'রে বসলেন লেখক স্বয়ং—Walter Whitman হলেন Walt Whitman, এবং নিজেকেই নিজের কাব্যের নায়ক ব'লে পরিচিত করার প্রাণপণ চেষ্টায় সমস্ত জীবন ব্যয় করলেন তিনি।

কাব্যের আলোচনায় এ-প্রসঙ্গ হয়তো অবান্তর। কিন্তু শিল্পী আর ব্যক্তির অদ্বৈতে বিশ্বাসী যাঁরা, তাঁরা নিশ্চয়ই ওঁদের স্বর্গলোকবাসী কবির বহুবিধ কীর্তিকলাপ অবগত হলে বিশেষ বিচলিত বোধ করবেন। যৌবনে নারীসংসর্গে ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ-এরও 'পতন' হয়েছিল, কিন্তু সে-সব কথা সযত্নে গোপন করার চেষ্টাই করেছেন সেই প্রকৃতির প্রিয় পুরোহিত। আর নিজের আকাট পৌরুষের সপ্ত-সপ্ত প্রমাণ উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে হুইটম্যান যে-পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা আরো মজার। তিনি এক অবৈধ প্রণয় এবং তজ্জাত জারজ সন্তানদের কথা সদর্পে নিজের নামে প্রচার ক'রে বেড়াতেন, যদিও ব্যাপারটা, যদ্দূর জানা যায়, নিতান্ত স্বকপোলকল্পিত। 'লীভস অব গ্রাস'-এর মতো কাব্যগ্রন্থের লেখককে বিখ্যাত হবার জন্য কৌশল করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বইয়ের প্রথম উচ্ছ্বসিত রিভিউটি কবি স্বয়ং লিখে পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন, যাতে কবির বিষয়ে বলা হয়েছিল :

If health were not his distinguishing attribute, this poet would be the very harlot of persons. Right and left he flings his arms, drawing man and woman with undeniable love to his close embrace, loving the clasp of their hands, the touch of their neck and breast, and the sound of their voices.... He must recreate poetry with the elements always at hand.

অবিশ্যি আগে ভাবতে যে নিজের বিষয়ে এ-রকমের নির্লজ্জ বাটকীয় বিবরণ কেউ নিজে লিখে ছাপাতে পারেন। শুধু কি তা-ই! ১৮৬৭ সালে জন্ বারো নামে এক ভদ্রলোক *Notes on Walt Whitman, Poet and Person* নামে যে প্রশস্তি রচনা করেছিলেন তার প্রায় অর্ধেকটাই হুইটম্যান নিজে লিখে দিয়েছিলেন।

যার দুর্বল মুহূর্তে কবি নিজে যাই ভাবুন, প্রকৃতপক্ষে এ-কাব্যের নায়ক ওল্ড হুইটম্যান হচ্ছেন মাটির তিলক-পরা নতুন যুগের সামান্য মানুষেরই কল্পিত মূর্তি. অতীতের যাবতীয় রুক্ষতাকে উড়িয়ে দিয়ে, ডেমোক্রাসির খোলা রাস্তায় অন্তহীন সম্ভাবনার দিকে যে-মানুষ যাত্রা করেছে। অন্তত হুইটম্যান তাঁর স্বপ্নেই দেখেছিলেন। ধুলোয় ভরা খোলা রাস্তায় এই আশ্চর্য পাঁচালির মধ্যে অতিমানবের মহিমা কীর্তন করেননি হুইটম্যান :

> The New World needs the poems of realities and science and of the democratic average and basic equality....Without yielding an inch the working man and working woman were to be in my pages from first to last. The ranges of heroism and loftiness with which Greek and feudal poets endow'd their gold-like on lordly-born characters—indeed prouder and better based and with fuller ranges than those—I was to endow the democratic averages....

তিনি বিদগ্ধ সমাজে প্রিয় হতে পারলেন না, এবং তাঁর কাব্যের বিষয়ে আমরা এখনো মনস্থির করতে পারি না. তার কারণ এখন যে তাঁর কবিতায় পুরুষ-প্রেমের কথা বড় বেশি স্পষ্ট ভাষায় উপস্থিত. (সচিত্র সুলভ বঙ্গানুবাদের সাক্ষ্য সত্ত্বেও কে না জানে—ওমর খৈয়ামের 'সাকি' কোনো নবীনা যুবতী নয়, নবীন কিশোর মাত্র।), কিংবা যেহেতু তাঁর কবিতা 'অশ্লীল'। হুইটম্যানকে আমাদের ক্লান্তিকর লাগে—যেহেতু তাঁর কবিতা অনাবশ্যক রকমের দীর্ঘ, আর অসহ্য পুনরাবৃত্তিতে ভরা। অতীতের কারাগার থেকে মানুষের মুক্তির যে-কল্পিত আনন্দে আত্মহারা না হলে এ কবিতা লেখা সম্ভব হতো না, সেই আনন্দের আতিশয্যেই তিনি বহুতর নতুন আবর্জনাকে তাঁর

কবিতায় স্থান দিয়েছিলেন—বিষয়টা সেখানে আনকোরা কাঁচা বিষয় হয়েই টাঁকে রয়েছে, কাব্যের আলো প'ড়ে তাহার রূপান্তর ঘটতে পারেনি।

আঠারো বছর আগে কলকাতায় হুইটম্যান-স্মৃতিসভার উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'প্রকাণ্ড একটা ধনি, ওর মধ্যে নানান কিছু নির্বিচারে মিশোল আছে, এ-রকম সর্বগ্রাসী বিমিশ্রণে প্রচুর শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন—তাহার কালের বহুত্বরার সেটা ছিল—তার কারণ তার মধ্যে আগুন ছিল প্রচণ্ড—এই আগুনে নানা মূল্যের জিনিস গ'লে মিশে যায়। হুইটম্যানের চিত্তে সেই আগুন ধা-তা কাণ্ড ক'রে বসেছে। জাগতিক সৃষ্টিতে যে রকম নির্বাচন নেই, সংঘটন আছে, এ সেই রকম। ছন্দোবন্ধ সব লণ্ডভণ্ড—যাকে যাকে এক একটা ফুলংলের রূপ ফুটে উঠে আবার যায় মিলিয়ে। যেখানে কোনো খাচাই নেই, সেখানে সকলের সব স্থানই স্বস্থান। এক ঝোঁকে সাহিত্যকে লঙ্ঘন ক'রে গিয়েছে এই জন্যে সাহিত্যে এর জুড়ি নেই—মুখরতা অপরিমেয়—তার মধ্যে সাহিত্য অসাহিত্য দুই সঙ্কলন করছে আদিম যুগের মহাকায় জন্তুদের মতো। এই অরণ্যে ভ্রমণ করতে হলে মরিয়া হওয়া দরকার।" —নিছুর মনে হলেও একশো বছর পরে কবি হিশেবে হুইটম্যানকে এর চাইতে বড়ো ব'লে স্বীকার করা সম্ভব নয়। তবে কথা হচ্ছে এই যে তা নিয়েই যে-কোনো কবি নিশ্চিন্তে 'অমর' হতে পারেন।

হুইটম্যানের ধারাটি যেন ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেছে আধুনিক কাব্যে : কার্ল স্যাণ্ডবার্গ ছাড়া তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং মহা-পৃথিবীতে তাঁর বিষয়ে ভক্তের সংখ্যা বিস্ময়কর রকমের কম। 'লীভস অব গ্রাস'-এর একশো বছর পূর্ণ হল, সেই উপলক্ষে কিছু-কিছু আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে বটে। কিন্তু ইতিপূর্বে তাঁর বিষয়ে সপ্রদ্ধ আলোচনা আছে, আধুনিকদের মধ্যে, একমাত্র লরেন্সের প্রবন্ধে ; সেখানে তাঁকে "first white aboriginal" ব'লে অভিনন্দন জানিয়েছেন লরেন্স, কেননা, আর যাই হোক, দেহচ্যুত আত্মার কল্যাণচিন্তায় বিচলিত ছিলেন না হুইটম্যান। কিন্তু লরেন্সও আক্ষেপ করেছেন যে শেষ পর্যন্ত জীবনসর্বস্বতায় এই নব নীতিতে বিশ্বস্ত থাকতে পারেননি হুইটম্যান। তাঁর কাব্যেও ডেমোক্রাটিক 'সহানুভূতি'

অবশেষে শ্রদ্ধা, করুণা আর প্রেমেই পর্যবসিত হয়েছে—যে-পথের শেষে ক্যালভরিতে হয়তো পৌঁছনো সম্ভব, তার পরে রাস্তা নেই।

আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ব'লেই এই সূত্রে এজরা পাউণ্ডের কবিতাটিও স্মরণে পড়বে, হুইটম্যানের সঙ্গে প্রকাশ্যে যিনি আধুনিকদের আত্মীয়তার কথা ঘোষণা ক'রে লিখেছেন :

> I make a pact with you, Walt Whitman—...
> It was you that broke the new wood.
> Now it is a time for carving.
> We have one sap and one root—
> Let there be commerce between us.

আধুনিকদের সঙ্গে এইখানে হুইটম্যানের যোগ যে বোদলেয়ারের মতো তিনিও ছিলেন ব্যাপ্তিক কবি—অন্তত অংশত তা-ই—শতবর্ষ পূর্বেকার স্কলিন, মানহাটানকে যতদূর নগর বলা যায়, তার। ইংরেজি কবিতার ভাষাকে তিনি ছন্দের নূপুর-পরা নৃত্য থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এবং জন্ম-মৃত্যু, প্রেম লালসা জৈবতা আর দৈবতা সমেত পুরো মানুষটিকে সমগ্রের সঙ্গে স্বীকার করতে তাঁর 'বিবেকে' বাধেনি।

'লীভস অব গ্রাস' যখন প্রকাশ হয়, বাংলা সাহিত্যে তখন মাইকেলের যুগ চলছে। ইংরেজি এবং ইওরোপীয় সাহিত্যের প্রেরণা নিয়ে মাইকেলও পয়ার ভেঙে অমিত্রাক্ষরের জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু হুইটম্যান আর মাইকেল,—দুয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। পরিচয় সম্ভব ছিল না, অর্থাৎ আদান-প্রদান, যাকে পাউণ্ড বলেছেন 'commerce'। পরে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে হুইটম্যানের কবিতায় ক্লাস নিয়েছেন। কিন্তু দুই কবির মানসিক চরিত্র এতই ভিন্ন যে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে স্কলিনের কবির কোনো সুদূর প্রতিধ্বনিও খুঁজতে যাওয়া বৃথা। অবশ্য 'লীভস অব গ্রাস' সবটাই যে প্রাণোন্মাদ দুষ্করতার কাব্য তা নয়—'I Sit And Look Out'-এর মতো বিষণ্ণ গম্ভীর আটোসাঁটো কবিতাও আছে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' ('ভগবান, তুমি যুগে যুগে')—কবিতার সঙ্গে, বিশেষ ক'রে, এ-কবিতাটির সাদৃশ্য থাকলেও

থাকতে পারে না। সেটা কোনো বলবার মতো কথা নয়। আসলে হুইটম্যানকে আবিষ্কারের উৎসাহ নিয়ে বাংলা কবিতায় প্রথম প্রবেশ করলেন 'কল্লোল'-যুগের কবিরা, বিশেষ ক'রে প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিন্তু ইওরোপীয় ট্র্যাডিশান তাঁদের যে-বলিষ্ঠ প্রেরণা থেকে 'Song of Myself'-এর মতো কবিতার উত্থান—বাংলাদেশের পরিবেশে কোথায় সেই প্রেরণা? গ্রীক থেকে শুরু ক'রে তাবৎ ইওরোপের সমস্ত কবিরা দাঁড়িয়ে আছেন হুইটম্যানের পিছনে—যাদের অস্বীকার করবার মতো স্পর্ধা দেখাতে পেরেছিলেন তিনি। 'কল্লোল'-যুগে বিদ্রোহী নবীন বাঙালি কবির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন একা রবীন্দ্রনাথ। হুইটম্যান যেখানে সমগ্র জীবনের বন্দনাগানে মুখর, সেখানে বাংলাদেশের কবি মৃদুকণ্ঠে লিখছেন :

> আমি কবি তাই কবে'র আর কবে'র
> বিলাস বিলুপ্ত মনে'র যত স্বপ্নের তরে তাই,
> সময় যে হায় নাই।

'তাই' 'হায়' আর অনুপ্রাস ভরা ছন্দ মিল অবশ্য এই ঘোষণার চাইতে ভিন্ন রকমের ইঙ্গিতই করে। আর যা-ই হোক, হুইটম্যানকে সর্বহারার কবি ব'লে গণ্য করা, তাঁকে আংশিক, কাজেই ভুল, বোঝা। বাংলা কবিতায় হুইটম্যানের সুর বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের সচেতন পরিশ্রম সত্ত্বেও তাই মেকি প্রতিধ্বনি হ'য়েই শেষ হ'য়ে গেল।

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রবণতা অন্য দিকে। তার মধ্যে 'লীভস অব গ্রাস'-এর সরল প্রাণোন্মাদনার স্থান নেই। কিন্তু এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে হুইটম্যান মহৎ কবিদের অন্যতম। এবং ভূরিপরিমাণ বর্জনীয় অংশ উপেক্ষা করলেও যা থাকে তাই নিয়েই তাঁর আশ্চর্য কাব্যগ্রন্থ মহৎ কবিতার স্বাদ এনে দেয়।

সুরেশ গুহ

এমিল ভেরহারেন (১৮৫৫-১৯১৬)
Constant Montald কর্তৃক পেন্সিল স্কেচ

ভেরহারন-প্রসঙ্গে

[এমিল ভেরহারন বিষয়ে তাঁর সমসাময়িক দু-জন লেখকের মন্তব্য এখানে অনুবাদে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি : একজন স্তেফান এসোয়াইখ, তাঁর আত্মজীবনী ও ভ্রমণ অনুবাদক, আর-একজন রাইনার মারিয়া রিলকে। এতে ভেরহারন-এর কাব্য ও ব্যক্তিস্বভাবের যে-ইঙ্গিত ধরা পড়বে, তাতে হয়তো অপরিচিত পাঠকও তাঁর ভক্ত হ'য়ে পড়বেন। এটা লক্ষণীয় যে দু'জন লেখকই ভেরহারন-এর কবির প্রথম সমবয়সে ঘটে—ব্রাসেল্স-এ, জর্মনিতে, এবং তাঁর কোনো কোনো বন্ধুর প্রথম পরিচয় হয় জর্মনিতে এবং রাশিয়ায়। স্পষ্টত, জর্মন ভাবনের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিলো তাঁর, অথচ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জর্মনির বিপক্ষে তাঁর লেখনী মুখর হ'য়ে উঠেছিলো। রঁলাঁ ঠিকই বলেছিলেন—যুদ্ধের সময়ে দুই পক্ষ সমানই কবির কাছে।—সম্পাদক]

১. স্তেফান এসোয়াইখ-এর আত্মজীবনী থেকে

আমার ভবিষ্যতের পথ আমার মনের সামনে পরিষ্কার ছিলো। অনেক দেখবো, অনেক শিখবো—তারপর আরম্ভ। অকালে আত্মপ্রকাশের তাগিদে পা বাড়াবো না—প্রথমে শিখে নেবো এই জগতের ও জীবনের মূলসূত্র। বার্লিনের তীব্র পবন আমার তৃষ্ণা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো : মনে-মনে ভাবছিলাম এই গ্রীষ্মে কোন দেশে বেড়াতে যাওয়া যায়। বেছে নিলাম বেলজিয়ম। কেননা সেখানে, সেই শতকান্তিক সময়ে, শিল্পকলায় এমন একটি প্রেরণা জেগে উঠেছিলো, যার তুলনায়, এমনকি, ফ্রান্সকেও ঈষৎ ম্লান মনে হ'তো কখনো-কখনো। চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, কাব্যে, ইংরোপের যৌবনের তেজ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিলো বেলজিয়মে। তার মধ্যে যিনি আমাকে গভীরতম মুগ্ধ করেছিলেন, যাঁর রচনায় আমি গীতিকাব্যের সম্পূর্ণ একটি নতুন পথ দেখতে পেয়েছিলাম, তিনি—এমিল ভেরহারন। কিন্তু আমার এই আবিষ্কার ছিলো ব্যক্তিগত, প্রায় গোপন, কেননা তখন পর্যন্ত জর্মনিতে কেউ তাঁকে জানে না, আর সাহিত্যের কর্তৃপক্ষীয়রা তাঁকে গুলিয়ে ফেলছেন ভেরলেনের সঙ্গে, ঠিক যেমন রঁলাঁকেও অনেকে রত্তী ব'লে ভুল করছেন। আর নিঃসঙ্গভাবে ভালোবাসা মানেই দ্বিগুণ ক'রে ভালোবাসা।

কিন্তু এখানে একটু থামলে বোধহয় ভালো হয়। এই বর্তমান যুগে, যখন জীবনের লয় অত্যন্ত দ্রুত, অভিজ্ঞতা অপরিমাণ, এই যুগের বিস্মৃতিপ্রবণ মানুষদের মধ্যে ক-জনের কাছে ভেরহারনের নামের কোনো অর্থ হয়, জানি না। তিনি চেয়েছিলেন ইওরোপকে ঠিক তা-ই দিতে হয়, যা মাকিন-দেশকে দান করেছিলেন ওল্ড হুইটম্যান—আমার যোবনা, বর্তমান আর ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস : সকল কবাশি আমার কবির মধ্যে তিনি [illegible] : এমিল ভেরহারন। আধুনিক জগৎকে ভালোবেসেছিলেন তিনি, ভালোবেসে তাকে জয় করতে চেয়েছিলেন কবিতার জন্য। অন্যদের কাছে যন্ত্র ছিলো অশুভ, নগর কুৎসিত, বর্তমান কাল কবিত্বহীন ; কিন্তু প্রত্যেকটি নতুন উদ্ভাবনে, যান্ত্রিক কৃতিত্বে তাঁর ছিলো অগাধ উৎসাহ, আর তাঁর সেই আনন্দ লক্ষ্য ক'রে তিনিই আমার আনন্দিত হ'য়ে থাকতেন। এইভাবেই কাজ ক'রে যেতো তাঁর চেতন মন, আরো তীব্র ক'রে তুলতো আবেগ। আর এমনি ক'রেই তাঁর প্রাথমিক অন্ধকারিমাণ কবিতাগুচ্ছ বেড়ে উঠেছিলো পরবর্তী মহান বন্দনার প্রস্তবণে। 'Admirez-vous les uns les autres' ('পরস্পরের গুণগ্রাহী হও') [illegible] ইওরোপের মানবের উদ্দেশে তাঁর বাণী। আমাদের যৌবনকালের সমস্ত আশাকে তিনিই প্রথম কাব্যের মধ্যে ব্যক্ত করেছিলেন—যে-আশা এই নিদারুণ অন্ধকারের দিনে কিছুতেই বোঝা যায় না আর। ইওরোপের আর মনুষ্যত্বের যে-স্বপ্ন তখন আমরা দেখেছিলাম, সেই স্বপ্ন বহুকাল ধ'রে বিধৃত থাকবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাবলীতে। আমার ব্রাসেলসে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিলো ভেরহারনের সঙ্গে দেখা করা।

[ব্রাসেলসে এসে যোগাযোগ করলেন, ভেরহারন সেখানে নেই, এবং কবির স্ত্রীকুষ্ঠির ভেতর পড়ে আছেন। কিন্তু কবির বন্ধু আঁদ্রে জিদ ফ্রান্সে-এর অধিবেশন থেকে বিশ্রামে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে কবির সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো।]

দুপুর হ'লো, আমরা খাবার ঘরে এসে বসলুম—সেখানে রঙিন শার্সির ভিতর দিয়ে রাস্তাটা চোখে পড়ে। হঠাৎ জানলার সামনে একটা ছায়া যেন থামলো। আঙুলের টোকা পড়লো রঙিন কাচে, সঙ্গে-সঙ্গে ঘণ্টা বেজে

উঠলো জোরে। "ঐ যে!" ব'লে শ্রীযুতা ভ্যান ত্যাসেন উঠলেন। আমি ভাবছিলুম ব্যাপারটা কী—কিন্তু তক্ষুনি দরজা খুললো; জোয়ালো, গম্ভীর পা ফেলে ভিতরে এলেন—হেরআরন। ফোটোগ্রাফ থেকে তাঁর মুখ আমার চেনা ছিলো; দেখামাত্র চিনতে পেরেছিলুম। এই বাড়িতে প্রায়ই আসেন তিনি, আমারও প্রত্যাশিত ছিলেন; কিন্তু আমাকে অবাক ক'রে দেবার জন্য ত্যাসেন-দম্পতি আগে আমাকে কিছুই বলেননি। এখন তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন; তক্ষুনি গৃহকর্তার চাহুনীটুকু বুঝে ফেলে হাসিমুখে তাকালেন আমার দিকে। এই প্রথম আমি দেখলাম তাঁর বন্ধু, কোমল দৃষ্টি, প্রথম অনুভব করলাম তাঁর প্রবল হাতের আঁকড়ে-ধরা ঘনিষ্ঠতা। উৎসাহে আর বাস্তার বেগে তখনও হ'য়ে এসেছেন—সর্বদাই তা-ই আসেন তিনি। খাবারে হাত দিতে-দিতেই কথা বলতে আরম্ভ করলেন। গিয়েছিলেন বন্ধুদের কাছে, তারপর এক চিত্রশালায়—সেই সংস্পর্শে ঝলমল করছেন এখনো। এ-ই তাঁর চরিত্র, এমনি ক'রেই আসেন তিনি সব সময়, উদ্বুদ্ধ, উজ্জ্বল, আনন্দিত—অনেক সময় উপলক্ষ্যটা তুচ্ছ, কিন্তু উৎসাহ তাঁর জীবনে একটি পবিত্র অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, যেন কোনো আগুনের শিখা অবিরাম নিশ্বাস নিয়ে উঠছে তাঁর ঠোঁট থেকে। আর মুখের কথাগুলোকে অর্থময় ভঙ্গি দিয়ে চিহ্নিত করার শক্তিও তাঁর অসামান্য; প্রথম কথাটি বলার সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রোতাদের দেন বন্দী ক'রে নিলেন। তার কারণ মানুষটা একেবারেই উন্মুক্ত, নতুনকে নেবার জন্য উৎসুক—কিছুই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না, সব-কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকেন। যেন নিজের সমগ্র সত্তাকে নিজেরই ভিতর থেকে বের ক'রে এনে তিনি ছুঁড়ে দিলেন অন্যদের দিকে: যেমন এই প্রথম দিনে, তেমনি পরেও আরো অসংখ্য বার তাঁর এই ঝড়ের মতো মুঠ-ক'রে-নেয়া ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মুগ্ধ হয়েছি আমি। তখন পর্যন্ত আমার বিষয়ে কিছুই জানেন না তিনি, শুধু তাঁর কাব্যের প্রতি আমার আসক্তির কথা জেনে আমাকে তাঁর ঘনিষ্ঠ ক'রে নিলেন।

খাওয়ার পর আরো একটি বিস্ময়ের অবতারণা হ'লো। ভ্যান ডের

স্পেনের বহুদিনের একটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'তে চলেছে : কবির একটি আবক্ষ মূর্তি গড়ছেন তিনি, তার শেষ সিটিং আজই। আর এই সময়ে আমার উপস্থিতিও নাকি ভাগ্যের ধরা ব'লেই গণ্য : কেননা ভেরআরন মানুষটি এমন ঊর্মিল যে তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য অন্য একজনের প্রয়োজন হয়, যাতে কথাচ্ছলে জীবন্ত হ'য়ে ওঠে মুখশ্রী। অতএব আমি দু-ঘণ্টা ধ'রে গভীর চোখে তাকিয়ে থাকলাম সেই মুখের দিকে, সেই উন্নত অবিচলিত ললাটে—[illegible]ই ইতিমধ্যেই দু:সময়ের রেখা পড়েছে—আর তার উপরে মরচে-রঙের কেশগুচ্ছের দিকে। মুখটির গড়ন মজবুত, চাওয়ায় যাজা ব্রাউন রঙের চামড়া আঁট হয়ে বসেছে : থুৎনি এগিয়ে এসেছে শিলাখণ্ডের মতো, পাৎলা ঠোঁটে ফুলে আছে বলীয়ান ভেরসিনত্রিস ভস্মরাশি। তাঁর যত চঞ্চলতা তাঁর হাত দুটিতে—ক্ষীণ, প্রবল, সুকুমার, সুদৃঢ় তাঁর হাত, সেখানে বিরল মেদমাংসের তলায় ধকধক ক'রে রক্তের তাপ জ্বলছে। চাষিদের মতো চওড়া কাঁধ—তাঁর তেজস্বী ইচ্ছাশক্তির যোগ্য বাহন যেন, তুলনায় ছোটো অথচ জোরালো হাড়ে গড়া মাথাটিকে বড্ড ছোটো মনে হয় ; উঠে না-দাঁড়ালে বোঝা যায় না কত তাঁর শক্তি। আজও [illegible] মূর্তিটি দেখলে বুঝতে পারি এটা একেবারেই খাঁটি, কবির চরিত্র সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়েছে এতে : দেখতে পাই এক অমর ক্ষমতার স্বত্ব, কবিপ্রতিভার চাক্ষুস নিদর্শন।

সেই তিন ঘণ্টায় তাঁকে আমি ভালোবাসতে শিখেছিলুম, সেই ভালোবাসার সারা জীবনেও ক্ষয় হ'লো না। তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিলো আশ্চর্য, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তাকে আত্ম-তৃপ্তি ব'লে ভুল হ'তো না। অর্থ বিষয়ে স্বাধীন হ'য়ে ছিলেন ; লেখার চাইতে পল্লীজীবনে তাঁর আসক্তি ছিলো বেশি। খ্যাতির বিষয়েও স্বাধীন হ'য়ে ছিলেন ; আপোশ ক'রে, খ্যাতির জমিয়ে, কিংবা সামাজিকতার সাহায্যে উন্নতির চেষ্টা করতেন না : বন্ধুদের অবিচল অনুরাগই যথেষ্ট ছিলো তাঁর। তাঁর মতো চরিত্রের যেটা সবচেয়ে ভয়ের প্রলোভন—সেই খ্যাতি, যা জীবনমধ্যাহ্নে তাঁর কাছে এসেছিলো, তারও ঊর্ধ্বে তিনি উঠতে পেরেছিলেন। সব অর্থেই মানুষটা তিনি

খোলা : কোনো অবগুণ্ঠনে ভারাক্রান্ত নন, কোনো অহমিকায় আত্মবিস্মৃত নন—ঋজু, আনন্দময় পুরুষ, যে-কোনো মুহূর্ততায় যারা সহজে সংক্রমিত : তাঁর জীবনস্পৃহায় আমরাও আরো সজীব হ'য়ে উঠলুম তাঁর কাছে এসে।

তাহ'লে তা-ই হলো। আমি—যদিও যুবকমাত্র—আমি দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথকে কবিকে আমার সামনে, যেমন তাঁকে ভেবেছিলাম, ঠিক তেমনি। প্রথম দেখাতেই একটা বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয় হ'য়ে গেলুম : এই মানুষটির, আর তাঁর কাব্যের, আমি সেবা করবো। এই সিদ্ধান্তে তখন কিছু সাহসের প্রয়োজন হয়েছিলো, কেননা ইওরোপের বন্দনা যিনি গেয়েছিলেন ইওরোপ তখনো তাঁকে চেনেনি। আর এও জানতুম যে তাঁর তিনটি নাটক আর বিরাট কাব্যগ্রন্থ আমার নিজের কাজ থেকে দু-তিন বছর সময় হরণ করবে। কিন্তু আমার সময়, উদ্যম, আবেগ একান্তভাবে কোনো বিদেশী কাব্যের অনুবাদে উৎসর্গ করবো, এই প্রতিজ্ঞার আমার নিজেরই উপকার হয়েছিলো সবচেয়ে বেশি। কাজের মধ্যে নৈতিক দায়িত্ব এলে মানুষকে তা রক্ষা করে। আমার সব অস্পষ্ট সন্ধান, অনিশ্চিত প্রয়াসের মধ্যে এতদিনে স্পষ্ট একটা অর্থ জেগে উঠলো। আর আজ যদি কোনো তরুণ লেখক, যে এখনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না, আমার কাছে পরামর্শ চায়, আমি তাকে বলবো কোনো সৎগ্রন্থের অনুবাদ-কর্মে হাত দিতে। যার প্রয়াস নবীন, সে মৌলিক সৃষ্টির চাইতে ত্যাগের পরিশ্রমে অনেক বেশি আশ্বাস পাবে, আর যে-কাজ ভক্তিভরে করা হয়েছে সে-কাজ কখনো ব্যর্থ হয় না।

রাইনার মারিয়া রিলকে-র পত্রাংশ

[জোসাফাতের মৃত্যুর পরে লেখা। যাঁকে লেখা, তিনি জোসাফাতের বিধবা নিবন্ধকারের নিমন্ত্রিত।]

১২ ডিসেম্বর, ১৯২১

প্রথমে আপনার কবিতার বিষয়ে বলতে চাই আরম্ভেই বলি তারা আমাকে বিস্ময় আর আনন্দ এনে দিয়েছে। যে-চারটি আমার পড়ার জন্য

পাঠিয়েছেন তার কোনো একটিকে বিশেষ প্রাধান্য দেবার সংগত কারণ দেখি না : তাদের মনে হয় যেন পরস্পরের পরিপূরক, প্রত্যেকটি ভালো, যথার্থ, কলাকৌশলে বিশুদ্ধ, কোথাও ফাঁকি নেই। আমার সামনে এই যে পাণ্ডুলিপি রয়েছে, তা যদি আমি ধারণা পারি তাহ'লে আবার মাঝে-মাঝে খুলে দেখবো ; কিন্তু ইতিমধ্যেই আমার প্রত্যয় জন্মেছে যে এই প্রথম সুন্দর অভিজ্ঞতা স্মরণীয় হবে। বিশ্বাস করুন, তরুণ কবিরা আমাকে যে-সব লেখা পাঠান তার বিষয়ে এই রকম অনুমোদনে আমার সম্মতি অতি বিরল : একবার তার ব্যতিক্রম সম্ভব হ'লো ব'লেই আরো বেশি সুখের কথা। আরো বেশি "মনোমুগ্ধকর", তেরআরব হ'লে লিখতেন। কেননা, যেখানেই কোনো সার্থকতা দেখতে পেতেন সেখানেই মুগ্ধ হতেন তিনি ; তাঁর আনন্দের অভিজ্ঞতা যার ঘটেছে সে সেটা ভুলতে পারবে না ; কোনো তরুণ শিল্পীর আত্মা যেখানেই স্ফূর্ত হ'য়ে তাঁর বিশ্বাস জাগিয়েছে, সেখানেই প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ, সুদৃঢ় পংক্তিতে তাঁর উল্লাস অব্যয় হ'য়ে উঠতো ; আর সেই অটল, নিঃশর্ত অভিনন্দন তিনি প্রকাশ করতেন তাঁর বেদনা-ক্লান্ত শক্তি দিয়ে, তাঁর চৈতন্য, তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে। এ থেকেই বুঝতে পারবেন তাঁর আশ্বার, তাঁর উৎসাহের মূল্য ছিলো কতখানি। চরম পরিমাণে দুটোই লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের বছরগুলি ভ'রে। যদিও আমার ভাগ্য তাঁর কাছে ছিলো নিষিদ্ধ প্রহ, আর আমার কোনো রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়েরও সম্ভাবনা ছিলো না, তবু তিনি আমার ক্ষমতায় বিশ্বাস রেখেছিলেন, আমাকে দিয়েছিলেন তাঁর বলীয়ান প্রকৃতির সমগ্র সমর্থন। আর এইটেকেই আমি বলবো অমূল্য, এই-যে স্পর্শসহ প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও, আমাদের মধ্যে অনির্বচনীয়ের ব্যবধান সত্ত্বেও, তিনি আমার রচনাকে সত্য ব'লে, প্রয়োজনীয় ব'লে স্বীকার করেছিলেন—আর সেইভাবেই প্রথম থেকে ব্যবহার করেছিলেন আমাকে। আমি যে আমার অভিপ্রায়কে সফল ক'রে তুলতে পেরেছিলাম, সেজন্য এই বন্ধুর কাছে আমি অনেকাংশে ঋণী ; এই যোগাযোগ আরো বেশি সফল হয়েছিলো এই কারণে যে অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের পূর্বে আমি

কোনো পুরুষের বন্ধুতা পাইনি। তাঁর এবং রোদ্যাঁর বন্ধুতার প্রভাব আমার উপর অসীম, এই দু-জনের সংসর্গের বাহিরেরা আমার মধ্যে যে-রকমভাবে কাজ ক'রে গেছে তাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

জেরঅ্যারনের প্রতি আমার অনুরাগের সূত্রপাত তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার অনেক আগে—আমার প্রথম (প্রায় বারো-বছর-ব্যাপী) প্যারিস-বাসের সময়ে তাঁর প্রথম পর্যায়ের গ্রন্থাবলী, বিশেষত *Villes tentaculaires* আমাকে অভিভূত ক'রে রেখেছে। তিনি নিজের হাতে প্রথম আমাকে যে-বইটি দিয়েছিলেন সেটি *Multiple Splendeur*; আমিও প্রস্তুত ছিলাম পূর্ণ হৃদয়ে সেটি গ্রহণ করতে। সেই সময় থেকে মাঝে-মাঝেই তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তো, কিন্তু (তাঁর বিচ্ছেদের নিষ্ঠুরতার পরিমাণে) সে-দেখা কতটুকুই বা। প্যারিসের বাইরে সাঁ-ক্লু তে থাকতেন তিনি—প্রত্যেক বছর শুধু শীতের ক-মাস; কখনো, শহরের মধ্যে হাঁটতে-হাঁটতে আমার পাড়ায় যখন এসে পড়েছেন, অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হতেন আমার কাছে (আর আমার পক্ষে তাঁর আসার সময় মানেই ঠিক সময়!)—আর তাঁর হৃদয়ের আশ্চর্য আন্দোলন ঝড়ের মতো এগিয়ে আসতো আমার দিকে। আবার কোনো সময়ে আমি (যার প্যারিসের জীবন সর্বদাই ছিলো নির্জনতম) হঠাৎ কোনো ছুটিতে বেরিয়ে গিয়ে তাঁর পরিচিত কিন্তু সৌধাগ্রময় ফ্ল্যাটের সেকেলে ঘুন্টি-দড়ি ধ'রে টান দিয়েছি। আর যে-মুহূর্তে চৌকাঠ পেরোনো সে-মুহূর্তে আগন্তুক হ'য়ে যেতো অতিথি—জেগে উঠতো আগত-সম্মাননের বিরাট ঐতিহ্য; তাঁর অভ্যর্থনা এতই বৃহৎ, এতই উন্মুক্ত ও পূর্ণ যে—অন্তত সেই বিশাল আতিথেয়তার সমতারক্ষার জন্যই—আপনাকে হ'তে হ'তো মহান অতিথি, দূরাগত অতিথি, অতিথি অবতীর্ণ—সকল অতিথির মধ্যে অনন্য অতিথি।

কিন্তু আর না।

জেরঅ্যারনের কাব্যের মধ্যে নিজেকে আপনি গভীরভাবে মগ্ন করেছেন; তাই, তাঁর পরিশ্রমী জর্মন অনুবাদক জেকান ৎসোরাইখ যে-প্রবন্ধটিতে কবির

চরিত্র ও তাঁর সঙ্গে নিজের সংস্রবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, সেটি হয়তো আপনার অপরিচিত নয়। দুর্ভাগ্যত, বইখানা ঠিক এই মুহূর্তে আমার পক্ষে অপ্রাপ্য—কিন্তু হয়তো বসির ভ পলতীয় ছোট্ট বইটি এখনো আপনি দেখেননি—সেটি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি (যথাসময়ে প্রত্যর্পণ করবার অনুরোধ জানিয়ে)। শেষ বইটিতে যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলা অনিবার্যত প্রবেশ করেছে, আর এটি যখন লেখা হয়েছিলো তার আগেই সেই ভয়ংকর ঘটে গেছে : ভেরহারনের মৃত্যু।

ভেরহারনের কবিতা

'কয়েকটি আলু আর' : ১

আশ্চর্য এই আমাদের আনন্দ বেলমের হাওয়ায় হাওয়ায় দোলা যেনো—
এই আমাদের ছোট্ট বাড়িটি, ছোট্ট তার ছাদ, এই আমাদের বাগান ফুল ও ফলের।

আর এই আমাদের আসন আপেল গাছের তলায়, যেখানে শাদা বসন্ত পাতা ঝরায়—নরম পাপড়ির বসন্ত, তার অস্ফুট মৃদু হাত।

আর এই পায়রার ঝাঁক, আমাদের আশা-বেদনারই মতো, আলোয় পরশ পেয়ে ওড়ে নিসর্গ-নীলায়।

শিথিল নীলিমার মুখ থেকে ঝ'রে প'ড়ে গেছে যত চুম্বন, তার দুটি যেন এই নীল সরোবর—নিরাভরণ, পবিত্র! অনিঃশ আবেগে ফোটা গোলো ফুলের দল ভিড় করেছে তার চারপাশে।

আশ্চর্য আমাদের আনন্দ, আশ্চর্য আমরা এই বাগানে আজ যেখানে এসে আমরা অন্তের ছায়া।

'কয়েকটি স্বচ্ছ ক্ষণ' : ১৭

আমরা যদি ভালোবাসতে চাই চোখ,
আমাদের চোখ ধুয়ে দিতে হবে
তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে
যাদের হাজারে হাজারে দেখে বেড়াই
এই আমরাই
অসহ্য জীবনের মুহূর্তে মুহূর্তে।

ভোর জাগে ঘুমে আর শিশিরে—
তুমিই আলোর রশ্মি ;
হয়তো দেখতে পাব এই কুয়াশায়
নরম নরম পালক
কত স্বর্গের কত কল্পের কত স্বর্গের—
বাগানে গিয়ে চাও বুলোবে শৈবালের ওপর।
সুনীল সুন্দর সরোবরে
কাঁপবে ঝলকিত সোনার টুকরো :

পাখা মুয়ে ক'রে নেবে গাছের ছায়া—
আর আলো, এক আশ্চর্য আলো
সমস্ত পঙ্ক-গুল্ম-তৃণ উপচিয়ে ফেলে
ঝেঁটিয়ে বের ক'রে দেবে ঐ স্যাৎসেঁতে অন্ধকার
যা নিয়ে এখনো মেতে রয়েছে প্রদোষ।

'বিকেলের কয়েকটি ক্ষণ' : ২৪

আমার দিন ঘনিয়ে এলে পর, জানি না হয়তো শুধু একটুখানির তরে, শিথিল কম্পিত কোনো স্বর্গ মুঁকে দেখবে আমার জানলায়।

আশ্বিন ১৩৬২

আমার হাত, আমার দুই বিরক্ত হাত ততদিনে বিবর্ণ হ'লেও সেই কবিকের
কল্পনায় হবে আবার স্বর্ণময় :

ধীরে সে চুম্বন করবে সেবার আমার মুখে, কপোলে, তার প্রশান্ত গম্ভীর চুম্বন—
আর আমার চোখের দুলগুলি, পাণ্ডুর হ'য়েও গর্বিত, তাকে ফিরে দেবে তাদের
শেষের কবিতা।

হে সূর্য, তোমার বীর্য তোমার জ্যোতি ধারণ করেছি কি ? আমার প্রয়াস
কখনো ক্লান্ত, কখনো ছিন্ন, তবু আমরণ পরম টঙ্কিতে তোমাকে করেছে বন্দী
আমার কবিতায়। প্রাণ যেমন হু হু ক'রে হাওয়া ওড়ায় পাকা নক্তবেতে,
আমার লেখা পাতায় পাতায় তেমনি বাঁচো তুমি, তেমনি ক'রে কাঁপো আমার
অক্ষরে অক্ষরে !

যে-তুমি মুক্তি দাও, যে-তুমি ক্ষয় দাও, যে-তুমি পরম বন্ধু অহংকারেরই ধন,
এলো এই ভীষণ সময়ে, এই পরম নক্তনের পরে, যখন আমার জীর্ণ হৃদয়
শেষ পরীক্ষার তারে কেবলি তারি হয়—আরো একটুর জন্যে
তুমি থাকো তার বন্ধু, তার সঙ্গী।

অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য

ক্রস্ট

সন্ধ্যা, বিশাল এক আকাশ, নির্দেশ, নির্বন্ধক, অলৌকিক,
নক্ষত্রে দুর্দিন, অন্তহীন, মানুষের প্রার্থনায়
অপ্রাপণীয়—আজ সন্ধ্যায় বিশাল এই আকাশ দেখা গিলো।
তার মুহূর্তে ধরা পড়লো মৃত্যমান চিরন্তন।

বাঁধলো তার আলিঙ্গনে সোনায় জলা ছপোয় গলা দিগন্তকে
কোটা-কোটা বরফ, কঠিন, আঁকড়ে ধরলো বাতাস, স্তব্ধতা, নৈকত

আর প্রান্তর—প্রান্তর অপরিসীম। বরফের কফনে
নীল হ'য়ে গেলো মৃতরা, যেখানে গির্জের চূড়ো বর্শা তুলেছে উঁচুতে
শব্দহীন বন, শব্দহীন সমুদ্র, এই বিশাল আকাশ বিস্তৃত।
কেমন তার গতিহীন মর্মভেদী দীপ্তি!
মৌলিক এই শৃঙ্খলা, তীক্ষ্ণ দন্তিল স্বভাবের এই জগৎ,
আর পরিবর্তন নেই—কিছুতেই, কিছুতেই না।

অবিচল, পরম, অবর্তনীয়। মনে হয় যেন লোহা
আর ইস্পাত আমার চাতুরীহীন বেদনাময় হৃদয়টাকে নিংড়ে নিলো;
আর আতঙ্ক তাকে বিঁধে ফেললো মৃত্যুহীন শীতে
আর কোনো ঠাণ্ডা, মহান, আকস্মিক, জ্যোতির্ময়, ঈশ্বরে।

গরমলাগি

গলায় বাঁধা রুমাল, যাগরা ঝুলছে ঢিলে,
ভোরবেলা অনেক দূর থেকে এসেছে এই ঘাসের জমিতে,
কিন্তু ঘুমের ঘোর কাটেনি এখনো, শুয়ে পড়েছে আবার
এক কোণে, গাছের তলায়, চুপচাপ।

মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়লো তক্ষুনি, হাঁ খোলা, নাক ডাকছে,
তার খোলা পা আর কপাল ঘিরে গজিয়ে উঠছে ঘাস;
বাহু দুটি হেলাফেলায় ভাঁজ করা,
ছাওয়ায় তনতন করে মাছি।

যত সব ঘাস-পোকা, কোবল তাল আর কবোষ্ণ মাটি যারা
ভালোবাসে,
তারা বেরিয়ে এলো আস্তে-আস্তে, ঝাঁকে ঝাঁকে,
জড়ো হ'লো আদরে সেই ছাওলার বিছানায়, যাতে ঐ
মেয়েটার দেহের তাপ ধীরে পড়ছে ছুঁইয়ে।

মাঝে-মাঝে, নিজে না-জেনে, ন'ড়ে উঠছে অশোভন ভঙ্গিতে,
জাগিয়ে তুলছে তার চারদিকে মৌমাছিদের
বেসামাল হল্লা ; কিন্তু একটু পরেই, ঘুমের লোভে বিহ্বল
পাশ ফিরে তলিয়ে যায় আবার।

এই ঘাসের জমি, তার ঘাসল উদ্ভিদের ভারে
যেমন ঘিরে আছে, স্নেহের মতো, নিদ্রাতুরাকে,
তেমনি তার শরীর যেন বলদগুলোর মন্থরতায় অলস,
চোখে জ্বলছে পশুর মতো শান্তি।

সোনালি মেয়ে, রক্ত তার শরীর ভ'রে সেই তেজে কেটে পড়ছে,
যা শুকগাছের ডালগুলোকে গাঁটে-গাঁটে ফুলিয়ে তোলে :
রক্ত তার চুল, সমতলের যবের চেয়েও পাণ্ডুর,
বালুর চেয়েও হালকা।

মোটা, লাল, কর্কশ তার হাত ; তীব্র তার প্রাণরস
আগুনের ঢেউ তুলে অঙ্গে-অঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়ে
স্পন্দন তোলে বুকে, ফুলিয়ে তোলে স্তন, আস্তে তুলে ঘরে,
যেমন গমের খেতে বেগ আনে বাতাস।

ছুঁয়ে, একটি সোনালি চুমনে, তাকে অবাক ক'রে দেয়—
আর সে এখনো ঘুমুচ্ছে, তারি চোখে, উইলো গাছের তলায়,
এদিকে খড়কুটো ঝ'রে-ঝ'রে পড়ছে তার গায়ে,
মিশে যাচ্ছে চুলের মধ্যে, অবিরল।

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিশ্বভারতী তাঁদের লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালায় সম্প্রতি একটি মূল্যবান সংযোজন করেছেন : রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক প্রবন্ধসমূহ 'ইতিহাস' নাম দিয়ে সংকলিত হয়েছে। এর কোনো-কোনো রচনা ইতিপূর্বে অন্যান্য গ্রন্থের অন্তর্গত ছিলো, কিন্তু অধিকাংশই মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য পুরাতন সাময়িক পত্র থেকে উদ্ধৃত—এ-যুগের পাঠকের পক্ষে একেবারেই নূতন। অবশ্য 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের ধারা' এবং তার পরিবর্ধিত ইংরেজি অনুবাদের ('A Vision of India's History') সঙ্গে শিক্ষিত পাঠকমাত্রেই পরিচিত আছেন : সেখানে যে-সব মূল ধারণা লিপিবদ্ধ আছে, এই গ্রন্থের অন্যান্য রচনাকে তারই সচ্ছিদ্র উদাহরণ বলা যায়। সহজে, অল্প কথায়, অব্যবহিত রূপে, কোনো বিষয়ের মর্মস্থলে পৌঁছবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মতো তাগুারী আর নেই : কথা আরম্ভ করার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রসঙ্গের হৃৎপিণ্ডে চ'লে যান তিনি, একটি ছেনে গাঁথাই সারজন্তের ছবি তুলে ধরেন আমাদের চোখের সামনে। সেইজন্যই—সাধারণ পাঠকের পক্ষে—তিনি পরম শিক্ষক ; এবং যে-কালে লোকশিক্ষা ভারতভূমিতে ব্যাপ্ত হ'তে চলেছে, সকল বিষয়েই তাঁর পরামর্শ অপরিহার্য। ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বিষয়ে তাঁরই ব্যবহৃত 'vision' শব্দটি তাঁর রচনার সার্থকতম বর্ণনা : তিনি যা দিয়েছেন, দিতে পারেন (হয়তো একমাত্র তিনিই পারেন) তাকে দৃষ্টি ভিন্ন কিছুই বলা যায় না : দেখবার চোখ এবং দ্রষ্টব্য বস্তু দুটোই তাঁর উপহার। এই গ্রন্থটির মধ্যে অতীতের ভারত এবং চিরন্তন ভারত জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে : তার দিকে তাকিয়ে বর্তমানকেও আমরা বুঝতে পারি, এবং ভবিষ্যৎকেও অনুমান করা সম্ভব হয়। মানুষের জন্ম সম্পূর্ণ দৈবাধীন, এবং দৈবাৎ এই ভূলোকের যে-অংশে নিক্ষিপ্ত হয়েছি, তার চারদিকেই যতদূর দেখতে পাওয়াটা ছেলেমানুষি, আর এই ছেলেমানুষিকেই সাধারণত 'দেশপ্রেম' বলা হ'য়ে থাকে। কিন্তু ভারতের কথা রবীন্দ্রনাথের মুখে যখন শুনি, কিংবা যখন 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' কবিতাটিতে ভারতীয় ভূগোল ও ইতিহাসের

ছন্দোবন্ধ সংকেত মূর্তি ছাড়ার বাবের বাব স্মরণ করি, তখন পাণ্ডিত্যেও রোমাঞ্চিত না-হ'য়ে উপায় থাকে না।

গেলো বছরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণও উল্লেখযোগ্য, কেননা এতে এগারোটি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে, 'গ্রন্থ-পরিচয়' অংশও মূল্যবান। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি কবির মধ্যবয়সের রচনা, অনেক স্থলে কোনো পত্রিকা বা সভার জন্য স্পষ্টত সময়ভাবে লেখা : এতদিনে বাংলা সাহিত্যের অবস্থাও অনেক বদলে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বভাব ছিলো সাময়িক প্রসঙ্গেও মূল সূত্রের আলোচনা করা : তাই এই রচনাগুলি বাঙালি লেখকের পক্ষে নিরন্তর মূল্যবান থাকবে। 'পাঠকের' বদলে 'লেখক' কথাটা উহ্য ক'রেই বলা গেলো ; কেননা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দুর্ভাগ্য এই যে যাঁরা লেখক ব'লে পরিচিত তাঁরা সহজে পাঠক হ'তে রাজি হন না—বিশেষত কাব্যের বা প্রবন্ধের।

সম্প্রতি বাংলা পুস্তকের কাটতি যেমন বেড়েছে, ঠিক তেমনি নিস্তেজ হ'য়ে আসছে সাহিত্য-পত্রিকার অবস্থা। 'চতুরঙ্গ', অনিয়মিত হ'লেও, তার সুদৃশ্য, পরিপুষ্ট আকার বজায় রেখে চলেছে, কিন্তু 'পূর্বাশা'র প্রকাশ স্থগিত রাখতে হ'লো, 'সাহিত্যপত্র'ও বিরলদর্শন। 'উত্তরসূরী' ও তরুণতরদের কবিতা-পত্রের আকলি এখনো একটি নতুন বসন্তে পরিণত হয়নি। অথচ, যদি বইয়ের কাটতি দিয়ে বিচার করতে হয়, এই সময়েই এই ধরনের পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিলো। তা যে হচ্ছে না তাতে হয়তো প্রমাণ হয় যে প্রচার বাড়লেও রুচির বিকার ঘটেছে— আসল জোড়টাকে উপেক্ষা ক'রে চাটনির জন্যই সকলের লালসা। এই অবস্থার মধ্যে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনের সম্পাদনায় 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র পুনঃপ্রকাশ উৎসাহজনক। প্রথম সংখ্যাটি দেখে মনে হ'লো—বহু চেহারায় নয়, চরিত্রেও কোনো বদল হয়নি : পত্রিকাটি মোটের উপর শান্তি-নিকেতনেরই মুখপত্র হ'য়ে আছে। শান্তিনিকেতনের কাছে আধুনিক বাংলা

সম্পাদিত হয়েছে ভালো, কিন্তু তার প্রধান পুরুষের নূতন রচনা যখন আর পাওয়া যাবে না, অপ্রকাশিত রচনার মধ্যেও চমকপ্রদ আবিষ্কারের সম্ভাবনা কম, তখন শুধু (বা প্রধানত) তার উপর নির্ভর ক'রে পত্রিকা সপ্রাণ হ'য়ে উঠবে কিনা, সে-কথাটি চিন্তনীয়। আমরা আশা করবো নূতন সম্পাদক নূতন কালের বাংলা সাহিত্য ও শিল্পকলার সঙ্গে যোগস্থাপন করবেন, উপরন্তু বিশ্বসাহিত্যের প্রসঙ্গেও উদাসীন থাকবেন না। 'বিশ্বভারতী' নামের যা আক্ষরিক অর্থ, আমরা এই পত্রিকাটিকে তারই দর্পণ-রূপে দেখতে চাই।

• •

রবীন্দ্র-স্মৃতি-পুরস্কার বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন, সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের পক্ষে তার চাইতে অপমানজনক কোনো দলিল আমাদের চোখে পড়েনি। লেখকদের এর জন্য 'প্রার্থী' হ'তে হবে: পারিক সার্ভিস কমিশনে চাকুরির আবেদনপত্রের মতো জীবনীপঞ্জী লিখে দিতে হবে (জন্মের তারিখ, বিদ্যালয়াদির নাম সুদ্ধ)—শুধু তা-ই নয়, দু-জন 'সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিকে'র সুপারিশ-পত্র সঙ্গে না-থাকলে সেই 'আবেদন বিবেচিত হবে না'। যারো কটি পুস্তকও প্রেরিতব্য। বলা বাহুল্য, 'পুরস্কার' আর 'আবেদন' পরস্পর-বিরোধী শব্দ: যাকে পুরস্কার বলা হচ্ছে তার মধ্যে কোনো গুণপনা বা সৎকর্মের জন্য সম্মাননার ভাবটাই প্রধান, সেই সম্মান যথা-স্থানে অর্পণ করাতেই দাতার গৌরব, এবং তা যদি সম্পূর্ণরূপে অযাচিত না হয়, যদি প্রাপক তার জন্য কখনো একটি অঙ্গুলিও নাড়েন—তাহ'লেই সমস্ত জিনিশটা এক দিকে হ'য়ে ওঠে ভিক্ষাবৃত্তি, অন্য দিকে ঔদ্ধত্য। লেখকের জীবনী-তথ্য, এমনকি তিনি জীবিত বা মৃত, এই সব প্রশ্নই অবান্তর: শুধু পূর্ব-বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তক হওয়া চাই, এই শর্তটিও নিতান্ত অর্থহীন। আর তাছাড়া একটি পুস্তকই বা হ'তে হবে কেন; কোনো-কোনো ক্ষেত্রে লেখকের সমগ্র রচনাকেই অভিনন্দন জানাবার প্রয়োজন ঘটতে পারে—তা থেকে একটি গ্রন্থকে বিচ্ছিন্ন করতে গেলে মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়। এই রকম ছিদ্রবহুল বিজ্ঞপ্তি যে প্রকাশিত হ'তে পারলো, আর তা নিয়ে কোনো

আন্দোলনও চ'লো না, এতেই বোঝা যায় আমরা এখনো সভ্য জগতের বহুদূরবর্তী কোন মরুভূমিতে বাস করছি। অন্তত, সাহিত্যিকরা এর নিঃশব্দ এবং ফলপ্রসূ প্রতিবাদ জানাতে পারেন অসহযোগ পন্থা অবলম্বন ক'রে : কিন্তু হয়তো এতদিনে বহু আবেদন-পত্র যথোচিত সুপারিশ এবং বারো কপি ক'রে যুগ্মক-সমেত যথাস্থানে পৌঁছে গেছে, আর আগামী বৎসরেও এই লজ্জাকর লিপি পুনর্বার বাঙ্ময় করা হবে। এই দুঃস্বপ্নময় দেশে সাহিত্যিকের মধ্যেও আত্মসম্মান-বোধ দুষ্প্রাপ্য।

চিঠিপত্র

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু

'কবিতা'-র আষাঢ় সংখ্যায় (১৩৬২) শ্রীযুক্ত নরেশ গুহ 'পারাপার'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে স্বরবৃত্তের ব্যবহার নিয়ে তর্ক উত্থাপন করেছেন। তাঁর অভিযোগ, গ্রাম্য ছড়ার ছন্দই স্বরবৃত্ত এ-কথা মেনে নিয়েও ছন্দঃশাস্ত্রীদের কেউ-কেউ বলছেন যে এ-ছন্দের পর্বে পর্বে চারমাত্রার কড়া আইন শিথিল হলেই জাত যাবে। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, গ্রাম্য ছড়ার পর্বে পর্বে চারমাত্রার বিন্যাস যে সর্বত্র মানা হয়েছে এমন নজির নেই—চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব অনেক ছড়াতেই সসম্মানে উপস্থিত। এর উদাহরণ হিসেবে শ্রীযুক্ত নরেশ গুহ যে জনশ্রুত পঙ্‌ক্তিটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তা এই : 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদের এলো বান'—তিনি বলেছেন, 'নদের এলো' পর্বটির ধ্বনিমূল্য চারমাত্রার বেশি। এই প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে। 'নদের এলো' চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব, এই অভিমত অমান্য, যেহেতু ছড়ার ছন্দের উচ্চারণভঙ্গি অনুসারে 'নদের'-এর 'দের' এক-মাত্রিক—হসন্তবর্ণ ব'লে নয়' এখানে দাঁড়াবার জায়গা পায় না, 'দে' ঈষৎ দীর্ঘ উচ্চারিত হয় মাত্র ; ছড়ার ছন্দ আমরা যে-ভঙ্গিতে আবৃত্তি করি তাতে দীর্ঘ অক্ষরের (long syllable) ওজন একমাত্রায় নেমে আসে। এ-কথা যদি জানা থাকে তাহলে 'নদের

এলো'-কে চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব বলবো কেন? 'মনের এলো'-র পরিবর্তে 'নদীতে এলো' থাকলে পর্বটিকে চারমাত্রা-ছাড়ানো বলতাম। 'বেরিয়ে এলেই' ('পারাপার'-এর সমালোচনায় উদ্ধৃত) পর্বটি সম্পর্কেও সেই কথা। 'বিয়ে' আর 'নেই' বৃত্তত যা-ই হোক, উচ্চারণের দিক থেকে যৌগিক স্বরবর্ণের মতো ('ইএ' আর 'এই'-র সমতুল্য), তাই ছড়ার ছন্দের বিশেষ উচ্চারণ-ভঙ্গির প্রভাবে ওরা সংশ্লিষ্ট হয়ে সহজেই একমাত্রার পরিণত হয় এই কারণেই 'বেরিয়ে' 'ছড়িয়ে' 'পালিয়া' জাতীয় শব্দগুলির বৈষম্যিক প্রয়োগই ছড়ার ছন্দে (স্বরবৃত্তে) সচরাচর দেখা যায়। আমার বক্তব্য অবশ্য এই নয় যে চলতি ছড়ায় চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্বের ব্যবহার নেই। কথা হ'লো, স্বরবৃত্তে চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব ব্যবহার করা সম্ভব কিনা। বাঙলা ছন্দের—বিশেষ ক'রে স্বরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের—সৌষম্যের ভিত্তিই হলো পর্ব-উচ্চারণের কালগত ঐক্য। তা যদি সত্য হয়, স্বরবৃত্তে (চতুর্মাত্রিক) চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব সংযোজিত হ'লে ছন্দ ব্যাহত হবেই। এখন প্রশ্ন হ'লো, গ্রাম্য ছড়ার ছন্দে যে চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব দেখতে পাওয়া যায় তার ব্যাখ্যা কী হ'তে পারে? এর উত্তর খুবই সহজ: চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব যাকে মনে হচ্ছে, হয় সেটা আসলে চতুর্মাত্রিক পর্ব, নয় সেখানে ছন্দ ব্যাহত হচ্ছে। উদাহরণত, 'যমুনাবতী সরস্বতী···' ছড়াটির উল্লেখ করি। 'যমুনাবতী' শুনতেই চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব, অথচ কানে ঠেকে না; এর কারণ এই ছড়াতে 'যমুনাবতী'-কে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে আমরা উচ্চারণ ক'রে থাকি, যার ফলে 'যমুনাবতী'-কে অনেকটা 'যোমুনাবতী'-র মতো শোনায়, বংশপরম্পরায় মা-ঠাকুমাদের কাছ থেকে আমরা এই রকম উচ্চারণ শুনে আসছি, তাই অভ্যাস-বশত যখন আবৃত্তি করি তখন লক্ষ্য করি না। লোকের স্বাভাবিক শ্রুতিবোধ ছড়াটির ছন্দ-দুইতা শুধরে নিয়েছে; এবং ঠিক এই ভাবেই 'কুড়ুতে'-র মতো পর্বকেও বিছিয়ে দিয়েছে চার মাত্রায়। যদি কেউ বলেন, 'যমুনাবতী' এবং 'কুড়ুতে'-কে আমি স্বাভাবিকভাবেই পাঠ করি এবং তাতে কান কোনও আপত্তি করে না, তা হলে তাঁর শ্রুতিবোধ সম্পর্কে আমি সন্দেহ প্রকাশ করবো। এখানে

আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি : 'রাত পোহালো কয়সা হ'লো ফুটলো কত ফুল। কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা ছুটলো অলিকুল। গাছের ডালে পালে পালে ডাকছে কত কাক। পূজা বাটিতে জোর কাটিতে বাজছে যেন ঢাক। ...ইত্যাদি. এই কবিতাটি যতবার ছোটোবেলায় আবৃত্তি করেছি, ততবারই 'পূজা বাটিতে' পর্বটিতে হোঁচট খেয়েছি—যেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতাম। বড়ো হ'য়ে এর কারণ বুঝতে পেরেছি। প্রচলিত ছড়ার নজির দেখিয়ে কোনো আধুনিক কবি যদি চতুর্মাত্রিক স্বরবৃত্তে 'যমুনা-বতী' কিংবা 'কুড়তে'-র মতো পর্ব ব্যবহার করেন. তা'লে তিনি পাঠকদের উপর সুবিচার করবেন না। তখন প্রশ্ন উঠবে, শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় যে চার-মাত্রা-ছাড়ানো পর্ব দেখা যায় সেগুলো কানের সম্মতি পায় কী ক'রে। এই ধরনের কবিতাগুলো প্রকৃতপক্ষে স্বরবৃত্তে লেখা কিনা সে-সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। স্বরবৃত্তের ভঙ্গিতে পাঠ করলে এই সব চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্বে এসে যে থমকে দাঁড়াতে হয় সেটা সবিনয়ে স্বীকার ক'রে নেওয়া ভালো। এ-জাতীয় কবিতার আবৃত্তির ভঙ্গি স্বতন্ত্র, অতএব এদের ছন্দও স্বতন্ত্র—এরা ঠিক স্বরবৃত্তও নয়, আবার মাত্রাবৃত্তও (যে-ছন্দে দীর্ঘ অক্ষর সর্বদাই দু মাত্রা) নয়—উভয়ের মধ্যে একটা যোগাযোগ হয়েছে যেন এ-ছন্দে—এর ব্যাকরণ আপাতত তৈরি করা সম্ভব না হ'লেও এ-নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। বাংলা কবিতার ছন্দ আর রূপের বৈচিত্র্যসাধনের জন্য যে-কজন কবি চিন্তা করেন, শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট। স্বরবৃত্তে চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব কৌশলে ব্যবহার ক'রে তিনি যে নতুন, এক ধ্বনিস্পন্দনের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, এটা তাঁর বিস্ময়কর প্রতিবোধের পরিচয়। এই সূত্রে তাঁর পঞ্চ-ছন্দের আভাসযুক্ত গদ্য কবিতার কথা উল্লেখ করি।

'ছড়ার ছন্দই স্বরবৃত্ত', এ-কথাটাও বোধ হয় ঠিক নয়. যেমন ঠিক নয় কৃত্তিবাস রচিত পয়ারের (রামায়ণের বটতলা সংস্করণে যা দেখা যায়) প্রত্যেকটি চরণকে 'আদর্শ পয়ার' আখ্যা দেওয়া। স্বরবৃত্ত ছড়ার ছন্দের সংস্কৃত রূপ—রবীন্দ্রনাথের হাতে পরিমার্জিত হয়ে এ-ছন্দ সাহিত্যের দরবারে প্রবেশাধিকার

পেয়েছে। তাছাড়া, ঘরবন্ত নামটাও কোনো কোনো ছান্দসিক গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে করেন না, যেহেতু 'ঘর' মাত্রেই এ-ছন্দে একমাত্রা নয়। তিনটে ঘর এমনকি দুটো ঘরও কৌশলে ব্যবহার করতে পারলে এ-ছন্দে চারমাত্রার মর্যাদা পায়—আবার যে-পর্বে দুস্তত চারটে ঘর আছে, প্রতির দিক দিয়ে তাই কখনো-কখনো চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্বে পরিণত হ'য়ে ছন্দকে বিড়ম্বিত করে। যেমন, [পর্বে] চারটে দীর্ঘ অক্ষরের বিন্যাস এ-ছন্দে চলে না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়লো, চৈত্রের 'কবিতা'-য় (১৩৬১) প্রকাশিত এক সমালোচনাতে শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সরকার 'কবিয়শাই' কবিতার 'পুরোনো লাইন' পর্বটি সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন। পর্বটিতে দুস্তত চারমাত্রাই আছে, 'লাইন' ছড়ার ছন্দে সাধারণত একমাত্রা-ই, আমার মনে হয়, 'লাইন' পর্বাঙ্গটি দাঁড়াবার জায়গা না পাওয়ায় এগিয়ে প'ড়ে মাত্রাধিক্য ঘটিয়েছে ; পর্বটি 'লাইন পুরনো' কিংবা ঐ জাতীয় কিছু হ'লে শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সরকারের শ্রুতিবোধ হয়তো আপত্তি করতো না।

কলকাতা

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

লেখকের উত্তর : 'পাহাপার' প্রবন্ধে ঘরবন্তের চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্বের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে ছড়া থেকে ভুল পংক্তি উদ্ধার করেছিলাম ব'লে লক্ষিত আছি। পত্রলেখকের কাছে ভ্রমনির্দেশের জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করি। আসলে 'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে' কিংবা 'কাজিমুল্লুক কুড়োতে গিয়ে পেয়ে গেলুম বালা'—এইরকম কোনো পংক্তির উল্লেখ করাই বর্তমান লেখকের অভিপ্রায় ছিল। এ-ধরনের অনবধানতা নিশ্চয়ই অমার্জনীয়।

চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্বের সমর্থন করতে গিয়েও পত্রলেখক যে যুক্তি দিয়েছেন তা মেনে নিতে আমি অক্ষম। ছন্দজ্ঞানহীন শিশুদের মুখে এ ছড়ার আবৃত্তি আমি শুনেছি। দেখেছি 'যমুনাবতী', 'কুড়োতে গিয়ে' ইত্যাদি

পর্বকে পাঁচমাত্রার পুরো মূল্য দিয়েই তারা সুখ পায় এবং দুঃখও এখানে এসে তারা ছন্দের ভিন্ন রকমের দোলাটিকে মজার সঙ্গে উপভোগ করে। 'পূজা বাড়িতে' পর্বের ভাষাব্যবহার অসহ্য, কিন্তু শিশুদের কাছে এর ছন্দ যে বাধা জন্মায় না সেটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। পাঁচ মাত্রার পর্বকে আমি স্বরবৃত্ত বলিনি। বলেছি স্বরবৃত্তে এ রকমের মিশোল চালানো অপরাধের নয়।

আসলে অমিয় চক্রবর্তীর 'বৈদান্তিক' কবিতাটিকে কেন ঐ প্রবন্ধে স্বরবৃত্তের ছন্দ বলেছিলাম, কেন পরে সে-ধারণা ঈষৎ পরিবর্তন করতে হয়েছে, সে-বিষয়ে নতুন ক'রে দু'কথা যোগ করা প্রয়োজন। 'প্রকাণ্ড বন প্রকাণ্ড গাছ' কিংবা 'সবুজ অন্ধকার', 'বুকের মধ্যে বাড়ি খাবার' ইত্যাদি কিছু-কিছু অংশ ছাড়া এ-কবিতা পাঁচ মাত্রাতেও পড়া যায় এ-কথা আমার কোনো-কোনো বন্ধু আমাকে বলেছিলেন। তাঁদের মতে কবিতাটি পাঁচমাত্রার পর্বেই লেখা, কিছু অংশ স্বরবৃত্তে। কিন্তু 'প্রকাণ্ড বন'-এর মতো 'পাতা পাতায়' 'শাখা শাখায়' 'জোনাকি কীট' 'বুনো আঙুর', 'বিনা চাষের বুনোধানের গন্ধে ঘর' ইত্যাদি অধিকাংশ পংক্তি পাঁচ মাত্রায় পড়া কি স্বাভাবিক? না এগুলি সাইত্রিশ চার-মাত্রার পর্ব? এখন আমার মনে, হয়, চার আর পাঁচ মাত্রা ছন্দ এ-ভাবে মিশিয়ে অভিনব একটি বাংলা ছন্দের সূত্রপাত হয়েছে এখানে। তাকে বাংলা ফ্রী ভর্স-এর চর্চা বলা চলে কিনা, সে-বিচার আশা করি ছান্দসিকেরা করবেন।

পত্রলেখকের যুক্তি শোনবার পরেও 'বেরিয়ে এলেই'-কে আমি পাঁচ মাত্রার ক্রমে উচ্চারণ করতে অসমর্থ। স্বরবৃত্তে লেখা 'সাবেকি' কবিতার

> চার পিসে জমিয়ে মজা হঠাৎ ভোরে হলো অসুখ

পংক্তিটি কী-ভাবে পড়ব আমরা?

—সুরেশ গুহ

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু

'কবিতা'র জীবনানন্দ-স্মৃতি-সংখ্যায় আপনার লেখা 'জীবনানন্দ দাশ' পড়লাম। খুবই চমৎকার লাগল, কিন্তু বিশেষ একটি জায়গায় আপনার সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারলুম না। আপনি 'আট বছর আগের একদিন'-এ কবির যে-দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন আমার কিন্তু মনে হয় না যে সত্যি সত্যি কবির বক্তব্য তা-ই। এ-সম্বন্ধে আমার ধারণাটি নীচে লিখলাম।

আপনার মতে, 'মৃত্যুকে দলিত ক'রে' 'জীবনের গভীর অঘ' জীবনানন্দ প্রকাশ করেছেন তাঁর 'আট বছর আগের একদিন'-এ। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। জীবনের প্রচুর ভাঁড়ারে আনন্দে বেঁচে থাকার খোরাক হয়ত যথেষ্ট আছে; নিছক জৈব আকাঙ্ক্ষার কোথাও কোনো বাধ না থাকলেই অন্যান্য জীবের পক্ষে হয়ত জীবন হয়ে ওঠে চমৎকার, কিন্তু মানুষের পক্ষে তা হয় না। তার কারণ 'আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে আরো এক বিপন্ন বিস্ময়'। তাই প্রকৃতির আনন্দের মাঝার আর সকলে ভুলে থাকতে পারে, বুদ্ধিজীবী মানুষ পারে না। এমন কি, জীবনের আনন্দের জন্যে অন্যান্য জীবের চেয়ে মানুষের যে আরো বেশি উপকরণের প্রয়োজন, তার সব কিছু পেলেও মানুষ সুখী থাকতে পারে না। নারীর রূপের, প্রেম, শিশু, গৃহ, অর্থ, কীর্তি, সফলতা—এত পাওয়ার পরও মানুষের বেদনা থেকে যায়। এই যাকে বলা যেতে পারে দার্শনিক বেদনা, কবি যাকে বলেছেন 'বিপন্ন বিস্ময়' তা ক্রমশই গভীরতর হতে থাকে যতই আমাদের বুদ্ধি জীবনের আপাত-আনন্দের আবরণ ভেদ ক'রে দেখার আমাদের সীমা ও বিশ্বের বিরাট রহস্য। এই বিপন্নতাবোধ, এই বিস্ময়বোধ, একবার জাগলে বুদ্ধিমান মানুষের মনকে প্রতি-নিয়ত এমনভাবে নাড়া দিয়ে বিব্রত করতে থাকে যে বাস্তবিকই তা আমাদের 'ক্লান্ত করে, ক্লান্ত—ক্লান্ত করে।'

কিন্তু তাই ব'লে কবি যে এই অপমৃত্যুকে বরদাস্ত করেন, তাও না। সসীম বুদ্ধি এবং শক্তি দিয়ে মানুষ এই বিশ্বের অনন্ত রহস্যের সীমানায় না-পৌঁছতে পারার জন্যে অপার বেদনা, অপরিসীম ক্লান্তি বোধ করতে পারে; কিন্তু তাই

ব'লে অবাস্তবিক মৃত্যু বরণ ক'রে 'লালকাটা ঘরে টেবিলের পরে খ্যাতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে' চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার মধ্যেও কোনো সার্থকতা নেই। তাই কবি প্রশ্ন করেছেন :

জীবনের এই ঘাস—দূরন্ত অশ্বের ঘ্রাণ যেখানের বিকালেরা—
তোমার অসাড় চোখ হলো।
মর্গে কি শুধু ছুঁড়োলো
মর্গে—কবরেতে—
খ্যাতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে?

হৃদয় তবে ছুড়োবে কেমন ক'রে? কবির হৃদয় ছুড়িয়েছে কেমন ক'রে? এর উত্তর, আমার মনে হয়, কবিতাটির সর্বশেষ পংক্তিতে পাওয়া যায় :

'আমরা দুজনে মিলে মুক্ত করে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।' 'আমরা দুজনে মিলে'—এইখানেই হয়ত রয়েছে কবির ইঙ্গিত। অর্থাৎ জীবনের ভাঁড়ারে যে প্রচুর আনন্দ আছে তা যেমন ঘুরঘুরে অন্ধ পেঁচার মতো আমাদের গ্রহণ করা উচিত, কেননা আমরাও জীব, তেমনি উচিত আমাদের বরণ ক'রে নেওয়া জীবনের ভাঁড়ারে যে-প্রচুর বুদ্ধিগত বেদনা এবং ক্লান্তি সঞ্চিত আছে তাকেও, কারণ তাতেই হল মানুষের স্বাক্ষর। তাই একদিকে আমরা দেখি যে অচিকিৎস্য জীবন-ক্লান্তিতেই কবিতাটি শেষ হ'লো না, কিন্তু কবি তাকে অস্বীকারও করছেন না : 'আমি—তবু আমি···আমাদের ক্লান্ত করে—ক্লান্ত—ক্লান্ত করে—' এর মধ্যেকার আকৃতিই প্রমাণ করে কবির উপলব্ধিতে এটা কতখানি সত্য। অন্যদিকে তেমনি কবিতাটির লিখনভঙ্গির সুরে যদিও ফুটে ওঠে প্রাণসত্তার আদিম আনন্দ, তবু প্রগাঢ় পিতামহীর চোখ পাল্টিয়ে প্রচার-করা ফুসল গাঢ় সমাচারই যে মানুষের জীবনের সর্বশেষ সমাচার নয়, তাও খুব স্পষ্ট। সুতরাং কবিতাটিতে আমরা ঠিক জীবনের জয়-পরাজয় পাই না, পাই বোধ হয় জীবনের স্বরূপ।

এলাহাবাদ

প্রকাশচন্দ্র চক্রবর্তী

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক। অরুণ মিত্র। ৮।১ লালবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা, বসু প্রেসে মুদ্রিত, ও কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

কবিতা
পৌষ ১৩৬২
বিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
ত্রৈমাসিক সংখ্যা ৮৪

সনেটগুচ্ছ

বুদ্ধদেব বসু

না-লেখা কবিতার প্রতি

(১)

অনন্ত জন্মের ধার : মরণের, অন্ত নেই তত :
বীজাণু, সরল ঘর, হাঁটুজল, এক কোঁটা বিষ।
এবং প্রভাবে তার নেই কোনো বিশ কি উনিশ,
সেদিও তেমনি মরে, শুকনো বুড়ি অরাদগে যত।

এমনকি জন্মের আগেই তার আরম্ভ : কেননা—
একটি আমের মূল্য শত লক্ষ মুকুলসংহার ;
যদিও একত্রে ছোটে জীবনের কোটি সম্ভাবনা,
পথে সব ম'রে গিয়ে, খুঁজে পায় অরাদুর ধার

তবু এক—শ্রেষ্ঠ নয়, বলীয়ান, আগ্রহে স্বাধীন ;
হয়তো সে নিরীহ বেচারামাত্র, তবু জ্যান্ত ব'লে,
অজাত বিক্রমাদিত্যে সকলেই অনায়াসে তোলে।

—তোমরা, এখনো যারা সীমান্তেই রয়েছো বিলীন,
আমারে দিয়ো না দোষ ; নিত্য আমি আছি অনর্গল :
কিন্তু বারে-বারে দেখি তোমাদেরই বিত্তিৎসা দুর্বল।

(২)

তোমরা, আমাকে যারা বেছে নিলে—তারপর অনেক অতুর
নাগর-দোলায় মেতে ভুলে আছো এ-দিন ক্ষণিক ;
মাঝে-মাঝে চিঠি লেখো, পুনশ্চের নিশ্বাসে ঘিরুর,
অথচ আংটি যদি দিতে চাই, নানা ছলে কেবাও তারিখ,

কিংবা শুধু চুমো খেয়ে চ'লে যাও, কিংবা বাতাসেরে
চুমো খেয়ে, প্রণকে ভুলিয়ে দাও উৎসুক আঙুর ;
কখনো, মদির চোখে, গোধূলির মতো ছলছলে

ক'রে তোলো সুখ, স্বপ্ন, অভিলাষ, ব্যর্থতায় অনুবন্ধময়—
সান্ত্বন, পুনরাবৃত্ত, অবিশ্বস্ত, পরিবর্তমান :—
তোমাদের বলি আমি : যদিও দুর্জয় অভিমান
হেনেছি অনেক বার, তবু জেনো, অনুভব সব সত্য নয়,

সব নয় আক্রমণ, ক্রন্দন, বৃন্দাবনে মান-অভিমান।
কেউ-কেউ, বিরাট বিস্মিত ক্ষণে অকস্মাৎ ব্যাপ্ত ক'রে ক্ষমা
তৎক্ষণাৎ সর্বস্ব নিয়েছে। হয়তো বা তারাই পরমা।

(৩)

পরমা ?...জানে না কেউ। অন্তরঙ্গ তোমরা কি নও,
হৃদয়ের যুগ থেকে যুগান্তরে প্রত্যহের সমান্তরাল,
দুকান, ছাতার-চেউয়ে বেড়ে-ওঠা উজ্জ্বল প্রবাল,
প্রাকৃতিক অন্ধকারে বৎসরের অদ্ভুত বিনয়

গোপনে রাঙিয়ে দেয় যাদের অজানতে উষার উদ্ভাস ?—
বুঝি না, হয়তো ভুলি। কিন্তু স্বপ্নবেষময় ঘুমে
তোমরা নক্ষত্র ফোটো ; চমকে দাও হঠাৎ যাযাবরে ;

কখনো মাছের ঝোলে মিশে থাকো, সঙ্গে ঝোলো ট্যাবের হাওলে।
তা-ই যদি, তবে কেন দেরি করো ? বালিকার মতো কৌতূহলে
এখনো দেখতে চাও কত দূর প্রস্তুত প্রয়াস ?

এসো না, আঘাত করো, ধ'রে নাও আমারে উদাস,
হানো এক মুহূর্তে যাদব-চৈত্র বিদ্যুতের মতো বলাৎকার ;
না যদি তর্পণে মন, উর্বশীর নীল অভিসার,
নিয়ে এসো গন্ধকে সবলে জলা নরকের প্রকট বিষাস।

স্টিল্ লাইফ

সোনালি আপেল, তুমি কেন আছো ? চুমো-খাওয়া হাসির কৌটোয়
দাঁতের আভায় জলা লাল ঠোঁটে বাতাস বাড়াবে ?
ঠাণ্ডা, আঁটো, কঠিন কোনাচকের বৈদূর্য জাগাবে
অসহ্য স্তনে তারা অন্ধকার হাতের ঘুঁটোয় ?

এত, তবু তোমার আ[redacted]। হেমন্তের যেন অন্ত নেই।
গন্ধ, রস, স্নিগ্ধতা জড়িয়ে থাকে এমনকি উমুখ নিচোলে।
তৃপ্তির পরেও দেখি আরো বাকি ; এবং ফুরোলে
থাকে না পুলক, পুষ্টি, উপকার। কিন্তু শুধু এই ?

তা-ই ভেবে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু মাঝে-মাঝে
আসে ভাবি-চোখের দু-একজন কামাতুর, যারা
খালা, ডালা, কাননের ছদ্মবেশ সব ভাঁজে-ভাঁজে

ছিঁড়ে ফেলে, নিজেরা তোমার মধ্যে অদ্ভুত আলোতে
হ'য়ে ওঠে আকাশ, অরণ্য আর আকাশের তারা—
যা দেখে, হঠাৎ কেঁপে, আমাদেরও ইচ্ছে করে অন্য কিছু হ'তে।

প্রেমিকারা

মেয়েদের হাসির প্রস্রবণ শুনবে না আর।

হালকা পাখির ঝাঁক, বাল্যসখী লোচন সার্পটে,
জ্যোৎস্না-মাখা ভোরবেলা পাপড়ি-ফোটা যার লাল ঠোঁটে
একবার আঙুল ছুঁইয়ে শুধু খুলেছিলে দিনের দুয়ার—

তারাও রহিতে হ'লো সন্তানের সজ্ঞান শিক্ষায়,
ভুলে নিলো যা পেলো হাতের কাছে ; খোলা জানালায়
পর্দা টেনে, ছোট্ট ঘুমের পরে হাওয়ার চীৎকার

শুনে-শুনে ডুবে গেলো অন্তহীন দৈনিক নালায়।
হায়, তবে কখন প্রেমের লগ্ন—যে-মন্ত্রের বলে
উষার অভ্যুদয়, সে-ই যদি রমণীর ভুলে

ছিঁড়ে নেয় বাড়ন্ত জাগরণের সব ক-টি কম্পমান পাতা ?
—যাও, মেয়ে, জীবনের খাস্ত হও ; তারপর যখন তোমার
যুবক-ছেলেরা দূরে স'রে গেছে—হে প্রেয়সী, হে কুমারী-মাতা,

ফিরে এসো তখন ক্রন্দসীর অন্ধকারে রাত্রিরে আবার।

ঋতুর উত্তরে

শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষার দিন, আমি এতদিনে
তোমাদের বিরাট খামখেয়াল জয় ক'রে, হৃদয়সজ্যার
নিয়েছি সুযোগমুক্ত, হৃতভাগ্য মুক্তভাবে চিনে—

আমি, মৃত, নিশ্চিত, ভবিষ্যময়, প্রশ্নের অতীত।
পউষে ফাল্গুনে গাঁথা কান্না-হাসি-দোলানো অন্ধকার
আমারে ছেঁকে না আর ; বড়ো ভোর যাত্র, শিস, রেখার সঙ্গিৎ

এ'কে যায় সামান্য গণিতচিহ্নে পঙ্ক্তিভার পালা—
যেন এক পুরোনো প্রাসাদে শুধু অনুপস্থিতি
যেথায় আঙুল ছুলে ঘরে-ঘরে ঘরচে-পড়া তালা।

আমার হৃদয় আজ চিরন্তন হেমন্তে বিলীন :
কুয়াশা, চাঁদের প্রেত, রশ্মি-জলা পশ্চিমের স্মৃতি—
সব মিলে অন্ধকারে ভ'রে দেয় আলোর পুলিন :

শুধু মনে শুনে-শুনে একতান, অন্তহীন সমুদ্রের স্বর—
নিঃসঙ্গতা। জেনেছি তোমারই নাম শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বৎসর।

মধ্য-সমুদ্রে

বলো, কিছু বলো। আমি অনুরান কান পেতে আছি।
মেঘে-মেঘে বেলা যায় ; যারা ছিলো প্রাক্তন আকাশে
'দিন', 'রাত্রি', 'আলো', 'ছায়া'—তারা এক নির্বোধ উল্লাসে
দিগন্তে ডুবিয়ে দিয়ে পৃথিবীর প্রতীচী ও প্রাচী

নিতান্ত স্বাতন্ত্র্যহীন সমতায় ক'রে তুলেছেলো—
যেমন, বাবার মুখে, বানপ্রস্থ, সৌম্য, স্নেহ, গ্র্যাকার্ড-রেখাগুলি,
সব, তার আপন যাথার্থ্য ভুলে, অব্যক্তের করুণ রুমাল
হ'য়ে র'য়ে যায় পথের দু-ধারে।···বলো, কিছু বলো।

কিছুই অভাব নেই, যে তোমার অভাবে অজ্ঞান।
হাসে, নাচে, খেলে, বলে, মেনে নেয় নিভ'ল পৌঁছনো,
জানে ওরা, বিশ্বত্ব কল্পাস-কাঁটা, বেতারবিজ্ঞান :—

আমার হৃদয় জানে জাহাজ-ডুবির হাহাকার,
ধ্রুবতারা মুছে যায়, কোথাও উত্তর নেই কোনো—
যদি-বা তোমারই বাঁশী সমুদ্রের, ঝাউয়ের মর্মর চীৎকার।

ল্যাণ্ডস্কেপ

ওরা সব নিয়েছিলো ভাগ ক'রে—দেবতা, মানুষ, অবতার,
অজন্তা, মোতের দাম। ধাপে-ধাপে, স্বর্গের সিঁড়িতে,
যুযুধান রাক্ষস কিন্নরগণ ঐকতানে তুলেছে চীৎকার—
'ঈশ্বরে আবৃত বিশ্ব!' তুমি এলে অনেক দেরিতে।

প্রথমে পা টিপে, চুপে। যে-হাসির মেশেনি তুলনা,
তার পিছে, ধূমল ছায়ার পুঞ্জ, পল্লব, আকাশ ;
যেমন জ্যোৎস্নার জলে ডুবে যায় মেঘের কল্পনা
চাঁদেরে ভাসিয়ে দিয়ে। কত ধীরে তোমার উল্লাস!

মৃগয়া, বনভোজন, প্রাসাদের প্রমোদ ছাড়িয়ে
খুঁজে পায় যদি-বা নগরহীন প্রান্তর, ঘাটাল,
চিমনির ধোঁয়ায় তবু প্রশ্ন ওঠে—'ও-ফুটির কাদের আবাস?'

উত্তরে, নির্মম হাতে, অবশেষে ঈশ্বরে তাড়িয়ে
চরাচরে সেজ্‌দানে ছড়িয়ে পড়ে, ত্যাগ গ-র যন্ত্রণা,
এবং রাজার, জয়, বরমাল্য। এবং বন্দনা।

[বালক (ক. ঊর্ধ্ব সমসাময়িক এক শিল্পীর আঁকা একটি নীচের দৃশ্য দেখে মন্তব্য করেছিলেন :
'সুন্দর ছবি। কিন্তু ঐ কুটিরে কারা থাকে? কী করে তারা? কী জানে? আর কিসেরই
তাদের দেখা আছে অনেক?']

'ফ্লার দ্যু মাল' থেকে

শার্ল বোদলেয়ার

আলবাট্রস

মাঝে-মাঝে, সকৌতুকে, নাবিকেরা ধরী করে তারে।—
বিশাল আলবাট্রস, সমুদ্রের বিহঙ্গপুঙ্গব,
যে চলে, অলস ভরে, পাশ হ'য়ে বিষাক্ত পাথারে,
জাহাজের সহযাত্রী, সঙ্গদাতা, পথের বান্ধব।

যে-মুহূর্তে ওরা তাকে ধ'রে এনে রাখে পাটাতনে,
লজ্জায় বিকল এই নীলিমার সম্রাট তখনি
বিরাট, করুণ, শুভ্র ডানা তার, দুই নিশাতনে
মাড়ে যেন দাঁড়-ভাঙা, অসহায়, সন্ত্রস্ত তরণী।

এই সে-আকাশযাত্রী, কত রূপ ছিলো সম্প্রতিও!
অপ্রতিভ কুশ্রীতায় প্রহসন-পুতলি এখন।
কারো বা খুঁড়িয়ে-চলা বিদ্রূপে সে অনুকরণীয়,
অথবা হুঁকোয় নল চঞ্চুপুটে দেয় কতুজন।

—মেঘলোকে যুবরাজ! এটাতো, কবিও হেথায়
ছুকানে আপট দেয়, ব্যর্থ করে কিরাতের কলা;
কিন্তু এই মৃত্তিকার নির্বাসনে, উল্লোল মেলায়
মহান ডানায় তারে অবরুদ্ধ হয় তার চলা!

প্রতিসাম্য

প্রকৃতি, মন্দির এক; স্তম্ভরাজি, প্রাণের কম্পনে
মাঝে-মাঝে অস্পষ্ট প্রলাপে দেয় সংকেত ছড়িয়ে;
সেখানে মানুষ আসে প্রতীকের অরণ্য পেরিয়ে
যে-অরণ্য তাকে তারে অনুক্ষণ অভ্যস্ত নয়নে।

বহু ভিন্ন প্রতিধ্বনি—সুরাগত, গভীর, অক্ষয়,
অবশেষে খুঁজে পায় অন্ধকার, গাঢ় সমতান,
নিশীথের মতো ব্যাপ্ত, অন্ধতার মতো অসীমান—
সেইমতো বর্ণ, গন্ধ পরস্পরে জানায় উত্তর।

কোনো-কোনো গন্ধ যেন অর্গ্যানের নিশ্বনে কোমল,
মাঠের সবুজে মাখা, শিশুর পরশে সুখময়;
অন্যেরা—বিজয়ী, বিষ, কলুষিত, ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল,

এবং যেন অসীমের আদিগন্ত বিরাট বিস্তার—
আম্বর, কস্তুরী, ধূপ, পরিকীর্ণ গভীর লোবান
গুঞ্জরে আনন্দময় আত্মা আর ইন্দ্রিয়ের গান।

পদ্য কবিতা

কবিতা, মানসী, তুই প্রাসাদের উপাসক, জানি।
কিন্তু বল, যখন প্রদোষকালে, হিমেল বাতাসে,
নির্বেদে, নীহারপুঞ্জে জানুরাশি কালো হ'য়ে আসে—
নীলাভ চরণে তোর তাপ দিবি, আছে তো জানানি?

মর্মরে নিটোল তনু; কিন্তু তার পুনরুজ্জীবন
হবে কি বাতায়নের রঙে রেখা ঘীসের শিখায়?
যেমন রসনা নিম্ন, সেইমতো শূন্য পেটিকায়
তরাবি, আকাশ ছেঁকে, নীলিমার উদার কাঞ্চন?

না, তোরে যেতেই হবে, দিনশেষে অন্ধ জোটে যাতে,
মন্দিরে, দাসীর মতো, আরতির ঘাঁসর বাজাতে,
যে-মন্ত্রে বিশ্বাস নেই, মুখে তা-ই জপ ক'রে যাবি,

কিংবা, উপবাসী দুই, প'রে বিদূষকের বসন,
না-দেখা চোখের জলে ভিজিয়ে রঙিন প্রহসন,
ইতর জনগণের তিক্ততায় আমোদ জোগাবি।

পূর্বজন্ম

সরল স্তম্ভের সারি অলিন্দের বিরাট নির্ভর,
রঞ্জিত সিন্দুর সূর্যে অন্তহীন রঙিন শিখায়,
সন্ধ্যারাগে কঠিন গুহার মতো—দৃপ্ত, অতিকায়—
আমি সেই মায়ালোকে কাটিয়েছি হাজার বৎসর।

আকাশের চিত্রাবলী তরঙ্গের বেগে ওঠে দুলে,
সে-গূঢ় গম্ভীর ছন্দে মিশে যায় অচিরে আমার
নয়নে প্রতিফলিত সূর্যাস্তের বর্ণের সভায়,
পরম ক্ষমতাময় সংগীতের কলতান তুলে।

সেখানে পেয়েছি আমি ইন্দ্রিয়ের প্রশান্ত বিলাস,
নীলিমায় কেন্দ্রে ব'সে, চারদিকে ঊর্জস্বলতা, গতি,
আর নগ্ন দাসীদের গন্ধভারে মন্থর প্রণতি—

যাদের অনন্ত ধ্যান, অবিরল সেবার প্রয়াস,
তালপত্র সঞ্চালনে, সে-গোপন দুঃখের উষ্ণতা
যার তাপে ফিকে-তিলে অবসন্ন হৃদয় আমার।

আদর্শ

ক্যাকাশে, মরচে-পড়া, পটে-আঁকা রূপসীর দল,
অন্তঃসারশূন্য এই শতকের শঙ্কিত সঙ্কল্প,
পাদুকার বন্ধপদ, কাস্টানেটে আঙুল চঞ্চল—
এরা নয় তোমার কামের তৃপ্তি, হে মত্ত হৃদয়!

যাদুন নায়িকাদের কাজলিমুখর হাসপাতালে
গাভানি[১], সবুজ কবি, পীত পাণ্ডুরোগের চারণ,
তথা খুঁজি এই সব অতি ম্লান গোলাপের গালে
লালার আরাধ্য ফুল—লজ্জাহীন, শোণিতবরণ।

শীতলসহস্র এই হৃদয়ের আনার সংকেত
দুশ্চিন্তার বিশ্লেষক, লেলিহান লেডি ম্যাকবেথ,
যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন ঈশ্চিলস, তার আবির্ভাব ;

কিংবা মিকেলেঞ্জেলোর কন্যা সেই, উজ্জ্বল সর্বগ্রী,
অদ্ভুত ভঙ্গিতে বাঁকা, ধ্বংসহীন শান্তির অপরী,
দেবতা ও মানবের ভোগ্য যার কান্তির বিস্রাব।

নায়কী

সে-দূর অতীতে, যবে প্রকৃতির মদমত্ত রতি
জন্ম দিতো প্রতিদিন অতিকায় অসুর উত্তাল,
আমার সঙ্গিনী ছিলো মনঃপূত মানবযুবতী,
আর আমি, রানীর চরণতলে, বিলাসী বিড়াল।

তার দেহ-মানসের ঘুমন্ত সুন্দর বিকাশে
বেড়েছি বন্ধনহীন, মগ্ন তার প্রচণ্ড খেলায়,
এবং সজল তার বাষ্পাকুল চোখের আকাশে
খুঁজেছি রহস্যময় হৃদয়ের বিদ্যুৎ-জ্বালায়।

১। Paul Gavarni (১৮০৪-৬৬) : ফরাসি ব্যঙ্গ-চিত্রকর। এঁর প্রকৃত নাম Hippolyte Sulpice Guillaume Chevalier (ইপলিৎ সিলপিস গীয়ম শেভালিয়ে)। প্যারিসের বোহিমীয় ও ছাত্র-জীবনের চিত্রাবলীর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বোদলেয়ার একটি প্রবন্ধে তাঁকে dandyism-এর কবি বলে অভিহিত করেন।

ঘুমেছি বন্ধুর গাত্রে, অপরূপ অঙ্গের সান্নিধ্যে,
আদরে উঠেছি বেড়ে ধাপে-ধাপে বিরাট আয়তে :
কখনো, গ্রীষ্মের দিনে, অবতপ্ত সূর্যের মুহূর্তে

পীড়িত সে, প্রান্তরে বিস্তীর্ণ হ'য়ে শুয়েছে যখন,
ঘুমিয়েছি অনায়াসে তুঙ্গ তার স্তনের ছায়ায়
পর্বতের পদপ্রান্তে শান্ত এক পল্লীর মতন।

দূরাগত দুর্বাস

যখন, দু-চোখ বুজে, হেমন্তের আতপ্ত সন্ধ্যায়,
গান করি তোমার আকৃতিময় স্তনপরিমল,
অকস্মাৎ উন্মীলিত, একতাল তপনে সজল,
পুলকিত পুলিনের বহিরাগ নয়ন ধাঁধায়।

সে-অলস দ্বীপেরে, প্রকৃতি দেয় অজস্র ধারায়
মধুর ফলের গুচ্ছ, অনুপম উদ্ভিদের ভিড়,
ক্ষীণাঙ্গে ক্ষমতাময় পুরুষের সুঠাম শরীর,
অপরূপ সরলতা মেয়েদের চোখের তারায়।

তোমার গন্ধের বানে খুঁজে পাই মোহন মণ্ডল :
বন্দরে অনেক পাল, মাস্তুলের ব্যাপক জঙ্গল
এখনো রয়েছে ক্লান্ত সমুদ্রের উতল বাত্যায় ;—

এদিকে তেঁতুলগাছে সঞ্চালিত সবুজ আঘ্রাণ
নিশ্বাস আকুল ক'রে, নেমে আসে আমার আত্মায়
যেন দূর বাতাসে ধ্বনিত কোন নাবিকের গান।

আলাপ

হেমন্তের সুন্দর আকাশ তুমি, আয়ুষ্করন !
অথচ সিন্ধুর মতো ফুলে ওঠে আমার বিষাদ,
এবং তাহার টানে রেখে যায় কর্কশ লবণ—
অধরে স্মৃতির আশা, কণ্ঠের শিথিল আস্বাদ।

—মুছিত আমার বক্ষ ; তুমি সুধা স্পর্শ করো তারে :
যা চাও, প্রেয়সী, তারে নারীগণ, মদপয়ায়ন,
ছিঁড়েছে প্রখর দাঁতে, নিষ্করুণ নখের প্রহারে।
খুঁজো না হৃদয়, তারে শ্বাপদেরা করেছে ভক্ষণ।

আমার হৃদয় এক জনতার বিদীর্ণ প্রাসাদ ;
সেখানে বাৎসল্যমি, হত্যা, চুল-ছেঁড়া পাগল চীৎকার।
—ছড়ায় তোমার স্তন নগ্নতার সুরভি সংবাদ !···

হে সুন্দর, আমার হাতুড়ি, হানো অমোঘ ঊষায় !
উৎসবের মতো দীপ্ত ঐ চোখে হুতাশন জেলে
দগ্ধ করো ছিন্ন চীর, অন্ধতা যা রেখে গেছে ফেলে।

আধ্যাত্মিক ঊষা

আদর্শ দর্শনময়, আবর্জিত অরুণ প্রদেশে
পা মিশে যখন ঢোকে লম্পটের নির্গত নিশায়,
সে কোন সোপনচারী রহস্যের প্রতিহিংসায়
দেবতার উদ্বোধনে পাশবিক তুষ্টি ওঠে কেঁপে।

পতিত মানুষ, যার বুকে শুধু শাশ্বত যন্ত্রণা,
তারে এই আকাশ, অপ্রাপণীয়, গহ্বরের মতো
অলৌকিক নীলিমায় আকর্ষণ করে অবিরত।
সেইমতো, হে দেবী অমলকান্তা, আমারে সাধনা,

নির্বোধ তোজের শেষে ঘুমঘন উচ্ছিষ্টের পাশে
বিস্ফারিত চক্ষু মেলে চেয়ে দেখি, বিরতিবিহীন,
তোমার সুন্দর স্মৃতি আরো স্বচ্ছ উদ্ভাসে রঙিন।

সূর্য যারে দেখা দেয়, মোমবাতি ভোবে অন্ধকারে ;
তেমনি, হে বিজয়িনী, স্মৃতিপটে তোমার উত্থান
মনে হয় জ্যোতির্ময় তপনের অমৃতসমান।

দুই বোন

উদার, সৌজন্যময়ী, আছে দুই মনোরম নারী,
লাস্যময়ী, এবং মৃত্যু—স্বাস্থ্যবতী, চুম্বনে মহান,
ছিন্নভিন্ন বসনের অন্তরালে শাশ্বত কুমারী,
নিয়তগর্ভিণী, তবু কোনোদিন জন্মে না সন্তান।

কবি, সে অমরপন্থী, অর্ধাসনে অমাত্যপ্রবর,
গার্হস্থ্যের চিরশত্রু, বক্ষ তার নরকের তাপ,
কবর, গণিকালয়, তার জন্য সাজায় আসর,
বেশ্যাবোধে কোনোদিন বলিন করেনি মনস্তাপ।

কদাচারে অতিপ্রাজ্ঞ, বয়সাত্মী যেন দুই বোন,
কঠিন, নিকুঞ্জকোণ ঘুরে-ফিরে আনে উপহার
ভীষণ সম্ভোগ আর আন্তিমিক দুঃখের সম্ভার।

লাস্যময়ী, কদর্য হাতে গোর দেবে আমারে কখন ?
আর মৃত্যু, আকর্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বী, কখন সেধাবে
তোমার সাইপ্রেস সেই যন্ত্রণার বিবাক্ত প্রভাবে ?

মরকী সাপিনী

কী যে ভালোবাসি, প্রেয়সী, তোমার অনুবিতান !
—ছলন অঙ্গ-চালনে
মনোহর যেন রেশমের মতো কম্পমান
রশ্মির প্রতিফলনে !

সাগরের মতো গভীর, সুরভি তোমার চুলে,
যেখানে অনবরত
নীল, পাটকেল ঢেউ জেগে ওঠে যাউচুলে,
স্নিগ্ধ স্মৃতির মতো—

সেখানে আমার মনে আসুক আত্মা
ভোরের হাওয়ার টানে
জাহাজের মতো জেগে উঠে করে যাত্রা
সুদূরের সন্ধানে।

আর, মধুর কিছুই বলে না চোখের ধনি ;
কেবল অতল মেশা
জ্বলে যায় যেন ঠাণ্ডা, কঠিন, যুগল মণি,
লোহায়, সোনায় মেশা।

অথচ, বিলোল রূপসী, কথায় অজস্রতা
তোমার চলার ছন্দে,
যেন সুন্দর সাপিনী সোহাগে নৃত্যরতা
অদ্ভুত আছন্দে।

শৈশবে ভরা, মধুর, ঐ ছোটো মাথায়
ভাবনার ভারতম্য
তরল হাস্তির মতির, কোমল শিথিলতায়
খুঁজে পায় তারসাম্য।

এবং তোমার তনুর মধুর আন্দোলনে
তন্দ্রী তরণী চলে,
গলুই ডুবিয়ে, অনুরক্তির আবর্তনে,
ঘূর্ণিকুটিল জলে।

লঘু-গলমান রেসিয়ারে জাগে প্রকম্পন
তরঙ্গে বেগ আনতে,
তোমারও তেমনি উঠে আসে রবে নিষ্প্রাণ
কেনিল দাঁতের প্রান্তে,

মনে হয় আমি গান করি কোনো বোহেমিয়ার
তীব্র, বিজয়ী মত—
তরল আকাশে লক্ষ তারার অন্তরাল
অথবা হৃদয়ে লক্ষ।

অভিনয় লাস্যময়ীকে

রমণীর কোনো পূর্ণচন্দ্রের মতো
তুমি তোমার, ললাটের আলো-ছায়া ;
হাসি খেলে মুখে, যেন সে সন্তোষ হাওয়া
স্বচ্ছ আকাশে মেঘার ইতস্তত।

স্নিগ্ধ, মধুর গাত্রের খাপে-খাপে
যে-যৌবকোমল সোনায় ঘাম বিলসে,
তা দেখে তাদের সবল দৃষ্টি ঝলসে—
তুমি ছুঁয়ে যাও আস্তে, যে-সব মনস্তাপে।

তোমার প্রতুল প্রসাধন-পারিপাট্যে
চৈত্ররথের তুমুল প্রতিধ্বনি ;
তা দেখে কবির মনের আঁধার খনি
জ্ব'লে ওঠে কোন ফুলের নৃত্যনাট্যে।

মৃদু বসনে কত না রঙের চিহ্ন
তোমারই চপল মনের চিত্রকল্প ;
মৃদু রমণী ! মোহিনী নির্বিকল্প !
কত ভালোবাসি তত বাসি তোরে ঘৃণ্য।

মাঝে-মাঝে, কোনো মনোহর উদ্যানে,
বিছিয়ে আমার পাণ্ডুরোগের ক্লান্তি,
দেখেছি, সৌর কিরণের উৎক্রান্তি
কঠিন ব্যঙ্গে বক্ষ আমার হানে।

বসন্ত, তার সমুদ্রের আধিপত্যে
আমারে পরম লজ্জা দিয়েছে ব'লে,
ফুলের আঘোষ বাড়িয়ে পায়ের তলে
শান্তি দিয়েছি প্রকৃতির ঔদত্যে।

সেদিনও, কোনো রাত্রে আমার প্রাণে
বাসনা প্রদোষ, হাসা দিয়ে, নিঃশব্দ—
রতির প্রভাবে প্রহর যখন স্তব্ধ—
তোর ভবিষ্যৎ মনের সন্ধানে।

হ'তে চাই তোর দুঃখ ভরুর ইচ্ছা
ক্ষমাহীন ভবমূলে আঘাত হ'য়ে—
এবং উভয় বিস্মিত অন্তরে
দীর্ঘ, কঠিন, ক্ষমাহীন এক ধন্যা।

তারপর—এ কী মধুর অপমান !—
ঐ অভিনব, উজ্জ্বলতর ঠোঁটে
সবিদ্রূপ প্রতিহিংসার ছোটে
আমার তীব্র মরণ—মোর আমার।

লাল চুলের তিখিরি মেয়েকে

লাল চুলের, কর্শা, একমুঠো
বালিকা, তোর ঘাঘরা-ভরা ফুটো
দেখায় তোরে অকিঞ্চন অতি
এবং রূপবতী।

স্বাস্থ্যহীন তরুণ তনু তোর
ধূলির দাগে চোখে লাগায় ঘোর,
আমারে দেয় মধুরতার ছবি—
আমি, গর্বিত কবি।

কাঠের জুতোয় গরবে তোর, মানি,
লজ্জা পায় উপন্যাসের রানী ;
চলুন তিনি জিমখানের জুতোয় ;—
তবু তোরে জিতোয়।

জাকড়া-কাবি চাকে না তোর লাজ ;
তার বদলে দরবারি এক সাজ
বিশ্বজিত লতা ভাঁজে-ভাঁজে
পড়ুক পায়ের খাঁজে ;

রঙ্গময়, ছিন্ন মোজা জোড়া,
তার বদলে সোনার এক জোড়া
জংঘা তোর যেন মোহন রেখায়
লম্পটেরে দেখায় ;

হালকা গেরো উন্মোচন করুক
দুটি চোখের মতো যে তোর বুক
দীপ্তিময়—লাবণ্যের চাপে
আমরা জলি পাপে ;

নির্বসনের সময় বাহুযুগল
যেন অনেক আবর্জিতে হয় উতল,
ফিরিয়ে দিতে না যেন হয় ভুল
দুর্জনের আঙুল.

যত সনেট লিখে গেছেন বেলো[১],
বাহাই-করা দুজো ঝলোমলো,
প্রেমিক তোর দাসেরা অনুরাগ
দিক না তোরে যান,

হতশ্রদ্ধা কবির দল, খাতায়
নামটি তোর লিখুক প্রথম পাতায়,
কুড়িয়ে নিতে খুঁজুক ছলছুতো
সিঁড়ির চটিজুতো ;—

Remi Belleau : ষোড়শ শতকের ফরাসি গীতিকবি।

পৌষ ১৩৬২

চটি তো নয়, কোমল এক নীড়,
তার ভেতে যে বেয়াল্লিশটি হিড়,
আড়ি পাতেন ভবন্নাথেরা নাচার,
এবং অনেক রঁসায়।[১]

কুলের চেয়ে আরো অনেক বেশি
শব্যা তোর ছুঁয়ের মেশামেশি,
তোর ক্ষমতার বিপুল পরিমাণে
তালোয়া[২] হার মানে।

—অবশ্য তুই এখন ভিখারিনী
ঐ যেখানে চলছে ঝিকিমিনি,
হাত বাড়িয়ে দাঁড়াস চৌকাঠে
শস্তা মালের হাটে;

আহা যে তোর চক্ষু ভরে আলায়
চোদ্দ আনা দামের মোতির মালায়,
সেটাও তোরে—মাপ করো গো মিতে—
পারি না আজ দিতে।

তাহ'লে তুই এমনি চ'লে যা রে,
বিনা সাজে, গন্ধে, অলংকারে,
শীর্ণ দেহে নগ্নতাই শুধু
সাজাক তোরে ধূ।

অনুবাদ। বুদ্ধদেব বসু

১। Pierre de Ronsard (১৫২৪-৮৫)। ফরাসি কবিদের, যেমের কবিতার জন্য বিখ্যাত।
২। Valois: ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ রাজবংশ। ১৪২৮ থেকে ১৫৮৯ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

দুটি কবিতা

জ্যোতির্ময় দত্ত

আচাভুয়া পাখি

আমার হৃদয় আবার হ'লো অবাধ্য, অবুঝ।

বাইরে বৃষ্টিতে ঝড়ের ক্লান্ত পাখি সর্বত্র
বাসা খুঁজে ফেরে, অন্ধকারে জোনাকির মতো।
কিছু অশিষ্ট বাসনা ভেসে বেড়ায়, আর তোমার
স্বপ্ন রাতের গলিতে বেড়ালের চোখের মতো জ্বলজ্বল সবুজ।

আমার বেদনার পরিধি নেই। তোমাকে বাসনার
উপচার অর্ঘ্য দিয়ে নিজে সে সর্বদা জ্বলে,
পূর্ণিমা-ক্লান্ত কৃশ চন্দ্রের মতো দুলে দুলে,
প্রতি রাত্রির আঘাতে ক্ষীণ হ'য়ে, ঝাঁপ দেয় তমিস্র সমুদ্রে।

আমি যদি নির্বিকার হতাম কোনো শুকসুরে,
উদাসীন বৈরাগীর মতো, যদি চাইতাম তোমায়
এত না অবুঝ হতাম, তবে সময়ের শত চাঁদেরা
মায়ের বুড়ির চেয়ে হতাম না ঘুরঘুরে।

সারা রাত মাতাল এক খিশকালো ঘোড়া
হৃদয়ের আল ছিঁড়ে ছুটে চ'লে যেতে চায়,
(পাখিরা পাগল হ'লে বুঝি সাজে খোঁপা বুঝি।)
সারা দেহে তোমার চাঁদের
পাখা ঝেড়ে নেয়ে ওঠে অবুঝ সেই অদম্য পাখিরা।

তোমার অধরে আছে আমার মরণ-কাঠি,
আমার মৃত্যুর বীজ নিয়ে তোমার অধর-দোপাটি
উঠলো এত লাল হ'য়ে। ঐ পূর্ণিমার মুখে-ঘোওয়া বিষণ্ণ, মুখ
আমার হৃদয়ের আসন অসুখ।

চুক্তি করি এসো এই সময়ের সাথে।
সময় আমার নিষ্ঠুর কশাই, তার আঘাতে আঘাতে
মৃত গুয়োরের চেয়ে মৃততর হোক আমার হৃদয়,
ক্ষতি নেই। শুধু এই হৃদয়ের ফল খেয়ে, বিদ্ধ
পাখির অন্তর এই হৃদয়ের রাঙা ফল খেয়ে সুদূর সময়
গ'ড়ে দিক সকল কালের সেই মৃত্যুহীন পাখি।

এ কবিতা সেই পাখি, এ সেই বেদনার শিস।

এ এক অদ্ভুত পাখি,—অদ্ভুত, আচাড়ুয়া।
চেয়ে দেখ হয়ত এ পাখি নয়, সুরও নয়, তবু
এর গানে কত জনে কত কিছু বলে। কেউ ভাবে
মধুর ছন্দে এর কোনো রাজকীয়
ব্যবধান আছে, কেউ বলে এ জগতে রূপের অভাবে
পলাশবনে আজও এ কোন চন্দ্রাতপ তাঁবু,
কেউ খোঁজে জগতের কোন দূর প্রতিধ্বনি,
আর কেউ বলে এ শুধু সবার গোপন স্বপ্নের উপমেয়।

আসলে এ পাখির হীরার হৃদয়। বক্ষপাঁজরে আমাদের মতো
কখনো কাঁপে না থরোথরো, কোনো তীরে হয় না আহত।

বাসনায় বিক্ষুৎসাহ, কামনায় স্থির,
সময়ের স্রোতে হেসে-খেলে
উঠে আসে আরো বলবলে,
উজ্জ্বলতর দেহে। যদিও
সে-যানে
মানুষ
কবির।

উদ্ভিদ-সাগর

ডাওলার আচমকা আটকে গেলো। বাঘ-চাঙরের দাঁত
কন্ডুইয়ের কাছ থেকে হীরকের মতো এক হাড়
কেটে নেছে নিয়ে। ঝিনুকের মাঝে তার ক্যাকাশে, মৃত হাত
ঘুমন্ত পাখরার মতো। তলোয়ার মাছ তার পাঁজরায়
বাঁ পাশে, এদিকে, সাপের চোখের মতো ছোট্ট এক
গর্ত খুঁড়েছে। সব সমুদ্রের ডুবে-যাওয়া প্রত্যেক
নাবিক কেমন ক'রে যে আটকে যায় এখানে এসে ;
এই এক মৃত মানুষের উদ্ভিদ সাগরে আসা সাত হাত ভেসে ভেসে।

যেদিন প্রথম এ সহরে এলাম সেদিন দেখি
এক চড়ুইয়ের একরত্তি এক হৃদয় নিয়ে এক আফ্রিকার পাখি
তার সদ্যোজাত পাখকটিকে কী স্নেহে খাওয়ায়।
যেখানে সবুজ সমুদ্র গভীর হ'য়ে নীলতম হয়
সেখানে ডুবে-যাওয়া নাবিকের, সমুদ্রের উদ্যানে,
প'চে ডাওলা-হ'য়ে-যাওয়া হৃদয়ের কোণে

হাজরের নিষ্ঠুরতায় উন্মত্ত রাত্রের তরঙ্গের স্মৃতি
সে-ছোটো চড়ুইয়েরও। তোমার পাখিরও
ছোটো দুই ডানা কাটা, জোগানো হয়েছে কাজে
বিলাস-বাগানে সবুজ ডালিমের মতো; তোমার হৃদয়
তোমো বৃন্ত সমুদ্রে নিহিত প্রবাল, আমার অন্ধ প্রিয়ার গলায় পুঁতি।

সারা দেশের পথ এই শহরের দিকে।
কালকেই একপাল ফুটানি মেয়েরা এলো উত্তরের থেকে;
গলায় ভালুক-দাঁতের হার, কানে ইরানি ঢালের মতো দুল;
কালকেই হয়ত আবার শহরে হাজরে
ধ'রে নিয়ে ব্যবসায়ে নামাবে। খাটোতর চুল
আর হীনতর ঠোঁটে রং মেখে দরজার ধারে
দাঁড়াবে একপাল হায়েনার মতো।
রাত্রের প্রভাবে
নগরের রূপ বদলালো। মাইজরীর অবহাওয়ার আরণ্যে
দূর হ'তে ভেসে আসা নদীর ধ্বনির মতো সদর রাস্তায়
একটানা সুর। আলো নিভে গেলে, বাড়িগুলি দুঃস্বপ্নে
আমার মনে হ'লো কালো, কালো অসংখ্য মহিষ
যেন এক অন্ধকার ঘাটে ব'সে আছে। পথের বিস্তার
কোন এক নিকষ-কালো নিষ্ঠুর সাপুড়ের শিস
শুনে ছেলে-ভুলে নিশ্চিন্ত-মৃত্যুর-পানে-যাওয়া সাপ। আমি
আর না-পেরে ছুটতে শুরু করি। সেই সাপুড়ে

আমার প্রত্যেক দিকে উন্মাদ সর্পিণীদের ছেড়ে
নিজে সে পশ্চাতে আসছে। চোখ বুঁজে
ছোটতে থাকি, আর যখন তারা ছিঁড়ে ফেলতে থাকে

আমিও সমর্পণ করি নিজেকে তখন। আমার দেহের ভোজে
আমিই চরম বিলাসী। আর দেখি হাতেনাগুলির হলুদ দাঁতের দাঁতে

এক চড়ুইয়ের হৃদয়, ছোটো এলাচ ফুলের মতো,
আর চুঁইয়ে-চুঁইয়ে পড়ে, ছানার জলের মতো, তার সমুজ রক্ত।

সমুদ্র-তীর্থ

শান্তিকুমার ঘোষ

উর্মিলা । চোখ আর চলে নাকো দিগন্তবিস্তার ওই সমুদ্রের দিকে চেয়ে
শুধু নীল ফেনিল আবর্ত ঢেউ আমরণ যন্ত্রণায় চেয়ে
সৌরতীর্থ কোথা আছে সেইখানে চলো।

ইন্দ্রনীল। উর্মিলা, কখনো
তরঙ্গের সাতরঙ আখো নিকি ধূপছায়া নামে যেন
ঘুম হ'য়ে দুই চোখে ; শৈশব উল্লাসে যেতে
পারো না কি ঢেউয়ে-ঢেউয়ে দূরে চ'লে যেতে
হৃদয়ের শঙ্খ ভ'রে সমুদ্রের সুরে।

উর্মিলা । তটভূমি ঢের ভালো,
তার ফুলে দেবতার পূজা দিয়ে আরো আলো
নেব চেয়ে। ইন্দ্রনীল, হাত দাও, চলো সাথে।

ইন্দ্রনীল। জেনো তবু
নীড়ের মমতা বৃথা—ঘরে নাকো প্রশান্ত হৃদয় কভু
মাটির সে-ছোটো ঘরে। অনন্ত সমুদ্র চাই—চাই তার আরো…

উর্মিলা । অনন্ত সমুদ্র তবু জান সেতে শোনো তুমি তারও
তরঙ্গ উত্তাল বুকে মৃত্তিকার গান বাজে সৃষ্টির গান,
মাটির পুতুল ঘিরে চুম্বনে মাতাল সে-ও।

ইন্দ্রনীল। বিশাল প্রপাত-ঢেউ খানখান
ভরে শুধু তীরতট। হাঙরের তীক্ষ্ণ দাঁতে মৃত্যুর কঠিন গান।

উর্মিলা । অসংখ্য প্রবাল ভ'রে অন্ত দিকে গ'ড়ে ওঠে
দ্বীপময় মহাদেশ ; পাখিরা নতুন বীজ নিয়ে আসে ঠোঁটে।

ইন্দ্রনীল। সংহত সৃষ্টির বাষ্প এই সিন্ধুজলরাশি।
এখনই প্রাক্তন বেগ ঝড় তোলা অন্ত হাসি
মানুষেরও মনে। জীবনের মধ্যে ডুবে লাফ দিয়ে ঢেউ ধরে;
অতৃপ্ত বাসনা তবু হৃদয় মথিত ক'রে
বাঁধ নেছু সব ভাঙে। ঈর্ষা লোভ ঘৃণা দ্বেষ
সনাতন অন্ধকারে কী বিরাট ঢেউ তোলে।

ঊর্মিলা। সেই সমুদ্রের
গভীর অতল থেকে তারা বুঝি মুক্তা আনে
মৈত্রী প্রেম মানবতা।

ইন্দ্রনীল। অন্য তীর্থ নেই তাই। ঊর্মিলা, এখানে
তোমার পবিত্র প্রেম মণিকা আলোক জলে সহস্র ফণায়।
হাত দাও, এসো তবে—তোমার চরণ রাখো সোনা সিকতায়।

ঊর্মিলা। অপূর্ব সৃষ্টি এই আলোড়িত জল আনি অমৃত-আধার,
সন্তাপ দুর্বের রথ রাত্রিশেষে আনে দিন দীপ্ত চেতনায়:
পরম মুহূর্তে তবু প্রণত হৃদয় ছোঁয় তোমার আমায়॥

দুটি কবিতা

সুকুমার রায়

বাড়ি

নির্জন, নিশ্চুপ পোড়ো বাড়ি।
বাতাস বইছে ঘুরে-ঘুরে, নিরালা, সুরেলা মনে।
কোথাও জানলা খুলিয়ে পড়লো,
দরজা খুলে দিলো অন্ধকার কুঠরি।
বাতাস ঘুরে বেড়ায় ঘরে-ঘরে।
কতো কথা সে বলতে চায়—
আমি তার ভাষা কিছুটা বুঝেছিলাম।
নির্দয় সমালোচক,
যদি তুমি অতো কঠোর না হ'তে
আমি তোমাদের শোনাতে পারতাম বাতাসের গান।

কৈশোর

ছোট নাও ; প্রলাপ বেন তুরু।
ওপার থেকে আষাঢ় আসে,
বৃষ্টি হ'ল শুরু।

আমার বুকে এলোপাথাড়ি ঝড়,
কথার মালা হারিয়ে গিয়ে
মেঘের গুরুগুরু।

ওরে আমার মন,
হলিস কেন মন ?

ছোট নাও ; প্রলাপ বেন তুরু—
তারি মধ্যে আমার মন কাঁপছে দুরুদুরু।

হাসি শুধু হ'লো ইতিহাস

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

যে-হাসি ছিনিয়ে দিয়ে নদীর প্রলাপে
ঢেউগুলি রাতদিন কাঁদে
সে-হাসি তোমার ঠোঁটে ছলনায় বলে—'ভালোবাসি।'
বহু প্রতিযোগী প্রশ্ন ওঠে নিত্য ক্রুর অপলাপে
বন ঘাঁটে ঘোঁয়া-ঘোঁয়া সংশয়ের রাশি।
ক্ষয়াগত বলে—কই? বলো তবে? বলো, বলো, বলো—
শুনে শুনে নদীজল আরো যেন হ'লো ছলোছলো,
নদীতীর চিরে-চিরে শোনা গেলো তরঙ্গিত হাসি।

অনেক বর্ষার সুর নিঃশব্দে ঝরিয়ে
করুণ কেয়ার কোল দাবদাহে সরিয়ে
খুঁজে খুঁজে পেয়েছি যে সংশয়ের ছলনাময়ী নাগিনী
বলেছে সে—সুনিশ্চিত ক'রে কই আজো তো জানিনি
হাসি তা কি? ছিলো বাকি যতো কিছু
শেষ ক'রে কান্নার চরম রাগিণী
পেরিয়ে অনেক পথ, অশ্রুর সমুদ্র উথলিয়ে
আছে যে হাসির দীপ বেদনায় নাবাজর ব'লে থাকে চিনি।

অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় তারপর কেটে গেছে দিন
বেশ কেটে হাসি ফোটে
ভাঙের রামধনু আর বার হয় যে বাড়িন।
ব্যথা তো পেয়েছি ঢের, কেঁদেছিও অঢেল কান্না
হেন দুঃখ পাইনি তো যার সঙ্গে দেয়া চলে
অন্তরঙ্গ এ হাসির কিছুটা তুলনা—

পৌষ ১৩৬২

রিয়েছে যা এ জীবনে মুহূর্তের মুখে চিরকালের আভাস
শাশ্বত, ক্ষয়ব্যয়হীন।
ইতি নেই যে হাসির এ জীবনে তবুও যা
বার বার হ'লো ইতিহাস :
প্রতিশ্বাসে সমীরিত সে-হাসির পরিমল
মনে, প্রাণে অস্তিত্বে বিলীন।

চেনা পাখি

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

সূর্যের হাতে সোনার পদ্মে সন্ধ্যা তখন,
ঘাটিতে মন্ত্র···ভীরু হাতে কার আঁকা চন্দন ;
যেখানে শিশু ঝাউদের ডালে ছায়া ঘন হয়
সেখানে রাতের কান্নাকে নিয়ে শান্ত চুড়োয়
পুরোনো দিনের ছায়া ছুঁয়ে আসে সেই চেনা পাখি

হৃদয়ে এখন কালের ঘন্ত—কোন সুরে ডাকি ?

যে-সুরে পাখির সাড়া পাবো আর নিবিড় সখ্যে
দিগন্তরেখা ঢেউয়ে হবে ঘন সমচারী,
কোথায় সে-গান ?—পুরোনো মেঘের অন্তরে সুপ্ত,
ছিন্ন স্মৃতির অন্তর্লীনায় কান্না তারই !

সাম্প্রতিকেরও মেঘে নেই তার মনের সঙ্গ
এ-আকাশে কই প্রথম দিনের সে-অনুষঙ্গ ?
তবুও পুরোনো ছায়া-দীপ চোখে সেই চেনা পাখি !

হৃদয়ে এখন কালের ঘন্ত কোন সুরে ডাকি ?

সময়ের সব কিনে এল ধীরে হৃদয়ের তালে,
সেই চেনা পাখি উড়ে গেল কের দূর গতকালে ॥

একটি স্বপ্ন

প্রতিমা পাল

কাল রাতে,
হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল।

জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল এক টুকরো নীল
আকাশ। দেখলাম দুটি কি তিনটি
শাদা পাখি উড়ে গেল—
হাতছানির ডানা নেড়ে নিজেদের ভাষায়
স্বাগত জানিয়ে। আমি শুনলাম
হেদোর মোড়ে যে-ছোটো ছেলেটা
ঘুন বিক্রি করে, তার মতো গলা ;
সেই আশ্চর্য দিনগুলি আর নিজি।
তারপর, আকাশের একটি তারা ছুটে
এসে আমার জানালায় মুখ বাড়ালো ;
তার ঘোলাটে আলো আমার শাদা
বালিশে।—কোথায় যেন একটা
বেড়াল কেঁদে উঠলো, আর
পোষা কোকিলটা খাঁচার কাপড়টালো ডাকা।
তারপর আর কিছুই
মনে নেই। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ;
হয়তো একবার সেই সোনালি তারাটাকে
ছুঁতে পেরেছিলাম।

কবিতা
বর্ষ ২০, সংখ্যা ২

দুটি কবিতা

সৈয়দ শামসুল হক

তার স্বত্ত্ব

ইজমালি যারা গেছে বিমানপতনে।
সর্ষা ছিল পৃথিবীকে মুঠো ক'রে ধরে
নরম গোলাপ এক কমলালেবুর মতো।

যাবতীয় ছিল তার বইয়ের মলাট, টাই, নাম,
আর নকটার্ন সিউ। সম্ভবত আরো ছিল
গজ দুই নাইলন সুতো।
যারা গেল অল্প বয়সেই
অনেক ওপর থেকে নানাচাপ হাওয়া সাঁতরিয়ে।

তোমরা এখনো যারা যাবে কোনো চায়ের বিকেলে
সদাশয় মহিলার কাছে—
(একদিন সমবেত শোক করা গেছে)
'আজকে আসেনি ওরা ?'
'চায়ে চিনি নেই ?'
কথা আর হাওয়া এই :
'ইঁ্যাগো কি মাতাল কোনো কিশোর লেখক ?'
'যাই বলো, করতো সে বড্ড বেয়াড়া।'
—জেনে রেখো, ইজমালি হৃদ্য দেহে শিহরনই আছে।

যজ্ঞনী

আকাশে উদাসী মেঘ ;
মর্ত্যে তুমি যাত্রাও যজ্ঞনী :
ধূলোর ব্যাউল তুমি
তুমি তারে ব্যাপ্ত ক'রে আছো।
নিমের আড়াল আর কামরাঙা ছায়া
সেখানে দাঁড়াও এসে
ছেলেবুড়ো, আধবুড়ো, আইবুড়ো মেয়ে
সকলেই সন্তানের অধিকারে ভালোবাসা বোনে,
তুমি যাত্রাও যজ্ঞনী।

কী যাদু ছড়াও তুমি গ্রাম থেকে গ্রামে ?
স্বর্গ কি তরাতে পারে বাংলার বিকল হৃদয় ?
তোমার নৈরিক ছায়া শান্তি আনে এ রোদ্দুরে, তুমি
লোক থেকে লোকে।

চেতনায় গূঢ় ধূলে জল দাও, বীজ,
শস্য করো চিরকাল, হাসি দাও কান্নার সময়ে,
উপক্রত হৃদয়ের বাঁধ ভাঙো ভক্তির প্লাবনে ;
চিরকাল যাত্রাও যজ্ঞনী ॥

সহজ

রবেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

নখ ভ'রে রক্ত কত, হিংসা ওরে ভুলে,
প্রিয়তম অস্ত্র মেরে কোলে ক'রে তার ;
কুলদাধা একবার তারে কেঁপে ওঠে :
মৃত্যু দিয়ে ফিরে আসে দুঃখ নেই আর।...

সাংঘিক ক্ষণ এক ছিলো তার আগে।
হিংস্র বিড়ালীর মতো বাচ্চা লুকিয়েছে ;
বাহু প্রেত শস্ত পিতা অন্ধকার ঘিরে—
বিশ হাজার লক্ষ লোক তবু ছড়িয়েছে।

যে-নারী ঝর্নার জলে দেখেছিলো মুখ
এ-সন্ধ্যায় আয়নায় সে-ও আছে আজ ;
কাজের পালক দিয়ে দীর্ঘ চুল আঁকে,
জামার গলায় জলে অজন্তার কাজ।

সাজানো বসবার ঘরে চক-দাদা আলো
ছাড়া ফেলে, বিমুক্ত-বোতাম দুটি স্তন ;
কেঁপে উঠে সুপ্ত শিশু বুকে চেপে ধরে ;
নগরে বন্দুক তোলে ক্রুদ্ধ সাইক্লোন।

একটা নষ্ট ফল

নরেশ গুহ

আহা রে, তুই কে ফল অকালে,
ফলন ডালে ফলতে গিয়েছিলি?
কেউ এখানে ফলতে আসে না রে,
খোঁজে না কেউ বেদনা নিরিবিলি।
ত্রিখিরিদের ভীত পায়ের ফাঁকে,
ব্যাভিচারীর পাপ-মেশানো পাঁকে,
ভুলের বেলা অবহেলায় ঢাকে,
ছি ছি ছাপায় প্রাণের ঝিলিমিলি॥

তাপ-ঝুড়োনো ঘাটের বারাণসী,
তুই এখানে? কী দেখতে যে আসা।
—আকালে-সোনা-বাদীতে উর্বশী।
—বিশ্ব ভুলে বিধাতা ভালোবাসা?
দেহের কোষে যা এনেছিলি, তার
তীর্থে ভিড়ে ছলিত সমাচার
পৌঁছবে না ত্রিদিবে, সংসার
বুঝবে না সে-অভিধানের ভাষা॥

বর্ষ ২০, সংখ্যা ২

দুটি কবিতা

আশ্বিন

রবীন্দ্রনাথ সেন

বালিহাঁস ফিরে এলো আর বছরের পথ চিনে,
বাতাসে রোদের ঢেউ শেফালি-বৌটায় হলে ছাতা,
ঘুমভাঙা মুখ তুলে চেয়ে রয় দূর চাঁপাডাঙা,
একটু সজল ছায়া দূরতর দিগন্তে দক্ষিণে ॥

নিশাচর

সারারাত ধ'রে
উড়েছে সে ফিকে শাদা কুয়াশায় ঢাকা প্রান্তরে,
ঘুমভাঙা চোখে
ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে এই শূন্য মাঠের কুহকে।
মন যেন পাখি,
ক্ষীণ বাতাসের টানে সঙ্গীহারা নিঃশব্দে একাকী
আবিষ্ট জানায়
ভেসে গেছে ক্লান্তিহীন, কার্তিকের নীল জ্যোৎস্নায় ॥

একটি ইচ্ছার সংগীত

(ফেদেরিকো গার্সিয়া লর্কা অবলম্বনে)

কবিতা সিংহ

আহা কী বেদনার আমার প্রান্তর
যা-কিছু অপরূপ চেয়েছে যবনিকা !
বেদনা জানবার বেদনা জানবার,
একটি সন্তান এই তো কামনার ;

এ যেন মনে হয় হাওয়াকে দিতে চাই,
ঘুমোনো চন্দার ফুলের ডালাটাই,
আমার কিছু নেই, আছে তো শুধু এই
তরুণ কাঞ্চন স্বপ্ন ভুবা-ধার,
আমার প্রান্তর আহা কী বেদনায় !

তরুণ ভূধরের গতিতে ছন্দিত
আমার বাসনার কোমল কোষে গড়া,
সে-আশা নাড়া দেয় মনের ডালপালা
এখনো অঙ্ক সে বসনে ঢাকা আছে
আমার উরসিজ, যেন সে শিশু ঘুমু
ঘুমিয়ে আছে বুঝি কোটেনি চোখ তার,
আমার প্রান্তর আহা কী বেদনায় ।

হে মাটি বৃত্তিকা হও না অন্তমতী
মুক্তি খোঁজে কার প্রাণের শিশুচারা
বন্ধ্য কুচ যুগ হোক না ধারাবতী
করেনি শিরানদী করো না চন্দনা ।
বন্দী শোণিতের অসহ যন্ত্রণা ।

চেতনামূলে যেন ক্রুদ্ধ মৌমাছি,
কঠিন হলে তার, হৃদয় আঁচড়ায়,
শোধিতে কামনার যাতনা দুর্বার,
অপার প্রান্তর আহা কী বেদনায়!

যখন উদ্ধারা এমনি দুর্মর
আশার উন্মিলা উতল উত্তাল,
আসতে হবে তাকে পেরিয়ে দুস্তর
অসীম বাসনার ঢেউয়ের পারাবার
অপার প্রান্তর আহা কী বেদনায়।

নীলাভ সাগরিকা গর্ভ থেকে তার,
লবণ জন্মায় লবণ তার দান
তেমনি প্রজননে শাখায় কলতায়
তরুকে দান করে যুবতী মাটি প্রাণ,
এমনি নিয়মেই চলেছে পৃথিবীর
ফসল ফলানোর প্রাণের উত্থান!
তাই তো আমাদের জরায়ু তাকে ঢাকে,
কোমল পেটিকায় নিজের সৃষ্টিকে
তরুণ শিশুদের যতনে ঘিরে রাখে,
বাদল-মেঘ যেন, মধুর বৃষ্টিতে।
বেদনা যেন সেই মেঘের ঝংকার।
অপার প্রান্তর আহা কী বেদনায়।

একটি ছবি

অর্জন দাশগুপ্ত

জানালায় থেকে দেখা : প্রত্যহের মাতাল আষাঢ়ী
ত্রিকোণ তাঁবুর রেখা, আকাশের উজ্জ্বল ক্যানভাসে
মেঘের বর্ণালি আর সকালের আত্মঘাতী রোদে
কোটলায় কোনো মেয়ে সুর যেন লোকসঙ্গীতের—
ঘাঘরা, কাঁচুলি আর ওড়নার রঙ আকাশের
ঝুলির আঁচড়ে টানা ; ওর শ্যামা মূর্তির প্রক্ষেপে
এক ঝাঁক প্রজাপতি ঝলোমলো নির্লজ্জ বাতাসে :
জানালার কাচে আঁটা চেয়ে থাকি ভদ্রলোক আমি

আর ভাবি কোটলায়ই কোনো এক গোয়ালা দুবার
জোয়ান যৌবন যাঁর কষ্টিপটে নীল ভরা মাদে,
সন্ধ্যায় যখন ফেরে গোধূলির খেতের পাশ দিয়ে
মহিষের দল নিয়ে, কোনো এক আরণ্যক রাত
রক্তে ফেলে ছায়া, তার নিষ্ঠুর মুঠির আকর্ষণে
ঘাঘরা, কাঁচুলি আর ওড়নার বাঁধা টুটে পড়ে ॥

(মূলত দিল্লির দক্ষিণতম প্রান্তে মোষি কলোনি এবং আমার শ্বশুরের কোটলা গ্রাম, সেতুবন্ধের মুখে Terminal Tax-এর তাঁবু পড়েছে। কোটলার একটি মেয়েকে প্রত্যেক সকালে দেখি এবং সেয়ালা মুখটি বাসকাবারে দুধের পয়সা দিতে আসে আর একটি দিবারোটি বন্দির মত ক'রে যায়। ওর ঘাঘরা (উচ্চাংগ অনেকটা আমার) যা অনেকটা মুদ্রির মতন পরা আঁটোসাটো পরিধের কোনোরো সামনে অনুচ্চস্বরে টান ক'রে বাঁধা।)

জোছনার জন্য

শামসুর রহমান

ঐতকাল ছিলাম একা আর ব্যথিত,
অহেতু পশুর অনুভবে ছেঁড়াখোঁড়া।
দুর্গন্ধ-ভরা গুহাহিত রাত নিষ্ফল ক্রোধে দীর্ণ,
দীর্ণ হাহাকার ছাড়া গান ছিল না মনে,
আনি প্রাণে ছিল না সহেস পাতার কানাকানি
—এমনকি মরুভূমির নির্মম তীব্রতাও ছিল না যমুনাতে,
স্বপ্ন ছিল না,
ছিল না স্বপ্নের মতো চরণ।

এই উন্মথিত সময়ের আকাশ চিরে যাবো
—এমন সাহসী ডানা ছিল না আমার।
রাত্রিময় আকাঙ্ক্ষাগুলো বেড়ে ওঠেনি সজীব গাছের ছন্দে,
দমকা বাতাসের আনন্দে নেচে ওঠেনি বুকের ভাষা।
শুধু রুঢ় অনিশ্চয়তায় পাথরে
এত কাল ধ'রে ঝরে গেছে দিনগুলি, রাতগুলি।
মৃত্যুপ্রতিম স্মৃতির সরীসৃপ নিয়ে
আমি বিব্রত, বিপঞ্জনক।

বিশ্বাসের কোনো ঐন্দ্রজালিক তাগা
আলো বিলোয়নি সত্তায়, তবু
উদ্ধারের বাসনায় গ'লে প্রার্থনা হয়েছি কতদিন।

অনিদ্রার বিভীষিকায় তুমি এলে
—অনন্তের একবিন্দু আলো—

বাহুতে উজ্জীবনের শিখা, উষ্ণীষের মুক্তা উন্মীলিত।
হঠাৎ বাতাসের আনন্দে কেঁপে উঠলো বুকের তারা ;
শপথের উৎকণ্ঠা নিয়ে তোমাকে দেখলাম,
রূপালি ঊর্ণাজালের শক্ততা মাখলো
দ্রুত উষ্ণীষ একরাশ চুল।

কে জানতো এই খোলা পথের, শীতের ভোর,
হাওয়ায় হাওয়ায় মর্মরিত গাছ,
ঘাসে-ঢাকা জমি, ছায়া-মাখা শালিক
প্রিয় গানের কলি হয়ে গুঞ্জরিত হবে
ধমনীতে, শেষে মেলবে নানা রঙের মুহূর্ত !
কে জানতো লেখার টেবিলে রাখা বাসি রুটি
আর কলের শুকনো খোসাগুলো
তাকাবে আমার দিকে অপলক
আত্মীয়ের মতো ?

বহুশ্রী

আবুল কাশেম রহিম উল্লীন

নামের দক্ষিণ তটে যে-শব্দের মন্দির বিন্যাস
তোমাকে ঘোষণা করে,
মরণের সমুদ্র কেনার নাচে আলোর মতন,
কিংবা কোনো কৃষ্ণপক্ষ রাতের ওপারে
উষার কুসুমে কাঁপা প্রজাপতি পাখার মতন
যে-শব্দ প্রকাশ করে স্বরূপ তোমার,
তাতে আমি হইনি বিহ্বল !
কারণ তোমাকে চিনি : তোমাকে দেখেছি।
আজকে আমার চোখে তাই,
তোমার অস্তিত্বে ম্লান—ম্লান বুঝি পৃথিবীর সব উপনাম।

শহরের ক্লিন্ন ইন্দ্রলোকে
ছন্দসী নূপুরে আর ইন্দ্রবৃদ্ধ মুদ্রার বিলাসে
অনেক ইন্দ্রের চোখে যে-নেশা ছড়াও,
সে-নেশায় আতুর হয়নি আজো আমার অন্তর !
কারণ তোমাকে চিনি, তারো চেয়ে আরো বেশি
আরো তুমি অনেক সুন্দর !

আমার মানসতীর্থে গানের ছদিনে
কল্পনার মন্বন্তরে তোমার উজ্জ্বল মুখ
ধানের শিষের মতো ভেসে ওঠে সোনার সোনার !
তখন তোমাকে কাছে পাই,
যদিও তখন আমি জমিহারা বঞ্চিত কৃষাণ
চোখের বর্ষাদ্ধ ঘাটে তোমাকে হারাই।

চৈত্রের হাওয়ার মতো যে-কামনা কখনো-কখনো
জীবনের শুকনো ডালে মাথা খুঁড়ে মরে
অথচ ফোটে না ফুলচূড়া,
প্রতীক্ষার পাতা ঝরে, প্রহরের ব্যর্থ দিন
নয় বুকে করে হাহাকার,
তখনো তোমার মুখ স্বপ্ন শুধু ফুল ফোটাবার।
বহ্নিও সবর যাঁরা জীবনের সহস্র খেলায়,
সে-স্বপ্ন দেখার মন
সাপুড়ের বাঁশি যেন ব্যর্থতায় নাগিনী খেলায়!

শহরের এই প্রান্তে
যে-প্রান্তের জীর্ণ বুকে, চোখে মুখে, কাজে ও কথায়
কথা বলে হেরো শ' পঞ্চাশ!
এখানে মৃত্যুর মুখোমুখি
যখন পাথরে পাথরে চকমকি জ্বলে,
মরণের হিংস্র নেশা বাঁচার জিজ্ঞিরে মারে টান,
দীপক রাগের মতো সংঘর্ষের উল্কাঝলা তারে
হাড়ে হাড়ে নেচে ওঠে প্রাণ!—
তখন যে-প্রান্তে শুধু সুসজ্জিত রাজপথ
মনে হয় বাসর-উষ্মুখ,
তোমার দীপল চোখ সে-প্রান্তের আকাশ-জলসায়
শান্ত তীক্ষ্ণ কটাক্ষের ইন্দ্রধনু এঁকে
এ-প্রান্তের কোনো মনে বাঁচার তাগিদ দিয়ে যায়!
আজ তাই তুমিই কল্পনা,
ম'রেও না-মরা এই জীবনের কঠিন সংগ্রামে
পরাজয়ে ক্লান্ত লাজে কবিতায় সৃষ্টির যন্ত্রণা।

সেদিন পথের মোড়ে দিনান্তের লজ্জিত আলোয়
হয়তো কোথাও যাবে ব'লে
তুমি ছিলে অপেক্ষায়, তোমাকে দেখেছি
আসন্ন সন্ধ্যার মুখোমুখি
নীরবে প্রতীক্ষমানা শারদীয়া গোধূলির মতো।
পাশের প্রাসাদে কোনো শ্বেতাঙ্গের যান্ত্রিক খেয়ালে
সেদিন চাওয়ায় ছিল গান :

> অতীত কালের যে-হিল্লোলে, কোণার্ক-পাটনে মুক্ত খোলে
> বাজিত মোর হৃদয়বনে সেদেশের তার টান···

সে-গানের সুরের ছোঁয়ায়
সে-মোড়ের ঘোলা নদী ব্যস্ত ঢেউ চেপে
তোমার কপোলে, চোখে আচমকা ঝলকে দাঁড়ায়।
এরোড্রম আকাশ যেন :
চির যৌবনেরে দিল ডাক—
তখন আরেক রূপে তোমাকে দেখলাম
তুমি যেন পঁচিশে বৈশাখ।

তারপর চ'লে গেলে তুমি
মুছে দিয়ে সেদিনের সে-মোড়ের সব আয়োজন।
আমার হৃদয়ে, চোখে সহসা ঘনায় :
সিক্ত যুথীর গন্ধবেদনে সে কোন
ব্যর্থ রাত্রি বাইশে শ্রাবণ।

পৌষ ১৩৬২

তবু আশা জাগে মনে, আশা জাগে আমারই এ-দেহে
তপস্যার লুপ্ত কণা রূপ নিয়ে সূর্যের মতন
ব্যর্থতার রাত্রি ছিঁড়ে আকাশে উদয় হবে,—
হয়তো সেদিনও তুমি স'রে যাবে
স'রে যায় সূর্যালোকে শুকতারা যেমন।
তবুও তো ফিরে-ফিরে আসবেই সে-পথের মোড়ে
অনেক শারদ স্মৃতি, গোধূলিতে তুমি আর
মুক্তির আকাশে সেই গান :

অগাধ কালের যে-হিল্লোলে, জোয়ার-ভাটায় ডুবল যেলে
বাড়িয়ে যোর রক্তধারেই দেখেছে হায় টান।···

আকাশ-পিপাসা

সুধীন্দ্রনাথ দেব

তোমাকে জেনেছি যত
তেমন কি আর কেউ জানে :
দূরের আকাশে
তোমার চোখের নীল
স্বপ্ন বোনে নতুন তারায়
এখানে নতুন স্বপ্ন দেখি—
দূরের আকাশ হয় কাছের আকাশ ;
তোমার চোখের নীলে
জেগে ওঠে লক্ষ তারা
লক্ষ সূর্য চোখের গভীরে।

তুমি যদি কাছে থাকো
মিটে যায় আকাশ-পিপাসা
ক্লান্ত পাখিদের মতো
নীড়ের কথোক ছায়াতলে—
চোখ রেখে চোখের আকাশে
আমিও ঘুমোতে চাই।
ক্লান্তি-শেষে
বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে
আমিও উঠব জেগে
তোমাকে জাগাবো।

হে সুমিতা, বলো দেখি—
আকাশে মাটিতে আর ঘাসে আর নীলে
নতুন দিগন্ত রেখা
দেখা যায় নাকি।

একটি মুহূর্তের উক্তি

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আমার নির্ভর তুমি। যতই হোক না বিড়ম্বনা,
প্রাণের সেতারে আজো জেগে ওঠে নিভৃত ঝংকার;
যদিও কাঞ্চনমূল্যে এ-সুরের যাচাই যন্ত্রণা:
আমার সত্তায় তুমি ভঙ্গুলস শুধু অলংকার।
বাহিরে বিমর্ষ বেগ, আড়চোখে অনেকে তাকায়,
কেউ আসে একরোখা, কেউ যাবে ভ্রান্ত, শক্তিহীন;
কোটাও তুমিই ফুল বিস্মরিত প্রাণবৃত্তিকার,
আমার সমগ্র ইচ্ছা একমাত্র তোমার অধীন।

পার্থিব উচ্ছ্বাসে পিষ্ট ধরাবার ব্যর্থ ভয়রথ,
আমার ললাটে নেই শকুনির পাশার সান্ত্বনা;
আত্মবিক্রয়ের মূল্যে স্বর্গলাভ আমাকে সাজে না,
অন্তত তোমারি কাছে এ আমার অন্তরের শপথ।

স্বার্থের সন্ধানে ত্রস্ত চামচিকে ছুঁচো ইঁদুরেরা,
আঁধারে তাদের লীলা, জ্যোৎস্নায় আমার মোরাকেবা।

প্রস্তাব

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

জেনো বুনোশখ যজ্ঞ, প্রকৃতির কুটিল নিয়োগ।
যাবে? দেখো, বিপজ্জনক রাস্তা: অতর্কে চোলো না:
বিষাল কোরো না গাছে, বুনো ফলে বিষাক্ত ছলনা;
ঝোপে ঝাপা দস্যুর গোপন তীর, চোখে ক্ষিপ্র চোখ
শিকারী পশুই; হলুদ পাতার নিচে গূঢ় খাদ;
উত্তাল ধাঁচালো হাতি জাল তাকে; সাবধান। পাইথন
গাছের গুঁড়ির মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে—মস্ত বন
ভয়ের জনক, অন্ধ, মৌন মৃত্যু, সর্বনাশী প্রমাদ।

যেয়ো না। বরং চলো গেঁয়ো লোক আদের রাস্তায়,
বুলো মাখো গায়ে-গায়ে, খাটো; লাল গামছা মাথায়
হাটে বেচো ক্ষেতের সস্তার শাক, দু-পয়সা কামাও;
বিকেলে শাখত তাড়কুট, কিংবা আর্দ্র যুবতীর
আস্থা চাখো ঘাটের চাতালে; কিন্তু যদি মন স্থির,
চলো লাল বাবার আশ্রমে, মন, সোনবাল খাবাও॥

দিশারী

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

'তাতে আমি দৃষ্টি দেবো, হোক না সে সবার দিশারী—'
ব'লে, তার অন্যমুহূর্তে তীক্ষ্ণ শর ছুড়ে দিলো নারী।
আকাশ সন্ত্রস্ত, চান, বিবর্ণ বাতাস ;
দিগন্তরা লাজ ভুঁড়ে গতি দেয় ছুটন্ত উল্কায়।

বিস্ময়-চকিত আমি স্মিতমুখে সেদিকে চাই,
লজ্জায় লাবণ্যে দেখি আঁকা তার গণ্ড-শোণিমায়।

বলি, 'সৌন্দর্যের বীণ—শিল্পীর বিচিত্র পটভূমি—
আগুন-শিখায় জ্বলো ; দৃষ্টি নয়, শোণিতে তরঙ্গ আনো তুমি।
আমি সে-তরঙ্গ ভেঙে আরো দূর শূন্য সমুদ্রের
সাড়া পাই, ছুটে যেতে চাই, জেনো, নক্ষত্রের দীপ্ত গতিপথে।'

কবিতা
বর্ষ ২০, সংখ্যা ২

হংসপাদিকা

শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্য

শলাতক মুহূর্তের ছবি নিয়ে এসেছে হঠাৎ
এই বন্দী-শিবির সকাল
পাতায় পাতায় আলো ছায়া নীল মায়া রৌদ্রজাল
তন্দ্রায় তন্ময় ফুলে লুটিয়েছে দিগন্তের ঘুম,
ম্লান সাড়া : একপিঠ খোলা চুলে আঁকাবাঁকা পড়েছে রোদ্দুর।

কোলা-বুক শাদা-শাদা হাঁসের মতন
কোলে তার পাতা-খোলা বই—
উতল শকুন্তলা,
নীল সকালের ব্রহ্ম অন্তর অথৈ।

অমিয় চক্রবর্তীর পালা-বদল

সমকালীন বাংলাদেশের সবচেয়ে আধ্যাত্মিক কবি অমিয় চক্রবর্তী। অবশ্য কবিতামাত্রেই মানুষের আত্মা থেকে উদ্ভূত, আর সেই হিশেবে প্রত্যেক কবিরই ঐ বিশেষণটিতে অধিকার আছে ; কিন্তু আমি এখানে একটি বিশেষ অর্থে 'আধ্যাত্মিক' কথাটা প্রয়োগ করতে চাই। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় একটি আশ্চর্য বৈদেহিকতা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে, রক্তমাংসের আক্রমণ সেখানে সবচেয়ে কম : ইন্দ্রিয়চেতনায় কবি জীবনানন্দর সঙ্গে তাঁর বৈশদৃশ্য যেমন বেরুপ্রমাণ, তেমনি সুধীন্দ্রনাথের বস্তুরক্তিম মানসও তাঁর সুদূরবর্তী। তাঁর যে-কবিতাটি প্রথম সাড়া তুলেছিলো সেটি মনে করা যাক : 'সংগতি', কোড়ো হাওয়া আর সোড়ো বাড়িটার মিলন-সংগীত ; এই সংগতি তাঁর সকল কাব্যের মূলসূত্র। এই 'হাঁ'-য়ের দেশ থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিলো, যেখানে আমরা কেউ-কেউ দীর্ঘ ভ্রমণেও ঠিকমতো পৌঁছতে পারিনি, কিংবা স্পর্শ ক'রে থাকলেও টিকে থাকতে পারিনি যেখানে। এটাই তাঁর রচনার প্রেরণা এবং অন্তঃসার : অভাব, প্রশ্ন, তর্ক, বোঝা-ভাঙা শহর, বাংলার দারিদ্র্য, মার্কিন সভ্যতা, প্রেমিকার বিদ্বেষ,—এই সব কণ্টকময় জটিলতা একটি স্থির 'হাঁ'-ধর্মের অন্তর্গত হ'য়ে আছে ; রক্তবীজের মতো 'না'-য়ের গোষ্ঠি গজিয়ে উঠলেও তারা এক আরো বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে সুসমভাবে, বিনীতভাবে অবস্থান লাভ করছে, কোনো দুর্জয় বিরোধের জন্ম দিতে পারছে না। একদিকে তাঁর স্বভাবের আপাতিক বহির্মুখিতা, অন্যদিকে তাঁর আত্মার নৈষ্টিকতা—এই দুটি কারণে, অন্যান্য বিষয়ে যতই গরমিল থাক, তাঁর সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য ধরা পড়ে সমসাময়িকদের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণু দে-র। অবশ্য এই সাদৃশ্য অতিশয় সুকুমার, কোনোরকম সূক্ষ্ম বিচার তার সহ্য হবে না ; যেমন দু-জন অনাত্মীয় বা ভিন্নদেশী মানুষের চেহারায় দৈবাৎ মিল দেখা যায়, কিন্তু নড়াচড়া বা গলার আওয়াজেই ভুল ভাঙতে দেরি হয় না। অমিয় চক্রবর্তীর 'মতো' আর একজন বাঙালি কবিকে যদি খুঁজে বের করতে হয়, তাহ'লে আর একটু দূর কালে তাকাতে হবে আমাদের ; কলাকৌশলের নূতনত্ব, ভাষার

চমকপ্রদ ভঙ্গিমা, এইসব আবরণ ভেদ ক'রে তাঁর রচনার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'তে পারলে আমরা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করি যে তিনি আর রবীন্দ্রনাথ একই জগতের অধিবাসী, যে-জগৎ অন্যান্য সমকালীন কবিদের পক্ষে অপ্রাপণীয়। অমিয় চক্রবর্তীর আধ্যাত্মিকতার বিশেষ লক্ষণ এই যে তা কোথাও-কোথাও মিস্টিসিজম-এর প্রান্তে এসে পৌঁছয়; বিশেষত তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা অনেক সময় সেই অতি সূক্ষ্ম সীমারেখায় বেপথুমান, যাকে অনুভব করার জন্য প্রায় একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়।

২

যদিও 'সংগতি' প্রায় পঁচিশ বছর আগে ছাপা হয়েছিলো, তবু 'খসড়া' ও 'এক মুঠো' নামক প্রথম বই দুটিতে তাঁকে আমরা অন্য ভাবে পেয়েছিলাম। 'এঁর মন উজ্জ্বল ও সজীব, ইনি বহু ভ্রমণ করেছেন, চলতি পথের বৈদেশিক ছবি তীক্ষ্ণ তুলিতে তুলে ধরতে ইনি ওস্তাদ—' তখনকার কোনো পাঠক এই রকম বললে খুব ভুল হ'তো না। ব্যতিক্রম ছিলো না তা নয়, কিন্তু মোটের উপর সিনেমা-চকল চিত্রাবলীর জন্যই তাঁর প্রথম পর্যায় স্মরণীয়; এমনকি, ভৌগোলিক আবেদনের দিক থেকে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের বর্ষাপ্রধান কবিতার সঙ্গেও তার তুলনা হ'তে পারতো। যতদূর মনে পড়ে, 'অভিজ্ঞানবসন্তে' পরিবর্তনের আভাস দেখা দিয়েছিলো; 'দূরযানী'র প্রথম কবিতা, 'হারানো ছড়ানো পাগল'ও তাঁর তৎকালীন ভঙ্গির মধ্যে ব্যতিক্রম। কিন্তু এই পরিবর্তন কত দূরস্পর্শী এবং কতখানি আন্তরিক পরিণতির ফল, তা আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারিনি, যতদিন না 'পারাপার' এবং তারপর 'পালা-বদল' প্রকাশিত হ'লো। 'পারাপারে'র কবিতাবলী অন্তত দশ বছর ভ'রে লেখা; তার পটভূমিতে আছে বাংলা, ভারত, ইওরোপ ও আমেরিকা; তার বিচিত্র সম্পদের মধ্যে কবির মনের অনেকগুলো স্তর পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। 'পালা-বদল' এক সুরে বাঁধা, কবিতাগুলো যেন একই প্রেরণা থেকে উৎসারিত, বোধহয় সেইজন্যেই এর এই অর্থবহ নামকরণ। কিন্তু আমরা জানি যে

পালা-বদল আগেই ঘ'টে গেছে ; এবং তার প্রকৃতি বোঝার জন্য এই সাম্প্রতিক গ্রন্থ দুটি একই সঙ্গে পড়া দরকার। 'পড়া দরকার' ব'লেই থামতে পারি না ; পড়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধও জানাই, কেননা অমিয় চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক কবিতা বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান ঘটনা ব'লে আমি মনে করি।

তাঁর কবিতার যে-সব লক্ষণে প্রথমে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলাম সেগুলো একেবারে ক'মে যায়নি—তা যেতেও পারে না—কিন্তু তার সঙ্গে নতুন কিছু যুক্ত হয়েছে। এখনো পাওয়া যায় অতি নিপুণ বর্ণনা ('দাড়ী বার্বারা'), একটি মুহূর্তের মধ্যে অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন তথ্যের তোড়া বাঁধা ('বিধুবাবুর মত', '১৬০৪ ইনিতাসিটি ড্রাইভ'), এবং, মাঝে-মাঝেই, পৃথিবীর প্রতি, বিশ্বজীবনের প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রজ্ঞাপন। এ-সব কবিতার প্রতি আমার প্রীতি ক্লান্তি-হীন, কিন্তু আমি এখানে বিশেষ ক'রে সেই কবিতাবলীর উল্লেখ করতে চাই, যেখানে দেখা দিয়েছে বর্ণনার বদলে মনস্ক্রিয়া, আর যেখানে 'পৃথিবীকে ভালোবাসি' এই কথাটা মুখের কথায় বলবার আর প্রয়োজন হয় না। এ-ই তাঁর নূতন সংযোজন—সম্প্রসারণ নয়—এমন একটি কাজ যা তিনি আগে করেননি। যে-বিষয়ে বলছেন, যার 'বর্ণনা' করা হচ্ছে ; আমরা বুঝতে পারি তার সাহায্যে তিনি অন্য কিছু বলতে চাচ্ছেন, (হয়তো কখনো-কখনো কথাটা ঠিক ধরতেও পারি না, কিন্তু মনীষার কৌতূহল জেগে ওঠে)—সেইজন্য ব্যবহৃত ছবিগুলো শুধু ছবি আর থাকে না, হ'য়ে ওঠে চিত্রকল্প, কোথাও বা প্রতীক। এর সুন্দর উদাহরণ 'বৈদান্তিক', 'বিনিময়', 'ওক্লাহোমা', 'লিরিক' ('পারাপার'), 'পালা-বদলে'র 'অ্যান আর্বার', 'ছবি', 'অস্তাচলে'। বেছে-বেছে কয়েকটি ছোটো কবিতা উল্লেখ করলাম, দশ থেকে ছ'ড়ি লাইনের মধ্যে প্রথিত, খাঁটি লিরিকধর্মী। শুধু তা-ই নয়, 'বৈদান্তিক' বাদ দিয়ে এর প্রত্যেকটি প্রেমের কবিতা। প্রেমের কবিতার লেখক হিশেবে অমিয় চক্রবর্তীকে আমরা ভাবিনি এতদিন, ভাববার বেশি কারণও তিনি দেননি। অবশ্য তাঁর 'বৃষ্টি' ('কেঁদেও পাবে না তারে ঝর্ণার অজস্র জলধারে'), 'চিরদিন' ('আমি যেন বলি আর তুমি যেন শোনো')

—এ-সব রচনার নির্মল হার্দ্যগুণের সঙ্গে আমরা পূর্বেই পরিচিত হয়েছিলাম, কিন্তু উল্লিখিত কবিতাবলীর মধ্যে নূতন একটি বেদনা প্রবেশ করেছে ; 'সেদিন রাত্রে যখন আমার মৃদু যৌবনকে ঘা মারাই'-এর মতো শুভ্র বেদনা নয়, তার শান্তির পিছনে রক্তের রং ঝিলিক দেয় যেন, যেমন দিয়েছিলো—অবশেষে—রবীন্দ্রনাথের 'শুভলগ্নে একদিন' কবিতায়। পূর্বে বলেছি তাঁর রচনায় রক্তমাংসের আক্রমণ সবচেয়ে কম—এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও 'পবিত্র' তাঁর রচনা : আলোচ্য কবিতাবলীতেও ভালোবাসার দৈহিক উপাদানের নামগন্ধ নেই ; আরো বেশি : তাদের আসল অভিপ্রায়টাকেই একটা আবছা আস্তরণে লুকিয়ে রাখা হয়েছে : ব্যাপারটা কী, এবং কতখানি, তা পাঠককেই অনুমান ক'রে নিতে হয় ব'লে অলঙ্কারের কাছে এদের সংবাদ পৌঁছবে না। স্পষ্টত, দৈহিক সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তী দুর্বারভাবে পরাঙ্মুখ ; বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র, যাঁর রচনায় নারী তার শরীর নিয়ে কখনোই প্রবেশ করেনি : অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপসর্গশূন্য কোনো নায়িকাকে একটিবারও দেখা যায়নি সেখানে ; দেহটাকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে তিনি শুধু ভাবটিকে রেখেছেন, কখনো-কখনো নামও দিয়েছেন তাকে—কিন্তু সে-সব নামও এক রকমের ছদ্মবেশ, যেমন কিনা এই রচনাগুলিও ছদ্মবেশী প্রেমের কবিতা। এই বয়সের আরো কিছু কবিতা আমার মনে পড়ছে : 'পারাপারে' 'পরিচয়' (এই দুয়ের সাঁকো, পাথরে বাঁধানো কলধ্বনি), 'শ্রীমান শ্রীমতী' (দুজনায় যেতে ঐ নীল সিন্ধু-পাখি-ওড়া তীরে) ; 'পালা-বদলে' 'মিলন দিগন্ত' (তাড়াতাড়ি ফিরে আসা দুজনের বেদনা বাতাসে) 'দুই ঘর' ("কেন দু-জনায় তবু ধরণীতে বন্ধ অন্তরাল ?")—এই সম্পূর্ণ গুচ্ছটিকে আলাদা ক'রে নিয়ে মন দিয়ে পড়লে মানতেই হয় যে বাংলা ভাষার প্রেমের কবিতায় একটি বিশিষ্ট স্থান অমিয় চক্রবর্তীর প্রাপ্য। দেহের প্রসঙ্গে নির্মমভাবে মৌন থেকেও তাঁর বেদনায়—এমনকি তাঁর বাসনায়—কোনো-কোনো রচনা রঙিন হ'য়ে উঠেছে : যার উল্লেখমাত্র নেই তাকেও আমরা অনুভব করতে পারি ; এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া বাংলা ভাষায় আর কোনো রচনা আমি

জানি না, যেখানে প্রায় কিছুই না-ব'লে অনেক কথা এমনভাবে বলা হ'য়ে গেছে। এবং, রবীন্দ্রনাথের গানের মতোই, তাঁর এ-সব রচনায় এক রকমের প্রত্যয়ক সরলতা বিদ্যমান—আপাতত সহজ, বিশ্রান্ত, ঈষৎ এলোমেলো, ঈষৎ বিমোনো গোছের তাঁর লেখা ; যার ফলে, রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন হয়, কথাটা আমরা অনেক সময় ধরতে পারি না, কিন্তু উপলব্ধির শুভক্ষণে বিগুণ আনন্দ পাই। ভিতরে যে-টান পড়েছে, অবয়বের মধ্যে তা সব সময় থাকে না ব'লেই তাঁর কবিতা বহুবার পঠনসাপেক্ষ।

যদি আমরা বলি যে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের জগতের উত্তরাধিকারী, যদি মনোভঙ্গিতে ও রচনাপদ্ধতিতেও এ-দু'জনে মিল খুঁজে পাই, তাহ'লে এই প্রশ্নটা বাকি থেকে যায় যে তিনি কোন অর্থে আধুনিক, কিংবা তিনি কী এনেছেন যা রবীন্দ্রনাথে নেই। এ-প্রশ্নের উত্তরে আমি প্রথমে বলবো যে রবীন্দ্রনাথও তাঁর শেষ পর্যায়ে আধুনিক কবি ; দ্বিতীয়ত, এ-দু'জনের জগৎ মূলত এক হ'লেও উপাদানে ও বিন্যাসে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রধান কথাটা এই যে রবীন্দ্রনাথের স্থিতিবোধ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে স্থায়িত্বের ভাব অমিয় চক্রবর্তীতে নেই—কোনো আধুনিক কবিতেই তা সম্ভব নয়। শান্তিনিকেতন, হ্যাম্পস্টেড, উয়াসঙ্গায়া পল্যানা : এক-একটি সুদৃঢ় আলোকের উৎস, বলতে গেলে সারা জগতের দৃষ্টি যেখানে বিন্যস্ত—যে-পৃথিবীতে ও-রকম স্থায়ির সম্ভব ছিলো সেই পৃথিবী তর্জাতীতভাবে ভেঙে গেছে : আজকের কবি টি. এস. এলিয়ট যাসেল ফোয়ারের ব্যবসায়ী এবং স্বদেশত্যাগী, যিনকে নিরন্তর স্থানান্তরিত ও দূরান্তরিত ; এমনকি জর্মন কুলীন টমাস মানকে একাধিকবার আটলান্টিক পারাপার করতে হয়। বাসা ভেঙে গেছে মানুষের ; বুদ্ধিজীবী মাত্রেই উদ্বাস্তু ; 'বাড়ি' নামক ব্যাপারটা একটা আইনঘটিত কল্পনায় পরিণত হয়েছে—এমনকি, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে 'স্ত্রীপুরুষ' জিনিশটাও তা-ই। এই পরিবর্তিত এবং পরিবর্তমান পৃথিবী বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তী প্রতীক্ষাভাবে সচেতন ; তাঁর কবিতায় পটভূমিকা চার মহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে ; তাঁর রচনার মধ্যে যে-মানুষটিকে আমরা দেখতে পাই সে অনবরত ঘুরে বেড়ায় এবং বাসা-বদল

করে, অস্থিরতার মধ্যেই অন্তর্গততম গভীরের দিকে চোখে তুলে রাখে। ট্রেনে, প্লেনে, জাহাজে, অবিরল পথিকবৃত্তির ফাঁকে-ফাঁকে উদ্ভিত হ'য়ে উঠেছে এই রচনাগুলি; কখনো ক্যানসসে, কখনো ব্রিজটনে, কখনো বস্টনে বা আবিজোনায়, যার-যার যে-'বাসা' বা 'বাড়ি'র খবর পাওয়া যায়, তারা ঐকান্তিক ব'লেই উল্লেখযোগ্য। এই জরুরতাবোধ রবীন্দ্রনাথে ছিলো না, বাংলা ছাড়া অন্য কোনো দেশ তাঁর প্রকৃত অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করেনি, তাঁর চেনা জগৎ যে হারিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারলেও কাব্যের মধ্যে তা স্বীকার ক'রে নেয়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। এই স্বীকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী—শুধু দীর্ঘকাল প্রবাসে আছেন ব'লে নয়, স্বভাবেরই প্রেরণায়; রবীন্দ্রনাথে যে-পানাইয়ের সুর কলকাতার গলির অসংগতিকে মিলিয়ে দিয়েছিলো, তাকে তিনি প্রয়োগ করেছেন আমাদের সমকালীন পরিচিত পৃথিবীর বিবিধ, বিচ্ছিন্ন, পরস্পর-বিরোধী তথ্যের উপর; যে-পরিবেশের মধ্যে আমরা প্রতিদিন বেঁচে আছি এবং যুদ্ধ করছি, তাঁর মিলন-মন্ত্র একেবারে তার কেন্দ্র থেকে উত্থিত হচ্ছে। এই উপাদানের আহরণ ও বৈচিত্র্য তাঁকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে; রবীন্দ্রনাথের কাছে যা পেয়েছেন তার ব্যবহারের ক্ষেত্র আলাদা ব'লে তাঁর কবিতার রস-বস্তুও স্বতন্ত্র; তাঁর কাছে আমরা যা পাই, রবীন্দ্রনাথ তা দিতে পারেন না।

৩

হৃদয়েশী প্রেমের কবিতার দু-একটি উদাহরণ উপস্থিত না-করলে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হবে না। 'বিনিময়' কবিতার প্রথম স্তবক:

তার বদলে পেলে—
সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর
নীল বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর
আলোয় ভরা জল—

ফুলে বোঝাবোনা ছায়া ডালটা
বেগনি মেঘের ওড়া পালটা
তরল হৃদয়তল—
একলা বুকে সবই মেলে ॥

তার বদলে—তার বদলে? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই এই কবিতার চাবি লুকোনো। ইংরেজীতে ভাষা হ'লে সর্বনামের লিঙ্গ দ্বারাই সেটা ধরা পড়তো, বাংলায় হয়তো বুঝতে একটু দেরি হয় যে 'সে' মানে কোনো অন্তর্হিতা প্রণয়িনী। তারপর, এটা বোঝামাত্র, সমগ্র কবিতাটির অভিঘাত প্রবল হ'য়ে ওঠে, 'একলা বুকে সবই মেলে'র মধ্যে হাহাকার শুনতে পাওয়া যায়। তেমনি, 'ওক্লাহোমা' কবিতায়—

সাক্ষাৎ সন্ধান এই পেয়েছ কি অটে ২৪-এ?
বিকেলের উইলো-বনে রেড-অ্যাপো ট্রেনের হুইসিল
শব্দশেষ ছুঁচে গাঁথে দূর সুস্থে দ্রুত ধোঁয়া নীল;
মার্কিন জাহার বুকে কোড়ো অবসান গেল মিশে ॥
অবসান গেল মিশে ॥

এখানো কোনো অস্পষ্ট 'সে'-র উল্লেখও নেই, কিন্তু এই তিন স্তবকের প্রতিধ্বনিত কবিতাটিতে চলতি ট্রেনের বিচ্ছেদের বাতাস এমন জোরে ব'য়ে চলেছে যে আমাদের মনে দুর্বারভাবে জেগে ওঠে কোনো বিদায়ের দৃশ্য—ট্রেন ছাড়বার আগে যা ঘটেছিলো তা অব্যক্ত থেকেও কবিতার পরতে-পরতে বিরাজ করছে। এই বিচ্ছেদের বেদনাই বার-বার অনুভব করা যাচ্ছে অন্যান্য কবিতায়:

পৃথিবীতে লয় ছিল এই মিলনের ঘর
এসেওছিলেম দুজনে—তারপর? ('লিরিক'—পারাপার)

যেখানে রওনা শুরু তার থেকে ঘড়ি বলে, শুধু
মিনিট খানিকও নয়: দাঁড়িয়েছি একাকিনী তবু
বসেছি পায়ের কাছে ॥ ('অ্যান আর্বার'—পালা-বদল)

চলো, কার্মেলিতা, চলো আমার তোমার নিজ দেশে।
এখানে আসবে কাছে যন্ত্র-চলনের বেগে
কারা ঢেউ যোজন যোজন পার হবে,……
এ আসা তো আসা নয়, হঠাৎ যদি বা এই ভিড়ে
বুকের শহর ছিঁড়ে
শোনো চেনা কণ্ঠ, দেখ চেনা চোখ তবে
মুহূর্তে মূর্ছায় সব শেষ হবে।—……
দুই জন্ম দুই থাক, মধ্যে সাঁকো পারাপার,
কার্মেলিতা, দেখ এল প্রেম পারাবার। ('পরিচয়'—পারাপার)

আর তারপর 'পালা-বদলে'র 'রাত্রি' কবিতায় 'হঠাৎ যখন শুভ্র বিছানায় পড়ে জ্যোৎস্না, দেখি তুমি নেই'—আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় 'লিপিকা'র 'পরির পরিচয়', এবং বুঝিয়ে দেয় ভারতীয় মন আবহমানকাল যে-বিরহের গান গেয়েছে, তার ধারা সমকালীন বাঙালি কাব্যে ছিন্ন হ'য়ে যায়নি। সুখের সঙ্গে মনে প'ড়ে যায়, অন্য প্রত্যেকটি বিষয়ে যতই ভিন্নধর্মী হোক, 'অর্কেস্ট্রা'ও বিরহের ভাষ্য, 'মনলতা সেন'ও তা-ই। রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ণতা', সুধীন্দ্রনাথের 'রাম', জীবনানন্দর 'আকাশলীনা', অমিয় চক্রবর্তীর 'বিনিময়'—এই সব আপাত-বিসদৃশ কবিতার মধ্যে যৌলিক সম্বন্ধ দেখিয়ে কোনো মনোজ্ঞ আলোচনা কেউ একদিন লিখবেন আশা করি।

৪

আমার পরিসর বেশি নেই, এই আলোচনা কোনো অর্থেই সর্বাঙ্গীণ হবে না, তবু অন্য দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে অপরিহার্য। একটু পিছনে স'রে যাওয়া যাক, সেই যখন 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় 'মাটির দেয়াল' বেরিয়েছিলো। সেই সময়ে ঐ পুস্তিকা যাঁরা পড়েছিলেন, তাঁদের চমক লেগেছিলো অমিয় চক্রবর্তীর অন্য একটি কল্পনায়—যাকে, অন্য নামের অভাবে, অগত্যা হাস্যরস বলতে বাধ্য হচ্ছি। বেদনামিশ্রিত হাসি—ব্যঙ্গ নয়,

অভিযোগবর্জিত—নিজের অবস্থাটাকে মেনে নেবার মতো সুস্থিত প্রসাদগুণ, অথচ নিজেকে অন্য কেউ ব'লে জানবার মতোও বুদ্ধি—এই রকম ভাবসন্নিপাতে তৈরি হয়েছিলো 'বিধুবাবুর মত', ('মতো' নয়) 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন', 'বাদুলি' (মন যে আমার মন কোন সাধনার ধন হাতের বাঁশি'), 'শব' ('চমকিয়ে ওঠে কবিতায় ভাঁটাশুদ্ধ রাঙা পালং শাক')—হালকা কবিতা, কিন্তু অর্থের দিক থেকে হালকা নয়। এর সবগুলো রচনা 'পারাপারে' দেখতে না-পেয়ে নিরাশ হয়েছি, কিন্তু তার ক্ষতিপূরণও পেয়েছি সম্ভবত একই সময়ে লেখা 'সাবেকি' কবিতায়—

গেল
গুরুচরণ কামার, দোকানটা তার আমার,
হাতুড়ি আর হাপর যাবের (জানা ছিল আমার)
দেহটা নিজস্ব।
রাম নাম সত্ হ্যায়
গৌড় বসাকের প'ড়ে রইল ভাঙা খেত খামার।
রাম নাম সত্ হ্যায়।.....
আমরা কাজে রই নিযুক্ত, কেউ কেরানি কেউ অভুক্ত,
লাঙল চালাই কলম ঠেলি, যখন তখন শুনে ফেলি
রাম নাম সত্ হ্যায়
শুনব না আর যখন জানে যাবে তবু এই এখানে
রাম নাম সত্ হ্যায়।

একটি চির-পুরোনো বিষয় লৌকিক ছন্দের দোলাতে নিটোলভাবে নতুন হ'য়ে উঠলো; আরম্ভে 'গেল' কথাটার রেশ-টেনে-চলা আঘাত থেকে শেষ পর্যন্ত মজার তরঙ্গপুর—যদিও বিষয়টা একেবারেই 'মজার' নয়। এত বড়ো দুঃখের কথায় এতখানি কৌতুক যিনি আমদানি করতে পেরেছেন তাঁকে হাস্য-রসিকের চেয়ে বড়ো অর্থেই রসিক বলতে হয়। এই হাসিরই আভাস পাওয়া যায় 'শালা-বদলে'র প্রথম কবিতায় 'হে প্রভু ঈশ্বরমহাশয়' সম্বোধনে।

যদিও 'পারাপার' ও 'শালা-বদল' একসঙ্গে পঠনীয়, এবং দুয়ের মধ্যে সঙ্গতি সুস্পষ্ট, তবু 'শালা-বদলে' কবি আরো অগ্রসর হয়েছেন; প্রথমটিতে

যে-নূতনত্ব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে দ্বিতীয়টিতে তার সংহত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এবং 'পালা-বদলে' কয়েকটি নূতনতর ধরনও স্থান পেয়েছে: কলাকৌশলে চমকপ্রদ 'অপঘাত' (রবীন্দ্রনাথের 'কিনল্যাণ্ড ধ্বংস হ'লো'সোভিয়েট যোদ্ধার বর্ণনে'র সঙ্গে যেন সচেতন প্রতিযোগিতা ক'রে লেখা); গভীর চিন্তায় ভরা 'সঙ্গ' নামক কবিতা—যাঁরা মনের সম্পদ সৃষ্টি ক'রে থাকেন তাঁরা নিজ-নিজ নির্জনতার মধ্যেও কেমন ক'রে পরস্পরের সঙ্গ লাভ করেন তারই কাহিনী, এবং 'ইতিহাস' নামক উৎকৃষ্ট এবং একাধিক অর্থে আমেরিকান কবিতার বিষয়। আমেরিকার একটি গ্রাম কী ক'রে শহরে রূপান্তরিত হ'লো, দু-পৃষ্ঠার মধ্যে তারই ইতিহাস। বাঁধা ছন্দে লেখা, কিন্তু গদ্যের মতো পড়া যায়। শুধু বিষয়টাই মার্কিন নয়, রচনার রীতিটাও কোনো উৎকৃষ্ট মার্কিন কবির অনুরূপ—কোথাও-কোথাও রবার্ট ফ্রস্টকে মনে পড়ে। কবিতার মধ্যে যে-ঘটনাটা ঘটলো তার জন্য কোনো অভিযোগ বা আক্ষেপ নেই; লেখক একটিও মন্তব্য করেননি; শুধু একটি পরিষ্কার বিবরণ দিয়ে গেছেন। ঠিক এই জাতের কবিতা অমিয় চক্রবর্তী আগে আর লেখেননি, বাংলা ভাষায় আর কেউ লিখেছেন ব'লেও আমার মনে পড়ছে না। এই ধরনটি তাঁর পরবর্তী রচনার মধ্যে যদি ফিরে আসতে থাকে, তাহ'লে আমরা বলতে পারবো যে বাংলা কবিতার জন্য নতুন একটি প্রদেশ তিনি জয় করলেন।

৫

তাঁর ভাষাব্যবহার প্রথম থেকেই অভিনব ও চিত্তহারী; কিন্তু সম্প্রতি তার কোনো-কোনো অংশ বিষয়ে আমার মনে সন্দিগ্ধ প্রশ্ন জাগছে। 'পারাপার' ও 'পালা-বদলে' দেখা যাচ্ছে শুধু প্রত্যয়ের পৌনঃপুনিক ব্যবহার, ইন্ ভাগান্ত শব্দের প্রতি হয়তো বা একটু অহেতুক আকর্ষণ, এবং বিশেষ্য থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ থেকে বিশেষণ রচনা করবার প্রবণতা। 'উত্তমতা' 'সহজতা' 'সংসারতা', 'আসলতা', 'আপনতা': এদের বিষয়ে প্রথম কথা এই যে

বাংলায়, বিশেষত বাংলা কবিতায়, বিশেষণটাই বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হবার শক্তি রাখে ; দ্বিতীয়ত, শেষক শব্দে তল্ প্রত্যয় দুর্লভ্য নয়, এবং তৃতীয়ত, 'সংসারতা' বলতে যা বোঝায় তা 'সংসার'-এর মধ্যেই নিহিত আছে, মূল শব্দটাকে যথাযোগ্যভাবে খাটিয়ে নিলেই 'তা' আগমের প্রয়োজন হয় না। অন্য কোনো দিক থেকে এগুলোকে যদি বা সমর্থন করা যায়, 'পুণ্যতা', 'জীবনতা' বা 'সংসর্গতা'র সপক্ষে কী যুক্তি দাঁড়াতে পারে আমি তা ভেবে পাই না। প্রচলিত অর্থে যা ব্যাকরণদুষ্ট তাকে তখনই শুধু মেনে নেয়া যায় যখন তার দ্বারা কবিতার কোনো বিশেষ লাভ হচ্ছে, কিন্তু যখন তার ফলে সংবাদে বিভ্রান্তি আসে (যেমন এসেছিলো বিষ্ণু দে-র 'আহা যদি আজ পুষ্পকে হানো অরিবাণ'-এ) কিংবা তা কোনোভাবেই কাজে লাগে না, তখন বোঝা যায় এলিয়ট কেন বলেছিলেন কবিতারও গদ্যের মতো সুলিখিত হওয়া দরকার। 'দূরের সরণী বয় পণ্যতায় আকাবাঁকা ব্যস্ত ঘাসের মধ্যে'— এখানে 'পণ্যতা'কে সমগ্রভাবে 'merchandise' অর্থে গ্রহণ যেতে পারে, কিন্তু 'ভূমিহীন জীবনতা তাতে রাঙা হয়ে খেলা মাখে', 'সব তার সংসর্গতা অনাদি আদিম নীলালোকে', 'বন্ধুর আহ্বান নৃত্যে চোখের তন্ময় ন্যালতায়' কিংবা 'বাগানে ফুলের গাছে আমাদের নতুন সংসারে দিলেন পুণ্যতা তীর্থ' —এই পংক্তিগুলির মধ্যে এমন কোনো দাবি নেই যা 'জীবন', 'সংসর্গ', 'ন্যান' আর 'পুণ্য' দিয়ে মেটানো সম্ভব হয় না। 'যৌবনী জনতা', 'চন্দনী যুগ', 'শিয়রে তন্ময়ী গুরু' ; যথাক্রমে 'যৌবন', 'চন্দন' এবং 'তন্ময়' পড়লে অর্থ একই থাকে এবং প্রসাদগুণ বর্তায়। 'সরণী', 'আনন্ত', 'আনন্তিক', 'নয়নী'— তরুণ লেখকদের উপর এ-সব ব্যবহারের প্রভাব ভালো হবে কিনা সে-বিষয়েও আমার সন্দেহ থাকলো।

'কবিতা'র সাম্প্রতিক সংখ্যায় অমিয় চক্রবর্তীর ছন্দ নিয়ে আলোচনা চলছে। বাংলা ছন্দের নবরূপায়ণে তাঁর কোনো-কোনো কবিতা দেখানো যেতে পারে, আমি কোনো সময়ে এই রকম একটা মন্তব্য করেছিলাম। আজ সেই কথাটা নতুন ক'রে উঠেছে, কেননা তাঁর সাম্প্রতিক ছন্দোবন্ধ লেখাতেও

সর্বত্র নিয়মিত পর্ববিভাগ পাওয়া যায় না। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ছন্দ-ব্যবহারে তিনি অনেকখানি স্বাধীনতা নিয়ে থাকেন—এখানে বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর আবার একটি সাদৃশ্য ধরা পড়ে—তার ফল ঘোটের উপর যা দাঁড়ায় তাকে অনেক ক্ষেত্রে স্বী ভর্স বলাই যুক্তিসংগত।

> ইট বাঁধা বহু গ্রাম একত্র শহরে গেঁথে, কোনোমতে
> থাকবে বহুলোক। এই গ্রাম
> তাহ'লে
> উঠে যাবে। ('ইতিহাস'—পালা-বদল)

> অন্তমনস্ক মন্ত শহরে হঠাৎ কুয়াশায়
> ('ওস্কারোধা'—পারাপার)

> শুতে যাই বুকে ক'রে শ্রীরাগ প্রপদে গম্ভীর—
> ('ছুরোপ জাহাজে'—পারাপার)

এই পংক্তিগুলিতে ছন্দকে যেটুকু বেঁকিয়ে দেয়া হয়েছে তাতে ছন্দের সীমা লঙ্ঘন করা হয়নি: 'তাহ'লে'-কে চারমাত্রা, 'অন্তমনস্ক' ছয়, এবং 'গম্ভীর'কে বিশিষ্ট ক'রে প্রয়োজনীয় মাত্রা পুরিয়ে নিতে আমাদের আপত্তি হয় না। পক্ষান্তরে এও বলা যায় যে 'তাহ'লে'-তে একমাত্রা কম থাকার জন্যই ওর ব্যঞ্জনা আরো দীপ্তি পেয়েছে। এ-ধরনের উদাহরণ এখানে আমার আলোচ্য নয়। 'থাকবে', 'চলতে', 'বলতে', প্রভৃতি ক্রিয়াপদ পয়ার ছন্দে হ্রস্বমাত্রার আজকাল অনেকেই বিন্যস্ত ক'রে থাকেন; আমার মনে হয় এর ব্যবহার স্বল্প ও সুমিত হওয়া প্রয়োজন, এবং তার উপকারিতা ক্রিয়াপদের ব্যঞ্জনবর্ণের উপরেও নির্ভর করে। উদাহরণত, 'পালা-বদলে'র 'এই বৃষ্টি' কবিতায়—

> মনের প্রহরী ভিজছে ছাতি হাতে নিঃক্ষুব্ধ প্রহরে
>
> শুধু ভিজতে, খানিকক্ষণ যাযাবরী মন অবকাশে—

চিহ্নিত ক্রিয়াপদ দুটিকে প্রসন্নভাবে উচ্চারণ করা যায় না; 'ভিজছে'-র পরেই 'ছাতি' কথাটায় আরো বেশি হুঁচট খেতে হয়। এ-রকম ক্ষেত্রে, মনে

হয়, পদ্যের তুলনায় গদ্যকবিতার পথই প্রশস্ত ছিলো, বিশেষত অমিয় চক্রবর্তীর মতো গদ্যকবিতায় বিপুল শিল্পীর পক্ষে। কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার মধ্যে পদ্যের সংখ্যাই বেশি ; কোথাও-কোথাও তাঁর ছন্দ কারুশিল্পে উজ্জ্বল, এবং অন্য কোথাও একই রচনায় একাধিক প্রকার ছন্দ, অথবা পদ্যের সঙ্গে গদ্য মিশিয়ে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার প্রধানতম নামই হ'লো স্বী তর্ক। 'পারাপার'-এর 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতার ছন্দের মধ্যে 'ভারতবর্ষের আকাশে' পংক্তিটা স্পষ্টত গদ্য (যদি না ওটা মুদ্রাকর বা লেখকের অনবধানতাবশত ঘ'টে থাকে) ; 'ফ্রাইবুর্গের পথে'র কোনো-কোনো পংক্তি যেন পয়ারের মধ্যে মাত্রাবৃত্তের আমেজ এনেছে ; 'একটি গান শোনা' কবিতায় 'ত্রিশূল স্থির। সুরের শাদা চূড়ো', এ-দুটি পংক্তি পদ্যধর্মিক ব'লে মনে হয় ; কিন্তু তারপরেই কয়েকটি পংক্তি গদ্যে লেখা, আবার দ্বিতীয় স্তবকে 'কোলাহল মিলে মিলে যায় ধ্বনির পাগড়ি বেঁধে ধ্যানে এলো হাওয়া মন্ত্রতাপসিক' এ-সব পংক্তি পয়ারের সুরে পড়তে প্রলুব্ধ হই আমরা। এমনও হ'তে পারে যে লেখক সমস্তটাকেই গদ্যকবিতা ব'লে উপস্থিত করতে চেয়েছেন—সেটা খুবই সম্ভব—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় যেমন প্রত্যেকটি পংক্তিকে পরিষ্কার গদ্য ব'লে চেনা যায়, তুলেও কখনো ছন্দের সুর লাগে না, অমিয় চক্রবর্তীর রচনা প্রথম থেকেই তার উল্টো পথে চলেছে : অর্থাৎ তিনি সচেতন বা অচেতনভাবে (সম্ভবত সচেতনভাবেই) গদ্যের ফাঁকে-ফাঁকে পদ্যের বিদ্যুৎ রেখে যেন। বলা বাহুল্য, আগাগোড়া নিয়মিত ছন্দে তিনি অনেক লিখেছেন, অনিয়মিতভাবেও লিখেছেন, কিন্তু মাঝে-মাঝে, যেন ইচ্ছে ক'রেই কী-রকম অসম বা বি-ষম পংক্তি ব্যবহার করেন, 'পালা-বদল' থেকে তার কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করি :

> আনুকূল্য মহাবিত্ত, প্রকাণ্ড বিশ্বাস সময়ে ('এরোড্রমে')
> কী ক'রে এমন দিনের কোমলতা ('দিন')
> কত ট্রেনে চলেছিলো, টাইম-টেবিলে আপসা চোখে ('মিলন দিগন্ত')
> বারো বছর ঐ গির্জের পাশের ঘরে……('ইতিহাস')

বর্ষ ২০, সংখ্যা ২

ক্রত ছন্দ ঝংকারে ঝংকারে শীতাঙ্গনে
তোমার তমুর আভাস ('রাত্রিশেষ')

স্বরবৃত্তেও অন্ত্যমিল দুর্লভ বিষয় নয়

সাদা বসন্ত কাশীরি বন জাফরানি বাস……

তবুও দেখ সাহারার ভিজে বালির প্রখর ('বিসংগতি')

এখানে চিহ্নিত পর্বগুলোকে মাত্রাবৃত্তে না-প'ড়ে উপায় নেই, যদিও অন্য পর্বগুলি স্বরবৃত্তের। ৬৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'দিঘি' নামক ছোটো ও সুন্দর কবিতাটিতে, আমার বিবেচনায়, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও পক্ষবাত্মিক, এই তিন রকম ছন্দ স্থান পেয়েছে: প্রথম পংক্তি—'যেখানে সে ডুবে আছে' পয়ার ও স্বরবৃত্তের মধ্যে দোদুল্যমান। পয়ারের মধ্যে বি-যম পংক্তির সুষ্ঠুতা বিষয়ে আমি সন্দেহমুক্ত হ'তে পারছি না, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে (যেমন 'পারাপারে'র 'বৈষাম্যিক' কবিতায়) এই মিশ্রণের ফল উপাদেয় হয়েছে, সতর্কভাবে এ-পথে পরীক্ষা করতে থাকলে বাংলায় যুক্ত ছন্দ বা মিশ্র ছন্দের একটি প্রকরণ গ'ড়ে ওঠা অসম্ভব নয়। এই সম্ভাবনাকে যাঁরা অস্বীকার করেন, যাঁরা বলতে চান এগুলো নিয়মিত ছন্দেরই অন্তর্ভুক্ত, তাঁদের কথা আমি বুঝতে পারি না।

দুটি কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

দুই ছন্দে

অদর্শনের দুঃখ তুমি তাঁকেও তো দাও
যিনি সবই সৃষ্টি করেন—
গাছের ছায়ার মাঠের কাজে আঙিনাতে
নানান খাতে
বাড়ন্ত দিন অবনি বহাও,
আলোর তলে তাঁকে কি চাও
ব্যথায় যিনি সৃষ্টি করেন।
সংসারিনী, তোমার জন্যে বসুন্ধরা
কল্যাণঘন ধাত্রে ভরা ;
তবুও বুকের সর্বহারা প্রাণপসরা
হাতে ধ'রে ঊর্ধ্বে তাকাও,—
তিনিই কৃপাবৃষ্টি করেন ॥

জন্মমৃত্যু পথে তোমার সঙ্গী যারা
পরম প্রাণের অঙ্গী যারা
তাদের মিলন পূর্ণ ক'রেও তৃষায় দহি'
তোমায় খোঁজে কোন বিরহী।
পথিক আমি তাঁরি বাঁশি বাজাই দূরে,
দরজা খুলে তব দুয়ারে
আনমনিয়ে নীলাম্বরের স্পর্শসুধায়
কায়া-হাওয়া তোমায় ছুঁয়ে কি যায়।

প্রবাসদুঃখ কোটে ঘরে, সমুদ্র ঢেউ ভাঙিবারে।
ঘরে তোমার আসুক না দোল
অনন্ত দোল,
সূর্যচন্দ্র তোমাকে চায়, তাঁরাই অনুরণী তারা ॥

মৃত্যু

অন্তে দেখে দরজা খোলা—
এক দিকে নীল
জ্যোতির শূন্য মাটির থালায়,
আকাশে চিল ;
অন্যদিকে
গাছ উঠেছে, নদীতে ঢেউ তোলা—
মরবে কোথায় ? এই নিরালায়
অবাধ বুকের সহজ ঘাটে
সবাই হাঁটে—

পাছে গিয়ে মন ঠেকে যায় মনে—
দেহটার এই চেতনদণ্ড ভাঙলে তবু
অশেষ চেতন
কানায়-কানায় ছড়ায় কোণে-কোণে—
জন্মমরণ
ছিন্ন কোথায় কবু ?

চেনা ঘরে
হঠাৎ শোনে সংসারে কে রেখেছে ডাক,
"বিদায় তোলো,
এই তো আছি ঘরে—"

দুই গালে হাত দিয়ে ভাবে এ কী অবাক।
—তার পরে তার মৃত্যু হোলো হ

আটচল্লিশের শীতের জন্য

বুদ্ধদেব বসু

না, তুই নিবি না আয়। শূন্য ছেনে হৃদয় ওরাবি।
হাঁ খোলে পাতালবেজ্ঞা, নেমে আসে কুয়াশী নীলিমা।
সেখানে ফোটে না ফুল, ম'রে যায় কীটের কালিমা।
যা বলে বলুক বন্ধু, তুই শুধু পায় হ'রে যাবি।

—'কিন্তু কোনখানে ?' হায়, সনাতন, শীর্ণ কৌতূহল।
বোঝে না, অবয়ব অবসানে আরম্ভ গতির,
যান, যান, যানখেতে কিছু এসে যায় না নশ্বর,
সার্থক হয়ে না প্রশ্ন—'কোন বার্তা নিয়ে এলি, বল !'

ভুলে যা ঝংকার, ধ্বনি, বরমাল্য কল্পাবতীরে,
যার ঠোঁট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে স্বরলিপি লিখেছিলি তুই ;—
ওরে সেই বরফ-গলানো রস আর যদি না থাকে কিছুই,

তবু ভাখ, প্রবল প্রেতের মতো দলে-দলে নামে দুই তীরে
অতীত, আসন্ন কাল ; সেতু বাঁধে প্রধিক সন্ততি—
যার কূট কৃপাণায় কেলি করে ঋষি আর যৌবনযুবতী।

প্রান্তরে কিছুই নেই ; জানালায় পর্দা টেনে দে ;
ওরা তোরে কেবল তোলাতে চায়—ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ ;
ফেলে দে পুতুল, ফুল, সোনা পাখি, সৌখিন ক্যাকটাস ;
ডুবে যা নিরতিমান, একতাল, বিস্তৃত নির্বেদে।

প্রাঙ্গণে কিছুই নেই ; পাখিস তো ঝষির হ'য়ে যা।
যা তোর নিজের নয়, তা শেখাতে পারে কোন মুনি ?
বরং তুলে নে ঘাড়ে আদিবাসী সিনবাদের বোঝা,
ক-টি বার মিল খুঁজে সারাদিন পাথার খাটুনি।

শীতের বোঙর পড়ে ; আর কিসে তোর প্রয়োজন ?
তীক্ষ্ণ, দীপ্ত, দিন্ন নিয়ে জেগে ওঠে অমল বেয়াল ;
এক হ'য়ে মিশে যায় ঘণ্টা, বেলা, পরিবর্তন ;

রৌদ্র আর জ্যোৎস্নার তালি-মারা রঙিন খেয়াল
অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে স'রে যায় নিখিল পৃথিবী,
কেননা, গতির পারে, তারে তুই সৃষ্টি ক'রে নিবি।

কবে সেই তুফান ফুরালো—
তবু কেন কাঁপন থামে না।
অন্তরালে উৎকীর্ণ কামনা
শূন্যে ছুঁড়ে বৈদ্যুতিক ধুলো

অন্ধকারে জ্বালায় যন্ত্রণা।
এই সব অস্থির অক্ষর
লুপ্ত ক'রে, গুঠন, সুন্দর,
এসো পূর্ণস্বাধীন সান্ত্বনা,

হৃদয়ের মধ্যে বাঁধো ঘর :
অবরোধ, বন্ধক, কুয়াশা,
স্তব্ধ মন, শব্দহীন ভাষা,

অভিভূত, দীর্ঘ অবসর ;—
আর তুই মুগ্ধ অন্তর্যামী—
আমি—আর মুখোমুখি আমি ?

সমালোচনা

কৃষ্ণচূড়া, মণীন্দ্র রায়। পরিষদের প্রকাশনী। দেড় টাকা।
যখন যন্ত্রণা, রাম বসু। হিন্দুস্থান প্রিন্টার্স। দেড় টাকা।

পৃথিবীতে দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক অসাম্য; দেশবিদেশের 'জঙ্গী' মানুষ সেই অসাম্যকে দূর ক'রে, শোষিতের মুক্তি নিয়ে, সুখশান্তি-সমৃদ্ধতার সোনার দিন শীঘ্রই ফিরিয়ে আনছে—এই কথাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখার মধ্যে প্রকাশ করতে পারলে সে লেখা 'প্রগতি'সম্মত হয়। মণীন্দ্র রায়ের 'কৃষ্ণচূড়া' আর রাম বসুর 'যখন যন্ত্রণা' কাব্যগ্রন্থ দুটিতে এই প্রগতির দৃষ্টান্ত দেখা গেল। কবিদের শ্রেণীগত পরিচয় কিংবা কবিতার বিষয়বস্তু একটা যে খুব জরুরি প্রশ্ন, কবিতার দোষগুণ যার উপর নির্ভর করছে, এমন কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আমরা কবিতা পড়ি তার বিষয়টা খুব সাহসিক ব'লে নয়, প'ড়ে কোনো 'উপকার' হবে ব'লেও নয়, ভালো লাগে ব'লে। কবিরাও বোধ করি কোনো কর্তব্যের তাড়নায় লেখেন না, আনন্দ পান ব'লেই লেখেন। কাজেই প্রগতির কবিতাও কবিতা হিসেবেই আমাদের মনে পৌঁছবে আশা করলে অন্যায় হবে না।

ধরা যাক, পৃথিবীর জ্বালা-যন্ত্রণা-দুর্দশা কোনো-কোনো কবির আর সহ্য হচ্ছে না। এবং এ-অবস্থায় অসামাজিক, নীতিনিরপেক্ষ কোনো ঘর গলায় আমাকে তাঁরা যে শুধু অবাস্তব মনে করছেন তা নয়, বলছেন অন্যায়। ধরা যাক, তাঁরা স্থির করলেন—এ-দুরবস্থার একটা আশু প্রতিকার করা আবশ্যক, এবং কবিতা লেখাই যখন তাঁদের কাজ, তাঁরা স্থির করলেন শুধু এই বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করলেই খানিকটা অন্তত বিহিত হ'তে পারে। কবিতার আড়ম্বর ক'রে পৃথিবীকে নিরাময় করবার চেষ্টার মধ্যে কতটা পরিমাণে যুক্তি আছে সে-কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। প্রতিকারযোগ্য দারুণ বেদনার বিষয়ে মানুষকে কবিতা লিখে অবহিত করানোর প্রয়োজন আছে কিনা, অথবা এ-বিষয়ে যারা উদাসীন (ধরা যাক

তেমন লোকও কবিতা পড়ে) কবিতা ক'রে বললেই তাদের পক্ষে নিজেদের বিদ্যুত মনে করার সম্ভাবনা কতটা—সে-প্রসঙ্গও বা হয় মুলতুবি রাখা গেল। যথার্থই পৃথিবীর দুঃখবেদনাকে কেউ যদি মনের মধ্যে বোধ ক'রে থাকেন, এমন যদি হয় যে সেই চিন্তাই একমাত্র হয়ে তাঁদের প্রাণে দিবারাত্র হানা দিচ্ছে, যদিকে তাঁরা শোষণ, বিলাপ, আর্তনাদ আর শয়তানের লীলাখেলার প্রতিবিম্বই শুধু দেখছেন, তাহলে সে-বিষয় নিয়ে কবিতা লেখাই তো স্বাভাবিক। এমনকি, কবিতাকে তাঁরা যদি দুর্গতিমোচনের আয়ুধে পরিণত করতে চেষ্টা করেন, আয়ুধ মাত্রেরই আয়ুকাল হ্রস্ব জেনেও, তাতেই বা কী বলবার আছে? যে-উদ্দেশ্যে কবিতা সেটি সফল হলেই হ'লো। এবং তার আগে কবিতা হলেই হ'লো।

হরীন্দ্র রায় অভিজ্ঞ কবি। প্রথম থেকেই তাঁর লেখায় ছন্দমিলের পারদর্শিতা তরুণ কবিদের ঈর্ষা করবার যোগ্য। এবং কবিতার ভাষাকেও তিনি ভালোবেসেই প্রয়োগ করেন। তৎসত্ত্বেও 'কুকচুড়া'য় তিনি ভাষাদুষ্টতা আর উচ্ছ্বাসের বাড় থেকে রচনাকে রক্ষা করতে পারেননি, যদিও পূর্বেকার চাইতে ছন্দমিল এখানে আরো পাকা হাতে ব্যবহার করা হয়েছে। কবিতার পর কবিতার শেষ পর্যন্ত বলবার কথা যেন একটি—শাপিষ্টদের অনাচার অত্যাচারে এ-জীবন দুর্বিষহ; কবে, হায়, সুদিনের সোনার হরিণ এসে পৌঁছবে। গোড়াতেই ব'লে দেওয়া যায় এ-ধরনের যে-কোনো কবিতার শেষ কোথায়। এবং যে-সব চিত্রকল্পের সাহায্যে ইচ্ছাপূরণের এই কল্পনাকে তিনি রূপ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে আনুপূর্বিক কোনো সামঞ্জস্য থাকেনি। বিকেলের কলকাতা, 'হলুদলাগা জাঁচলে' এখনো গৃহকাজের ছাপ, কালো মেয়েটি :

> সে যেন এক জানালা-ঘরে-দাঁড়ানো কালো মেয়ে
> ক্লান্ত চোখে পথের দিকে তাকিয়ে একা চেয়ে।
>
> (পূর্বরাগ)

কবে তার প্রেমিকেরা বিপ্লবের জয়বার্তা নিয়ে ঘরে ফিরবে। ছবিটি সুন্দর। এবং কবিতাটি বস্তুত এখানেই শেষ। কিন্তু বলবার কথাটাকে আরও

বিনষ্ট করতে গিয়ে এ-ছবিটিও শেষপর্যন্ত তিনি একাকার ক'রে দিলেন। যোগ করলেন :

আসবজল ফিরবে ঘরে, সেই আশাতে বসু
দুচোখে তুমি ভরাবে করে আঙুলগুলো বসু!

দুচোখে ভরাবে? বসু? অনিশ্চিতগতি তরুণ কবির লেখাতেও অসহ্য লাগতো। তারপর, এই জানালা-ঘরে-দাঁড়ানো কালো মেয়েকে দিয়ে 'যজ্ঞ' হানবার সংকল্প তো একেবারেই অচল। অন্তত, জীবনের গৃহলক্ষ্মী রূপে এঁকেছেন, শত বিপর্যয় পার হয়ে যে আবার গ্রামের ইঁদারা থেকে জল তোলে, জ্বালে কাঠ কুড়োয়। এ-কবিতা আরো কিছু বলার অপেক্ষা রাখে কি? 'তবু তারা মানুষেরই মতো' কবিতায় যাদের কথা বলা হয়েছে, সহীসলেমের মতো জান্তব অস্তিত্ব নিয়ে টিঁকে আছে যারা, তারা কি সত্যি জানে

বিনষ্ট আলোর ঘর, লালসীন শাড়ী, আয়া
গ্রামের জলসা ও কন্যা লুঠ করে তবু

'প্রাসাদ পাষাণপুরী এ মহানগর' অস্তিহীন? জানে

অতীত যন্ত্রণের মর্তমনে, বর্তমান দাঁড়িয়েছে পা
দুঃসহ দুঃখ ভাষাতে?
(তবু তারা মানুষেরই মতো)

এই ধরনের রচনার নাম কি কবিতা হবে? বক্তব্যটা যখন জরুরি, বলার মধ্যে অত্যুক্তির দৈন্য না-থাকাই তখন বাঞ্ছনীয়। কাঁদে-পড়া বাঘ কি শুধু ছন্তবল শোষকেরই প্রতীক? এবং 'অবিমৃষ্টকারী' সূর্যের সঙ্গেও সেই শোষকের সমীকরণ সম্ভব?

আমি মনে করি, এ-সব অত্যুক্তি এবং অসংলগ্নতার জন্য দায়ী তাঁর কবি-স্বভাবের সঙ্গে 'সমাজচেতনা'র দ্বন্দ্ব। এবং যেখানেই তিনি কর্তব্যের শাসনকে অবহেলা করতে পেরেছেন, যেমন 'ভোরের স্বপ্ন', 'অযোধ্যা' কিংবা

'অসম্পূর্ণ' কবিতায়—সেখানেই অকুণ্ঠিতভাবে বেরিয়ে এসেছে তাঁর শিল্পীস্বরূপ।

> যেন তমস্বিনী মেঘেরে তোর
> মেঘকান্তি ঐ মেঘলাকে।
> আজ সুরোক্ষ মধুর ভোর,
> জাগে ঘন যেন ঘিরের কাছে।
>
> (ভোরের ঘর)

এ-কবিতার মধ্যে প্রয়াস নেই, শিল্পীর বিষয়ের গায়ে-পড়া ভার নেই, কবিতাই আছে, যার জন্ম আমরা ব্যগ্র। কিন্তু প্রগতির ভার এখানে আশ্চর্য রকমের হাল্কা।

রাম বসুর কবিতায় অবশ্য এই দ্বন্দ্ব এতদূর স্পষ্ট নয়। মানুষের দুঃখদুর্দশায় তিনি এতই বিচলিত যে সে-কথা ব'লে কেলবার জন্য কবিতার প্রতি যাদাযমতা দেখাতে তিনি অনিচ্ছুক। ফলে তাঁর কবিতায় দুর্গতির তথ্য অনেক আছে, যা থেকে সাংবাদিক বর্ণনাকে পৃথক করা দুর্বিল।

> শিলাদল ছেঁচে
>
> আলো জ্বলে লালচে
> সন্ধ্যের দৃষ্টি যখন
> ঘুরের ইঙ্গিত সিটি মারে
>
> (রেখা ও রবি)

এই রকম আকস্মিক দুচারটি সার্থক পংক্তির জন্য তিন পাতা জোড়া দুর্গতির তালিকা। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অভিজ্ঞতাকে অবিশ্বাস করার কথা উঠছে না, তথা ছন্দে কবিতাকে ঘিরে সে উপলব্ধিকে তিনি আমাদের মনেও সৃষ্টি করাতে পেরেছেন কিনা। 'যখন যন্ত্রণা'র কবিতাগুলিতে পারেননি। কেননা সেখানো বুলির মতো কথাগুলোকে আউড়ে দিয়েই এ-কবিতা চুপ ক'রে যায়, যেন

থাকে না। যেমন, বুকের পাঁজরা খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সিংহদুয়ের বেদনা নিচের পংক্তিগুলোতে একটিলে ধরা পড়েছে কি ?

> হায় কোথায় হতো, হায় কোথায় কান্না
> স্নেহের সন্তান ও ; ও সন্তান
> আত্মিয়ানী। জীবনে পালার ফিল
> যমরাজ দারোগা পুলিশ
> সাহেব বাবুর প্রণয়িনীর গর্ভপাত
> শেঠ, টাটা, বার্ড, বার্ন, আই. সি. সি ;
> অপমানিতা সিংহদুয় বধূ-বরন মোবুদিতে অটেতন্য ।

(সিংহদুয়)

এ-জিনিস না-কবিতা, না-পদ্য, এমনকি গদ্যও না। গদ্যেও আরো গুছিয়ে ভালো ক'রে বলা যেতো। তাঁর উপমার মধ্যে স্থানে স্থানে বৈচিত্র্য আছে ('বিধবস্ত বন্ধুর মতো' প্রায়, 'আটশ বছরের নারীর মতো উন্মুখ' প্রভৃতি)। এবং চেষ্টা করলে

> আমার সেই পাখী পাখার জোর যার
> শিকড়ে ঠোঁট ভরে পাথর ফেড়ে জোটে
> কিন্তু যেন তার পাতালে মাথা কোটে
> খসায় মাটি তারা ছিঁড়ে ফেড়ে যায়
> আমার সেই পাখী যখন জোর যায়

(উৎসর্গ)

এরকম অনুরণনে ভরা সুষ্ঠু সুন্দর কবিতাও যখন লিখতে পারেন, তখন কি ভেবে দেশপ্রেম মানবপ্রেমের কথা বক্তৃতার মতো সাদা কথায় তিনি ঘোষণা করতে গেছেন জানি না।

ছন্দের পরীক্ষা নিয়েও যার বহুর কৌতূহল আছে। তবে 'রক্তাক্ত যামিনী' এবং 'যখন যন্ত্রণা' নামের সনেট দুটি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে পয়ার বিল মাত্রার ধাঁচাতে পারে না। বাচ্যার্থের অনুসরণ ক'রে গদ্যের মতো পড়ার চেষ্টা করলেও শেষ পংক্তিতে গিয়ে ২০ মাত্রার পয়ার আছড়ে পড়ে :

> সে যামিনী এ জীবন প্রতিশোধে অন্ধ, মত্ত ঘৃণা ভুলে ।

হয় হ্রস্বমাত্রা কম, নয়তো বেশি চাই এখানে, মনে হয়।

রাম বসু শুধুই যে প্রগতির কবিতা লেখেন তা নয়। এবং যে-সব কবিতায় অন্ধ কবির মনের মধ্যে, যার প্রধান উদ্দেশ্য এই নয় যে তা থেকে অন্ধের মনে সমবেদনা, দয়া, ক্রোধ কিংবা হিংসা জাগবে, লেখার তাগিদেই যা লেখা, যেমন 'অধিকৃত' কিংবা 'কান্না', 'সে' কিংবা 'সেই মুখ', কবি হিসেবে, আমার মনে হয়, সেইখানেই তিনি সফল হতে পেরেছেন। গত শতাব্দীর সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনী যাদের অজানা, কানু, সিধুর উল্লেখ না বুঝলেও, 'অধিকৃত' কবিতাটি তাঁদের মনে ঠিক পৌঁছবে। এর মধ্যে বক্তৃতা নেই, বেদনা আছে, ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে মিলে পংক্তিগুলি তাই শেষ হয়েও যেন শেষ হয় না :

> হাজারটার বাড়ে দিলে যদি পরশ বাও ওরে
> ভালোবাসার দাম ওরে তাও বড়ায় মনে ওরে
> জনকথার গান।

এই নিয়েই 'কাব্যের ফরমাস'। সে-সুর ভিড়ে হারিয়ে যায় না, চিনে নেওয়া যায়।

প্রগতির কবিতার গুণ তাহলে কি এই যে তা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা চলে, বক্তৃতা করাও চলে, কিন্তু কবিতা হিসেবে তার যেন কারো মনে পৌঁছয় না? এবং তার কারণ কি এই নয় যে বক্তব্যটা এসব কবিতার সম্পূর্ণ বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া? এসব কবিতার মধ্যে ধরার, করণার পরিচয় আছে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ আছে, সৎ অভিপ্রায়ের বিবৃতিও আছে। সেই সঙ্গে আছে অপরিমিত উচ্ছ্বাস, অসংযত আত্মকরুণা, এবং কবিতার কারুকর্মের প্রতি, কোথাও কোথাও সচেতনভাবেই, অবজ্ঞা আর উদাসীনতা। কবির মন বাইরের দিকেই অপলক দৃষ্টিতে আবদ্ধ থাকলে যা হয়। একদিকে শিল্পীর স্বভাব, অন্যদিকে তাঁর সামাজিক দায়িত্বের চেতনা—দুয়ের বিরোধে প'ড়ে প্রগতির কবিতা শিথিল ভাবালুতায় পর্যবসিত। পৃথিবী শিগগির ভালো হয়ে গেলে দেশোদ্ধার এবং সমাজ-সংস্কারের দায় থেকে কবিরা হয়তো মুক্তি পেতেন এবং তখনো লিখতে হলে যা লিখতে হোতো তার মধ্যে কবিতা না-হওয়ার কোনো ওজুহাত থাকতো না।

সুরেশ গুহ

The Flowers of Evil, Charles Baudelaire. Selected & Edited by Marthiel and Jackson Mathews. New Directions, $ 6. 00.

100 Poems from the Japanese. Kenneth Rexroth. New Directions, $ 3. 50.

(কলকাতার প্রধান অ্যাংলো-মোস্তানিতে প্রাপ্য)

ফরাসি কবিদের মধ্যে বোদলেয়ার-এর বৈদেশিক প্রতিপত্তি সর্বাধিক ; অনুবাদকের পক্ষেও তাঁর আকর্ষণ প্রবলতম। তার কারণ, তাঁর কবি-মানস সম্পূর্ণ আধুনিক হ'লেও (বস্তুত, তাঁকেই আধুনিক কাব্যের আদি উৎস বলা যায়) তাঁর রচনারীতি প্রাচীন ; তাঁর পরবর্তী এবং শিষ্যপ্রতিম কবিরা, মালার্মে, ভালেরি, রিলকে, এলিয়ট, এঁদের রচনার অনিবার্য দুরূহতা তাঁর কোনো-একটি পংক্তিতেও খুঁজে পাওয়া যায় না ; 'ল্য ফ্লার দ্য মাল'-এর প্রত্যেকটি কবিতা প্রসাদগুণে নির্মল ব'লে অদীক্ষিত পাঠকের পক্ষেও তিনি সহজে অধিগম্য। অনুবাদকের পক্ষে তাঁর আকর্ষণের কারণ তাঁর কবিতার মধ্যে একটি স্পর্শসহ সংবাদের উপস্থিতি ; জিনিশটাকে যেন ধরা ছোঁয়া যায়, বিষয়টা প্রায় কাহিনীর মতো উল্লেখসাপেক্ষ, এবং যে-সব চিত্রকল্পের দ্বারা তা রূপায়িত হয় সেগুলো সব সময় ভাষান্তরেই মূল্যমূল্য। অর্থাৎ তাঁর কবিতার অভিজ্ঞতা শুধু শব্দবিন্যাস বা ধ্বনির যাদুজালের উপর নির্ভর করে না, এবং তাঁর চিন্তার ভাষাটি ছবি ব'লে ভাষান্তরে অভিপ্রায়বিকৃতির আশঙ্কা খুব ক'মে যায়। নির্বস্তুক শব্দগুলোর এক-এক ভাষায় এক-এক রকম ইঙ্গিত ; কিন্তু সামান্য বিশেষ্য শব্দের অবিকল অনুবাদ সম্ভব ; 'bird', 'oiseau' এবং 'পাখি' অব্যর্থভাবে একই জিনিশকে বোঝাচ্ছে ; কিন্তু 'esprit' কথাটাকে বাংলায় (বা ইংরেজিতে) বোঝাতে হ'লে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োজন হ'তে পারে। বোদলেয়ারের কবিতায় প্রধান নির্ভর মূর্ত বা দৃশ্য শব্দ ; তাই সকল অনুবাদের মধ্যে তিনি বহুলাংশেই প্রবেশ ক'রে থাকেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, কবির মৃত্যুর দু-বছর আর 'ল্য ফ্লার দ্য মাল' প্রথম প্রকাশের বারো বছর পরে, ইংরেজি ভাষায় বোদলেয়ারের অনুবাদ-কর্ম আরম্ভ হয়।

সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায়, সেই অনুবাদের পরিমাণ অনবচ্ছিন্নভাবে বেড়ে গেছে ; দক্ষিণ আফ্রিকার কবি রয় ক্যাম্বেল কিছুদিন আগে সম্পূর্ণ 'ফ্ল্যর দ্য মাল' ইংরেজিতে প্রকাশ করেছেন। নিউ ডিরেকশন্স প্রকাশিত গ্রন্থটি এই পর্যায়ে সর্বশেষ ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সংযোজনা। মূল 'ফ্ল্যর দ্য মাল'-এর বিভিন্ন সংস্করণের অন্তর্গত ১৬৮টি কবিতার প্রত্যেকটি এখানে স্থান পেয়েছে ; প্রত্যেকটি কবিতার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিভিন্ন ইংরেজি পাঠ তুলনা ক'রে, সম্পাদকেরা উত্তমটিকে বেছে নিয়েছেন। ভূমিকায় তাঁরা জানিয়েছেন যে কোনো-কোনো কবিতার কুড়িটি পর্যন্ত বিভিন্ন অনুবাদ তাঁদের হাতে এসেছে ; এবং কয়েকজন মার্কিন কবি এই গ্রন্থেরই জন্য বিশেষ-ভাবে কয়েকটি অনুবাদ রচনা ক'রে দিয়েছেন। অনুবাদকের মোট সংখ্যা ৩০ ; তাঁদের মধ্যে আছেন স্টার্জ মুর, জন কোয়ার, মাইকেল হীড, জেমস এলরয় ফ্লেকার, অড্ডল হাক্সলি, এডনা সেন্ট ভিনসেন্ট মিলে, অ্যালেন টেইট, রিচার্ড উইলবার এবং কার্ল শেপিরো-র মতো বিভিন্ন সময়ের নামজাদা ইংরেজ ও মার্কিন লেখক ; সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি আছেন রয় ক্যাম্বেল ; ডেভিড পল, সি. এফ. ম্যাকিন্টয় আর অ্যালেন কওয়ন-এর অনুবাদও সংখ্যার দিক থেকে উল্লেখ্য। কিন্তু, অনুবাদক যিনিই হোন, ইংরেজিতে প্রত্যেক কবিতাই সুখপাঠ্য ও ফলপ্রসূ, একই লেখকের একটি অখণ্ড গ্রন্থের মতো বইটিকে পাঠ করা যায়।

'The Flowers of Evil'-এ মূল ফরাশি পাঠও সংযোজিত হয়েছে, (রয় ক্যাম্বেলে তা নেই) ; মুখোমুখি পৃষ্ঠায় নয়, বইয়ের শেষ অংশে স্বতন্ত্র-ভাবে উদ্ধৃত। 'ফ্ল্যর দ্য মাল'-এর একটি সংস্করণে বোদলেয়ার লংফেলোর 'The Song of Hiawatha'-র আংশিক অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন ; সেই অনুবাদ, এবং ইংরেজিতে তার পুনরনুবাদ স্থান পেয়েছে ব'লে এই গ্রন্থের সম্পূর্ণতায় কোনো খুঁত নেই। (বোদলেয়ার-কৃত পো-র অনুবাদ 'ফ্ল্যর দ্য মাল'এর অন্তর্গত হয়নি ব'লে এই গ্রন্থ থেকে বর্জিত হ'লো, এতে একটু আক্ষেপ হয় আমাদের ; সেই অনুবাদ থেকে আবার

যদি কেউ ইংরেজি জানতেন, তাহলে আর কৌতূহল তৃপ্ত হ'তো। তা নয়, অনুবাদের প্রকরণেও মূল্যবান আলোক-পাত হ'তো।) গ্রন্থের 'Further Poems' অংশের ২৭, ২৮ ও ২৯ নম্বর কবিতা বঙ্গ ক্যাম্বেলে নেই; 'ত্রুয়ার থ্য যাল'-এর উৎসর্গপত্র (To the impeccable poet, Theophile Gautier), এবং কয়াশিতে অপ্রকাশিত তিনটি ভূমিকার ঘসড়া—এ-সব সংযোজনেও আলোচ্য গ্রন্থটি অধিক আদরণীয়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, একটিমাত্র গ্রন্থের মধ্যে কবি বোদলেয়ারকে সম্পূর্ণভাবে পেতে হ'লে ইংরেজি ভাষার পাঠকের পক্ষে 'The Flowers of Evil' অপরিহার্য। এবং এই অতুলনীয় কাব্যের প্রথম প্রকাশের শতবার্ষিকী যখন আসন্ন, তখন এই গ্রন্থের প্রকাশ বিশ্ব-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বাংলায় আমরা চীনে কবিতার সঙ্গে যতটা পরিচিত, জাপানির সঙ্গে তার অর্ধেকও নই; অবশ্য আধার ওয়ালে আমরা অনেকেই পড়েছি, এক সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কিছু অনুবাদও করেছিলেন; কিন্তু গত পনেরো বছরের মধ্যে যেখানে অন্তত পঞ্চাশটি চীনে কবিতার বাংলা অনুবাদ হয়েছে সেখানে জাপানি কবিতা একটিরও হয়নি। শান্তিনিকেতনে চীনা ভবনের অস্তিত্ব এর একটি গৌণ কারণ মাত্র (কেননা ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া আর-কোনো অনুবাদক আমরা পাইনি); আসল কারণ বোধহয় চৈনিক কবিতার ব্যাপকতর আবেদন, এবং সাধারণভাবে আমাদের মনে এই ধারণা যে জাপানি সংস্কৃতি চৈনিকেরই একটি সম্প্রসারণ। এ-কথা সত্য যে লিপি, শিল্পকলা, Zen বৌদ্ধধর্ম—সবই চীন থেকে কোরিয়ার মধ্য দিয়ে জাপানে পৌঁচেছিলো; কিন্তু তাই ব'লে জাপানকে চীনেরই একটি শাখা ব'লে ভাবলেও ভুল হবে; কাব্যের ক্ষেত্রে তার বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিপাতমাত্রেই বোঝা যায়। জাপানি প্রতিভা বিশেষভাবে নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছে ছোটো কবিতায়—পাঁচ লাইনের তানকা বা তার চেয়েও ছোটো হাইকুতে—যার অনুরূপ রচনা পৃথিবীতে আর কোথাও আমরা পাবো না—না ল্যাটিন এপিগ্রামে, না সংস্কৃত

উচ্চট কবিতার, না রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র বা ডি. এইচ. লরেন্সের 'প্যানজি'-এর এবং এই বিশেষ ধরনের কবিতার একটি ছোটো, সুন্দর, ব্যবহার্য সংগ্রহ কেনেথ রেক্সরথ-এর '100 Poems from the Japanese'।

রেক্সরথ হাল আমলের বাঘছালা মার্কিন কবি; তাঁর নিবাস সান ফ্রানসিস্কো, যার উপকূলে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে জাপানকে অনুধাবন করা যায়, যার 'চায়না টাউন' পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জমকালো, এবং যে-নগর বিবিধ এশীয় বিদ্যার একটি কেন্দ্রস্থল ব'লে পরিগণিত। রেক্সরথ খুব তরুণ বয়সেই জাপানি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন; বহু বছরের অধ্যয়ন ও পরিশ্রমের ফল এই গ্রন্থের শতাধিক কবিতায় একত্রিত হয়েছে। ভূমিকায় জাপানি কবিতাকে তিনি বলেছেন 'poetry of sensibility'; —কথাটা ঠিক, কিন্তু 'sensibility' মানে যদি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি হয় তাহ'লে অন্যান্য দেশের অন্যান্য ধরনের কবিতার মধ্যেও তার কমিষ্ঠতা কম নয়, জীবনানন্দ দাশকেও 'sensibility'র কবি বললে ভুল হয় না। 'প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাল?' বা 'ঝিঙ্গলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা'—এ-সব পংক্তি ঈষৎ বদলে, ছোটো-ছোটো চার-পাঁচটি পংক্তিতে সাজালে, জাপানি ব'লে চালানো অসম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, ইয়াকামোচির 'The wind rustles the bamboos/By my windows/In the dusk' বা হিতোমারোর 'I sit at home/In our room/By our bed/Gazing at your pillow'—এই ধরনের রচনাকে আমাদের অত্যন্ত ভাবহীন বা ইংরেজীর কবিতার একটি মাত্র পংক্তি ব'লে, বা নাটকীয় উক্তির একটি অংশ ব'লে, মনে হ'তে পারে—যদিও জাপানি মতে এগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। অত্যন্ত বেশি বলা যেমন ভালো নয়, তেমনি অত্যন্ত কম বলার দিকে ঝুঁকলেও একদিকে যেমন দুরূহতার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, তেমনি অন্য দিকে কবিতা লেখাটা একটা পরিশীলিত ক্রীড়ায় অধঃপতিত হবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু সুখের বিষয়, রেক্সরথ প্রাচীন জাপানি কাব্য থেকে (তাঁর কবিতের জীবৎকাল আট থেকে দশ শতক) যে-সংকলন

করেছেন, তার মধ্যে একেবারে অ-কবিতা একটিও নেই, এবং অধিকাংশই আশ্চর্যভাবে সেই স্তরের অধিকারী, যাকে সংস্কৃতে বলেছে 'ধ্বনি' বা 'ব্যঙ্গ্য'। তাঁর টীকার সাহায্যে আমরা আরো জানতে পারি যে অনেক কবিতায় একাধিক অর্থ নিহিত আছে; আর তার ফলে যদিও কবিতা পড়ার সঙ্গে হেঁয়ালি-সমাধানের পার্থক্য ঘুচে যাবার ভয় থাকে, তবু সাংকেতিক ভাষার ব্যবহারে আপাদি কবির নৈপুণ্যকে শ্রদ্ধা না-ক'রেও উপায় থাকে না। 'Though the purity/Of the moonlight has silenced/Both nightingale and/Cricket, the cuckoo alone/Sings all the white night.' —এই কবিতার ব্যঙ্গ্যার্থ হ'লো :—'বুদ্ধের মতে গৃহী আর সন্ন্যাসী দু-জনেই মুক্ত হয়েছে, কিন্তু, তার নিজের মতনে, কেন্না সারা রাত ধ'রে পূজা ক'রে চলেছে।' অর্থাৎ, উপমা জিনিশটাকে বর্জন করা হ'লো; 'যেমন' বা 'মতো' শব্দের উল্লেখ ক'রে কবি উপমানের উল্লেখ ক'রেই ছুটি নিলেন। (এইজন্যেই ইমেজিস্টরা একটি ব্যবহার্য আদর্শ পেয়েছিলেন আপাদি কবিতায়, তার প্রভাব ইয়েটস-এর উপরেও আড় হ'য়ে পড়েছিলো।) আকাহিতোর : 'আগামী কাল আমার যাবার কথা/বসন্তের প্রান্তরে ফুল কুড়োতে/গত কাল সারাদিন ধ'রে বরফ পড়লো। আজ বরফ পড়লো সারাদিন ধ'রে'—এর মানে—কোনো তরুণীর সঙ্গে প্রণয়ব্যাপারের মধ্যিখানে হঠাৎ আপন মাকে)র উপলব্ধি। হিতোমারোর 'My girl is waiting for me/And does not know/That my body will stay here/On the rocks of Mount Kamo'—এখানে 'my girl' মানে মৃত্যু। এই দুই-অর্থ আপাদি কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য কিন্তু সব কবিতাই এই লক্ষণের দ্বারা আক্রান্ত নয়; অনেক কবিতা সম্পূর্ণ স্ব-নির্ভর, উল্লেখের প্রত্যাশাবর্জিত, এবং অতি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যেই রীতিমতো সমাপ্ত। অবেক বেশি উদ্ধৃতি দেবার জায়গা নেই আমাদের, কিন্তু সন্ন্যাসী ইয়াসাতোহিমের 'Others may forget you, but not I/ I am haunted by your beautiful ghost' কিংবা তোশিয়ুকির 'Autumn has come invisibly/Only the wind's voice is ominous'—

এখানে বক্তব্য বোঝার জন্য নোট দেখতে হয় না, কিন্তু যাচ্যার্থের চাইতে কিছুটা বেশি বলা হয়েছে। গ্রন্থের শেষ অংশে স্থান পেয়েছে অনেকটি হাইকু (অধিকাংশই বাংলায় পরিচিত), আর হিতোমারোর তিনটি দীর্ঘ (জাপানি মানে দীর্ঘ) নাগা উতা জাতীয় কবিতা ; তার মধ্যে প্রথম এবং তৃতীয় কবিতাটির সঙ্গে চীনে কবি য়ুয়ান চন্-এর 'An Elegy'-র (কয়েক বছর আগেকার 'কবিতা'য় 'মৃতা পত্নীর প্রতি' নামে অনুবাদ দ্রষ্টব্য) স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে ব'লে মনে হয়। হিতোমারো য়ুয়ান চন্-এর পূর্ববর্তী ; অতএব এ-রকম অনুমান করলে অন্যায় হয় না যে এই একটি ক্ষেত্রে চীনের উপর জাপানি কাব্যের প্রভাব পড়েছিলো। না কি দুটি কবিতারই অন্য কোনো পুরোনো উৎস আছে ?

'100 Poems from the Japanese' অত্যন্ত সুমুদ্রিত ও সুদৃশ্য গ্রন্থ ; লাতিন হরফে মূল জাপানিও মুদ্রিত আছে, এবং সেই সঙ্গে জাপানি লিপি-চিত্র বা ক্যালিগ্রাফির নমুনা। পুস্তকবিলাসী গ্রন্থটি নাড়াচাড়া ক'রেও আনন্দ পাবেন। মার্কিনদেশের সবচেয়ে উদ্যোগী প্রকাশকদের মধ্যে নিউ ডিরেকশন্স অন্যতম, বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ-প্রকাশে তাঁরা অক্লান্ত, এবং তাঁদের ভাবী তালিকার মধ্যে একটি চীনে কবিতার সংকলনও তাঁরা ঘোষণা করেছেন। আমরা আশা করবো যে কোনো সময়ে তাঁরা সংস্কৃত ও আধুনিক ভারতীয় ভাষার কাব্যেরও অনুবাদ প্রকাশের ভার নেবেন ; দুঃখের বিষয়, কী ইংলণ্ডে কী আমেরিকায়, ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে এখনো তেমন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না, অনেক সময়ই অর্থমনস্ক দায়-সারা গোছের কাজ দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক বছর আগে নিউ ইয়র্কের চার্লস ক্রিবনার্স সন্স 'A Little Treasury of World Poetry' নামে যে-গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, তাতে হিব্রু কবিতা ছিলো ৪০ পৃষ্ঠা, চীনেও তা-ই, জাপানি ৩০, লাতিন ৮৪, গ্রীক প্রায় দেড়শো—আর সংস্কৃত ২৪, তার মধ্যেও আবার চার পৃষ্ঠা হিন্দি ও বাংলা। অথচ পৃথিবীর প্রাচীন ভাষার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের আয়তন সবচেয়ে বিরাট। হ'তে পারে, ভারতীয় ভাষা থেকে ইংরেজি অনুবাদ যথেষ্ট পাওয়া যায় না, কিন্তু সেটাই তো ইংরেজি ভাষার পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের ঔদাসীন্যের প্রমাণ। —বু. ব.

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ২

চিঠিপত্র

'কবিতা'র কুড়ি বছর

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু,

'কবিতা' ত্রৈমাসিক পত্র কুড়ি বছরে পড়লো, এ-কথা মনে হ'তেই আধুনিক বাংলা-কাব্য-আন্দোলনের একটি বিচিত্র অধ্যায় স্মরণে এলো। আর সে-কারণেই এই চিঠি।

১৯৩৫ সাল। সবে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা পাশ ক'রে কলেজে ঢুকেছি, কলকাতা থেকে আমার এক ছাত্রবন্ধু সদ্যপ্রকাশিত 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যাটি পাঠিয়ে দিলেন। আকারে ছোটো, আজকার এখনকার মতোই। তিনটি ঘড়ো হরফে মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে যাঁকা প্রচ্ছদ, অনিলরঞ্জন ভট্টাচার্য এঁকেছিলেন। আর লেখক? আমাদের বাড়িতেই দাদার পুরোনো স্টিলের বাক্স থেকে 'কল্লোল', 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি'র কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য সংখ্যা পড়েছিলাম বছর-খানেক আগে, দেখলাম 'কবিতা'র সে-সব পত্রিকার লেখকরা অনেকেই উপস্থিত আছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, মণীশ ঘটক (যুবনাশ), হেমচন্দ্র বাগচী, অজিত দত্ত ও বিষ্ণু দে। নতুন কবিদের মধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন, হুমায়ুন কবির, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র (ইনি স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় ছদ্মনামে লিখতেন), প্রমথ রায়। পত্রিকাটি ভালো ক'রে আগাগোড়া দেখে মনে জাগলো অভূতপূর্ব উত্তেজনা ও উল্লাস। কেমনা তার আগাগোড়া কবিতায় ভরা।

মনে পড়ছে প্রথম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন আপনি ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। সহকারী সম্পাদক, সমর সেন। অবশ্য কয়েক সংখ্যা বেরুবার পর প্রেমেন্দ্রবাবু আর সম্পাদক থাকেন নি, এবং সমর সেনও কিছুকাল পর বিদায় হয়েছিলেন। কবিতাভবনে যখনই গিয়েছি পত্রিকাসংক্রান্ত সব কাজ আপনাকেই করতে দেখেছি, অবশ্য সময় বার। অনুমিতের মধ্যে। 'কবিতা' যে কুড়ি বছরে

পড়লো তার মূলে রয়েছে আপনার সাহিত্যাদর্শের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা, এ-সত্য কবুল করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংখ্যাটি প'ড়ে খুশি হ'য়ে আপনাকে চিঠি লিখেছিলেন, দ্বিতীয় সংখ্যায় সেই চিঠি প্রথম ছাপা হয়েছিল। সেই সংখ্যাতেই প্রথম কবিতা লেখার রবীন্দ্রনাথের, আমাদের বিস্ময় তখন সীমা ছাড়িয়ে উঠলো। পত্রিকার তখনকার দাম ছিল দু' আনা, লেখক ও রচনার অপূর্ব যোগাযোগের তুলনায় তখনকার দিনেও ও-দাম কিছুই নয়।

মনে পড়ছে প্রথম পাঁচ-সাত বছর চলেছিলো 'কবিতা'র স্বর্ণযুগ। প্রতি সংখ্যায় সুপরিচিত শক্তিমান কবিদের সমাবেশ, তাঁদের নতুন-নতুন কবিতা, আর সেই সঙ্গে নবীন কবিদের রচনাগুচ্ছ। ঢাকা শহরের অবজ্ঞাত কোণে ব'সে লুকিয়ে-লুকিয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করতুম : 'কবিতা'র দ্বিতীয় বছরের প্রথম সংখ্যায় আমার দুটো কবিতা ছাপার অক্ষরে বেরুতেই মনে হ'লো গুণীজনের সভায় আসন পেয়ে গেলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভিতরেও তখন দেখেছি প্রবল সাহিত্যঘটিত তার্কিক উত্তেজনা : প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দের কবিতা নিয়ে আলোচনা। সদর ঘাটে নবাব-বাড়ির পিছনে বেশ নিরিবিলিতে জ'মে উঠতো সাহিত্যের সেই সান্ধ্য আড্ডা, রাত দশটার ঘণ্টা শুনে অগত্যা বাড়ি ফিরতে হয়েছে। দ্বিতীয় বছরে এবং পরবর্তী কয়েক বছরে আরো যাঁরা 'কবিতা'য় আত্মপ্রকাশ করলেন তাঁদের মধ্যে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মণীন্দ্র রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় ও বিমলচন্দ্র ঘোষের কথা মনে পড়ছে। কাগজটিকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছিল একটি সুখী পরিবার, পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্রের সাহায্যে যোগাযোগরক্ষার রীতিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, এ-কথা আপনার অজানা নয়।

আয়তনে, আকারে ও কবিতাগুচ্ছের উৎকর্ষে 'কবিতা'র প্রথম কয়েক বছরের ইতিহাস স্মরণীয়। এখন যাঁরা শক্তিমান কবি ব'লে অভিনন্দিত, তাঁদের প্রেষ্ঠ রচনা তো 'কবিতা'তেই প্রথম বেরিয়েছে। বিখ্যাত ও স্মরণীয়

কবিতাবলীর মধ্যে 'নীল দিন', 'নীলকণ্ঠ' (প্রেমেন্দ্র মিত্র), 'বৃত্তের আগে,' 'বনলতা সেন' (জীবনানন্দ দাশ), 'চেতন ভাকরা' (অমিয় চক্রবর্তী), 'চাঁদা টুংরি,' 'কেসিডা', (বিষ্ণু দে), 'মরক' 'মাঙ্গীমুখ', 'উপসংহার' (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত), 'চিন্তার সকাল', 'ছাদশহর যে আস্ত্রিকা', 'দময়ন্তী', 'বিরস যৌবন' (বুদ্ধদেব বসু) এবং সময় দেবের অনেক কবিতারই উল্লেখ করতে হয়। 'কবিতা'র তৃতীয় কি চতুর্থ বছরেই এলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'পদাতিক' কবিতাটি বেরুতেই তিনি তরুণ পাঠকসমাজে পরিচিত হলেন। এদিকে বিশিকান্ত আপনাকে কবিতা পাঠালেন পণ্ডিচেরি থেকে; 'কবিতা'র তৃতীয় বছরে তাঁর 'মহাযাত্রা', 'পণ্ডিচেরির ঈশাণ কোণের প্রান্তর' পাঠে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন অনেকেই।

'কবিতা'র পাশাপাশি আরো একটি সাহিত্যপত্রের নাম অনিবার্যরূপেই মনে পড়ে। আপনি জানেন, যে-সব তরুণ কবি সবেমাত্র 'কবিতা'য় প্রথম লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত 'পরিচয়' মাসিকপত্রেও (গোড়ায় ত্রৈমাসিক) তাঁরা অনেকেই স্থান ক'রে নিয়েছিলেন। 'পরিচয়ে'ই প্রকাশিত হ'লো আমার তৃতীয় কবিতা, একই বছরে এবং সেই সঙ্গে সমকালীন তরুণ কবিবন্ধুদেরও। একই সঙ্গে 'কবিতা' ও 'পরিচয়ে' লেখা তখনকার দিনে যে কী আনন্দের ও তৃপ্তির ব্যাপার ছিলো তা আজকের দিনে উপলব্ধি করা সহজ নয়। ছাত্রজীবনে, ১৯৩৭-৩৯ সালে, কলকাতায় এলে মাঝে-মাঝে যেতাম সুধীন্দ্রনাথের কাছে, তাঁদের কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের পুতুল-মূর্তিশোভিত হলদে রঙের বাড়িতে। নম্র, ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহার। সুধীন্দ্রনাথ নিজে কবি, কাব্যচর্চায় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সে-সময়ে তাঁর কাছ থেকে আমি ছাড়াও আরো অনেকেই নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন।

আপনার বন্ধু ও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক পরিমল রায়কে মনে পড়লো এই সূত্রে। 'কবিতা'র প্রথম ক'বছর গদ্য-কবিতা লেখার ঢেউ এসেছিলো। গদ্য-কবিতা যে কবিতাই এ-কথার সমর্থনে আপনি একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'কবিতা'য়। পরিমলবাবু কিন্তু ছিলেন গদ্য-কবিতার বিরোধী, এবং আমাকে একবা জানিয়েছিলেন যে গদ্য-কবিতা যে

অনায়াসলভ্য এটা প্রমাণ করবার জন্যেই তিনি লিখবেন 'কবিতা'য়। লিখেওছিলেন দুটি কি তিনটি। কিন্তু তারি সুন্দর। 'গ্রামোফোন' কবিতাটি মনে পড়ছে। পড়বার পর গদ্য-কবিতার উপর আমাদের বরং শ্রদ্ধাই বেড়ে গিয়েছিলো। সুন্দর ছড়া লিখতেন পরিমল রায়। আপনার চাইতে বেশি কে আর সে-খবর রাখে। 'কবিতা'র পৃষ্ঠায় 'রবিনাথও গদ্য লেখে' কবিতাটি ছড়ার ছন্দে লিখেছিলেন অজিত দত্ত। তার প্রত্যুত্তরে পরিমল রায়ও চমৎকার একটি ছড়া লিখেছিলেন।

শুধু কবিতাই নয়, 'কবিতা'র সমালোচনা-বিভাগও উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই সদ্য-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এখন মনে পড়ছে যে আপনি নিজে সে-সব আলোচনার প্রধান অংশ গ্রহণ ক'রে 'কবিতা'র ভিতর দিয়ে সমালোচনা-সাহিত্যের নতুন আদর্শ স্থাপন করেছেন। পাইকারিতার জন্যে আড়ালে হয়তো বন্ধুবিচ্ছেদের উপক্রম হয়েছে, কিন্তু কোনোক্রমেই সমালোচনার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করেননি ব'লে নিশ্চয়ই আপনি আজকের কাব্যপাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের অনূদিত ব্রাউনিংএর কবিতার ('ব্রাউনিং পত্রাশিকা') সমালোচনার দরুন তিনি আপনার উপর খুব রেগেছিলেন মনে পড়ছে। অদ্ভুত স্বভাব ছিল তাঁর, অজস্র কবিতা লিখতেন ছন্দোবদ্ধে ও বেনোবদ্ধে, গদ্যে ও পদ্যে। ঢাকা গভর্মেণ্ট কলেজে যখন তিনি অধ্যক্ষ হ'য়ে গিয়েছিলেন তখন আমরা নিতান্তই কিশোর। গম্ভীর মুখ দেখে তাঁকে ভয় করতুম গোড়া থেকেই, কিন্তু ১৯৪২ সালে তাঁর আলিপুরের নিউ রোডের বাড়িতে গিয়ে জেনেছিলাম তিনি আসলে প্রাণখোলা রসিক ও অমায়িক মানুষ।

মাঝে-মাঝে বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছে 'কবিতা'র। কয়েকটি সংখ্যা মূল্যবান প্রবন্ধের সংকলনরূপে প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রথম বিশেষ আষাঢ় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ এবং জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, সমর সেন, হুমায়ুন কবীর, লীলাময় রায় প্রভৃতির মূল্যবান রচনাবলীর উল্লেখ করতে হয়। এ ছাড়া, বিশেষভাবে স্মরণীয় রবীন্দ্র-সংখ্যাটি। অন্তত

এ ছোটো সংখ্যার পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হ'লে সাহিত্যপাঠক উপকৃত হবেন ব'লেই আমার ধারণা। কাগজ যখন পাওয়া যায় না, চারদিকে যখন দুর্যোগের ঘনঘটা সেই সময়ে প্রকাশিত হ'লো নজরুল সংখ্যাটি। বড়ো ক্ষীণ অবয়ব, বড়ো তাড়াহুড়োর ছাপ, তবু উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

'কবিতা'র সাধারণ সংখ্যাতেও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও আলোচনার অভাব ঘটেনি। আপনিই বেশি লিখেছেন, রবীন্দ্র-রচনাবলীর উপর আপনার আলোচনা ধারাবাহিক প্রকাশিত হওয়ার সময় বৈশিষ্ট্যের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। এ ছাড়া, আপনার আরো কয়েকটি প্রবন্ধ, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা' 'বর্নার্ড শ : এইচ. জি. ওএলস' 'প্রমথ চৌধুরী' 'সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য' প্রভৃতি মনে পড়ছে। অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে কিছুকাল আগে নরেশ গুহর কাব্যগ্রন্থকে উপলক্ষ্য ক'রে অমিয় চক্রবর্তীর মূল্যবান প্রবন্ধ এবং অবসেন্সু বসু, অরুণকুমার সরকার, লোকনাথ ভট্টাচার্য, নরেশ গুহ ও অপর্ণা চক্রবর্তীর গদ্যরচনা আমাদের ভালো লেগেছিলো।

এই দীর্ঘকাল পরে বিশেষভাবেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে 'কবিতা' পত্রিকার মতো একটি কাগজের অস্তিত্বের প্রয়োজন কেন এত বেশি। এই ত্রৈমাসিক আসলে তরুণ কবিসম্প্রদায়ের আশাভরসার স্থল এবং এখন পর্যন্ত বাংলার নবাগত ও তরুণতর কবিরা সকলেই এসে ভিড়েছেন 'কবিতা'য়। যুদ্ধকালীন সময়টাই ছিলো পত্রিকাটির পক্ষে সাংঘাতিক। কবিরাও অনেকেই তখন ভারসাম্য হারাতে বসেছিলেন। সুখের বিষয়, সে-রকম অবস্থা অধিককাল স্থায়ী হয়নি, তরুণ কবিরা আবার ফিরে পেয়েছিলেন তাঁদের সুস্থ মানসতা। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে নরেশ গুহ, অরুণকুমার সরকার, আনন্দ বাগচী, সুনীলচন্দ্র সরকার, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় এই সুস্থ মানসের চিহ্ন দেখে আশ্বস্ত হওয়া চলে। আপনি নিশ্চয় জানেন, ইদানীং কাব্যক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগীদের সংখ্যা আরো বেড়েছে এবং অনিয়মিত হ'লেও আরো তিন-চারটি কবিতার পত্রিকা চলছে।

'কবিতা' সম্পাদনার ফাঁকে ফাঁকে অন্য বিচিত্র সাহিত্যিক উদ্যোগেও আপনি

বিরত থাকেন নি। তারই ফলে কবিতাভবন থেকে বহু কাব্যগ্রন্থ এবং 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার প্রকাশ হ'তে পেরেছিলো। এই ষোলো পাতার চার আনা দামের সুমুদ্রিত বইগুলো তখন বেশ দেখেছিল আমাদের। আপনার 'এক পয়সায় একটি', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'উড়কি ধানের মুড়কি' অমিয় চক্রবর্তীর 'ঘাটীর দেয়াল' সমর সেনের 'খোলা চিঠি' ও কামাক্ষীপ্রসাদের 'সোনার কলাই'—এই ক-টি বইয়ের চেহারা চোখের সামনে ভাসছে।

'কবিতা'র এই কুড়ি বছরের জীবনে অনেক নতুন মানুষের সন্ধান পেয়েছি। কবিতা যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে অনেকজন কাব্যসাধনায় যাঁরা অসুখ দেখেছেন, এঁদের রচনায় যান্ত্রিকতার চিহ্ন আছে এবং এদের নতুন-নতুন কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হচ্ছে। কেউ-কেউ হলেন ফাল্গুনসন্ধ্যের ক্ষীণ পাখি, একটি কি দুটি রচনায় আশা জাগিয়েই সংসারের অতল গর্ভে তলিয়ে গেলেন। আবার অনেকে বয়সসন্ধির অনিবার্য ধাক্কা কাটিয়ে আর কিছুতেই অগ্রসর হ'তে পারলেন না। এ-রকমই হয়, এই নিয়ম। সাহিত্যিক যাঁরা তাঁর আত্মসাধনায় যান্ত্রিকতার অঙ্কে, উড়ে এসে জুড়ে ব'সে দু-চারটি চমকপ্রদ রচনায় যারা যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভের দাবি করেন, তাঁরা ভ্রান্ত। অবশ্য অকালমৃত্যুজনিত যাঁদের তিরোধান তাঁদের কথা আলাদা ; তাঁদের সাহিত্যিক সম্ভাবনার কথা পাঠকসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। 'কবিতা'র গোড়ার দিকে যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, পরিমল রায়, জীবনানন্দ দাশ আর নেই ; হেমচন্দ্র বাগচী পীড়িত, সমর সেন স্তব্ধ। আমরা যাঁরা মধ্যতিরিশ পেরিয়ে এসেছি তাঁদের অনেকেই সংসার ও উদরান্ন-সন্ধানের সংগ্রামের ফাঁকে-ফাঁকে অতি কষ্টে যান্ত্রিকতা বজায় রাখছি। তরুণতর যাঁরা আজ লিখছেন তাঁদের মধ্যে সমর সেন বা সুভাষের প্রথম কবিতার দীপ্তি ও প্রতিশ্রুতি কোথায় ?

দীর্ঘকাল ধ'রে সম্পাদনার কাজই করছেন না, আপনি নিজেও অজস্র কবিতা যে লিখতে পারছেন এতে আমি নিজে খুব আনন্দিত। বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তীও এখনো অনেক লিখছেন, কাব্যরসিক মাত্রেই এর জন্য কৃতজ্ঞ।

রবীন্দ্রনাথ দত্ত মাঝে কয়েক বছর নীরব থাকার পর সম্প্রতি আবার উত্তোলী হয়েছেন। বাংলা কাব্যক্ষেত্রে অগ্রণী এই কবিগোষ্ঠির কাব্যধারা পরবর্তীদের অনুপ্রেরণার উৎস হ'য়ে উঠেছে বলতে পারা যায়। প্রসঙ্গত, যে-অল্প ক'টিনি প্রতিষ্ঠান আধুনিক বাংলা কবিতার সুদৃশ্য সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁদের প্রচেষ্টাও অভিনন্দনযোগ্য। কবিতাভবন ও ভারতীভবনের পরে সিগনেট প্রেস এ-কাজে অগ্রণী হয়েছেন, সম্প্রতি নাভানা ও এম. সি. সরকার।

চিঠি দীর্ঘ হ'য়ে যাচ্ছে, নিবৃত্ত হওয়া দরকার। সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে উদ্ধার ক'রে লিখছি, জানি না তথ্যের কোনো ভুল হ'লো কিনা। 'কবিতা'র পুরোনো সংখ্যাগুলো মনে রেখেই বলছি, হাল আমলে বাংলাদেশে কবির সংখ্যা যদিও বাড়ছে ভালো রচনার সংখ্যা সেই তুলনায় বাড়ছে না। তবু দুর্দম আশা, ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের দেশে আবার হয়তো কখনো কাব্যের সোনা ফলবে।

বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া — কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অমিত্রাক্ষর ছন্দ

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু,

আশ্বিন সংখ্যা 'কবিতা'য় দীপঙ্কর দাশগুপ্ত এবং নরেশ গুহর অমিত্রাক্ষর বিষয়ক আলোচনা প'ড়ে একটা কথা মনে হ'লো। আমাদের কল্পোলকল্পনার সাহায্যে কবিদের আমরা বড়ো বেশি সম্মানদান করছি। যা প্রাপ্য তা তো তাঁদের দিচ্ছিই, প্রচুর সঙ্গে, কৃতজ্ঞতা সঙ্গে ; কিন্তু যা তাঁরা নিজেরাও দাবি করবেন না, তা তাঁদের উপর চাপাবার জন্য অনর্থক উৎসাহ কেন ?

সোজাসুজিই ব'লে নেওয়া ভালো, ছড়ার ছন্দ এবং অমিত্রাক্ষরের মধ্যে পার্থক্য টানার প্রয়াস, যেমন দীপঙ্কর দাশগুপ্ত করতে চেয়েছেন, আমার বিবেচনায়

সমর্থনযোগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ যে-তারিখ থেকে তাতে লিখতে শুরু করলেন, সেদিন থেকে ছড়ার ছন্দ 'সংস্কৃত', 'পরিমার্জিত' হ'য়ে স্বরবৃত্ত রূপ পেলো : এ স্বরূপের প্রবাহে দেখলে আমোদের উদ্রেক হয়। যেহেতু ছন্দ একটি কাঠামো মাত্র—তার কোনো অবয়ব নেই—পুরোনো ছন্দের কোনো পরিমার্জনা সম্ভব নয়। হয় কেউ সেই ছন্দ ব্যবহার করবেন, নয় তো নতুন কোনো ছন্দ উদ্ভাবন করবেন ; এর অন্তর্বর্তী স্থান অনুপস্থিত।

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত এবং নরেশ গুহ দু'জনেই ধ'রে নিয়েছেন চার মাত্রার কম বা বেশি পর্ব সংযোজিত হ'লেই স্বরবৃত্তের চরিত্র ব্যাহত হবে। কিন্তু স্বরবৃত্তের অলিখিত অনুশাসন সম্ভবত মাত্র এইটুকু যে চার মাত্রার উচ্চারণের উপযোগী সময়ের মধ্যে পর্বটিকে স্থাপন করতে হবে। চোখের বিচারে কোনো পর্ব পাঁচ, ছয়, সাত, আট, যত মাত্রাই হোক না কেন ক্ষতি নেই, পঠনকালে এমন এক বিদ্যুৎ-সংশ্লেষণ ঘটবে যে চার মাত্রার বা আন্তাবিক উচ্চারণ-সময়, তার আয়তনের মধ্যে পর্বটি নিজের স্থান ক'রে নেবে, ঢেকে যাবে মাত্রাধিক্য-দোষ। অন্য পক্ষেও তেমনি, আপাতবিচারে যা দুই কি তিন মাত্রার পর্ব, তাকেও টেনে প'ড়ে চার মাত্রার মর্যাদা পাইয়ে দিতে হবে। যাকে আমরা স্বরবৃত্তের সুর বলি—লৌকিক ছন্দের দোলা—তার একটি প্রধান উপাদান ধ্বনির এই অহরহ সংশ্লেষণ-সম্প্রসারণ। উচ্চারণে কখনো দ্রুত তীক্ষ্ণতা, ঠিক পরক্ষণেই হয়তো বা আহ্লাদে এলিয়ে-পড়া মাত্র দু'বর্ণমণ্ডিত কোনো পর্ব। ভেবে দেখতে গেলে স্বরবৃত্তের আনন্দই হচ্ছে প্রবাহের এই উচ্চাবচতায়। প্রমাণ-স্বরূপ ছেলে-ভুলোনো ছড়া থেকে অজস্র উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে ; এলোমেলো যে-কয়েকটি মনে এলো নিচে তুলে দিচ্ছি :

বড়ো মরাইয়ে হাত দিয়ে
ছোটো মরাইয়ে পা দিয়ে
আয় ঘুমিয়ে জলমলিয়ে

এপারেতে লঙ্কা গাছটি
রাঙা টুকটুক করে

বর্ষমানের রাস্তা ঘাট
বৃষ্টি ব'লে কচ ক'রে কাটি

তোমায় শান্তড়ি ব'লে গিয়েছে
যেমন কোট সে

চিহ্নিত প্রথম ছ'টি পর্বই অন্যূন পাঁচ মাত্রার, অথচ চারমাত্রার সীমায় উচ্চারণ করতে হচ্ছে।

অমিয় চক্রবর্তীর 'বৈদান্তিক' কবিতাটি আমি অবশ্য পাঁচমাত্রায় পড়েছি। (নরেশ গুহ কোথায় ঠেকে গেলেন বুঝতে পারছি না : 'প্রকাণ্ড বন প্রকাণ্ড গাছ' তিনি যদি চার মাত্রায় পড়তে পারেন, তাহ'লে একটু টিল দিয়ে পাঁচ মাত্রায় পড়তে অসুবিধে কোথায় ?) তবে পাঁচমাত্রিক (এমন কি ছ'মাত্রিক পর্যন্ত) অনেক কবিতাই, কোনো নিয়মপাত না-ঘটিয়েও, স্বরবৃত্তে প'ড়ে ওঠা যায়। সুতরাং নরেশবাবু যদি 'বৈদান্তিক' স্বরবৃত্তে পড়তে চান, আপত্তি তুলবো না ; এক্ষেত্রে 'বেরিয়ে এলেই' পর্বটিকে চারমাত্রার বিস্তারের মধ্যে ধরতে তিনি যদি অপারগ হন, সে-ভাবনা তাঁর একার। কিন্তু ঘোরতর আপত্তি তুলতে হয় যখন দেখি এই অসামর্থ্যের প্রেরণাবশত এটা ব'লে বসেন যে 'বেরিয়ে এলেই' চারমাত্রার ছন্দের শরীরে পাঁচমাত্রিক পর্বের সচেতন মিশোলের উদাহরণ এবং, আরো, অমিয় চক্রবর্তী এই প্রয়োগের মারফৎ নতুন এক পরীক্ষার রাস্তা খুলে দিয়েছেন।

উপরে বাংলার লৌকিক ছন্দ থেকে যে-ক'টি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় স্বরবৃত্তে পাঁচমাত্রার (কিংবা আরো বেশি) ব্যবহার অভিনব তো নয়ই, বরঞ্চ স্বরবৃত্তের অন্যতম প্রধান চরিত্রলক্ষণ। তাই নরেশ গুহ-র উক্তি ('চার আর পাঁচ মাত্রা ছন্দ এ-ভাবে মিশিয়ে অভিনব একটি বাংলা ছন্দের সূত্রপাত হয়েছে এখানে') এবং দীপঙ্কর দাশগুপ্তের মুগ্ধতাবোধ ('স্বরবৃত্তে চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব কৌশলে ব্যবহার ক'রে তিনি [অমিয় চক্রবর্তী] যে নতুন এক ধ্বনিস্পন্দনের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, এটা তাঁর বিস্ময়কর প্রতিবোধের পরিচয়'), দুটোই আমার কাছে সমান ভিত্তিহীন ব'লে

মনে হয়। আসলে বাংলা ভাষায় যিনিই ছন্দে কবিতা লিখেছেন, কোনো-না-কোনো সময়ে তাঁকেই স্বরবৃত্তে চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব প্রয়োগ করতে হয়েছে; এমন কি রবেনবাবু নিজে পর্যন্ত তা করেছেন:

'আজকে আমার মন ছুটে যায় তোমায় নিয়ে ঢেউয়ের হুদে'

কেউ-কেউ হয়তো এ-কবিতা পাঁচমাত্রায় পড়বেন (ছ'মাত্রায় পড়া যায় না, 'তোমায় নিয়ে'-র মাত্রাস্বতন্ত্রতার জন্য); আমি কিন্তু স্বরবৃত্তে প'ড়ে ঢের বেশি আরাম পাই, এবং চারমাত্রার সমস্বগতিকে 'ঢেউয়ের হুদে' উচ্চারণ করতে পারি হোঁচট না-খেয়েই।

রবেন গুহ প্রশ্ন তুলেছেন

'হ'চার পিপে জমিয়ে রক্ত হঠাৎ ভোরে হলো অদৃশ্য'

স্বরবৃত্তের নিয়ম মেনে কী ক'রে পড়া যেতে পারে। আমি বলবো 'হ'চার পিপে এবং 'হঠাৎ ভোরে' পড়তে যতটা সময় ব্যয়িত হচ্ছে, 'জমিয়ে রক্ত' এবং 'হলো অদৃশ্য'-র জন্য তার বেশি সময় দেওয়া যাবে না; দিতে গেলে স্বরবৃত্তের মজাই নষ্ট। ঐ একই কবিতার একটু বাদে

রাগা রেঁধে কান্না কেঁদে সকলের প্রাণ প্রাণে বেঁধে
দিদিঠাকরুন গেলেন চ'লে

'রাগা রেঁধে' যে-সময়ের আয়তনে প'ড়ে নিতে হচ্ছে, ঠিক ততটুকু সময়েই 'সকলের প্রাণ' এবং 'দিদিঠাকরুন'ও উচ্চারণ করতে হবে। জানবো না এখানে ছন্দ নিয়ে কোনো নতুন পরীক্ষা আছে।

ব্যাঙ্কক, থাইল্যাণ্ড অশোক মিত্র

সম্পাদকীয় মন্তব্য

শ্রী অশোক মিত্রের পত্রটিতে অনেক ভাববার কথা আছে, কিন্তু তিনি স্বরবৃত্তের প্রকৃতির যে-বর্ণনা দিয়াছেন তা মেনে নেয়া অসম্ভব। চার মাত্রার উপযোগী সময়ের মধ্যে তিন মাত্রা পড়া যেতে পারে, হয়তো বিশেষ ক্ষেত্রে পাঁচ বা হোক সাড়ে-চার, কিন্তু দুই বা ছয় কদাচ নয়—সাত, আট প্রভৃতির কথা ছেড়েই দিচ্ছি। পড়া যায় না, তার কারণ প্রাকৃত জগতের পদ-তথ্যগুলির অঙ্কের গোঁজামিল : চার জনের জায়গায় পাঁচজন ঠেসে-ঠুসে বসতে পারে, বা তিনজনের পক্ষেও ছড়িয়ে ব'সে আসনটা ভরিয়ে দেয়া সম্ভব, কিন্তু মাত্র দু-জন হ'লে অপূরণীয় ফাঁক থেকে যায়, আর দু-জন হ'লে অন্য আসনের ব্যবস্থা না-ক'রে উপায় থাকে না। স্থানের সঙ্গে আমাদের দেহের যা সম্বন্ধ, সময়ের সঙ্গে স্বরেরও তা-ই ; তফাৎ এই যে সময় আরো ক্ষমাহীন ; যেমন সে অধিক তার ঘটতে রাজি হয় না, তেমনি শূন্যতাও তার পক্ষে অসহ্য। অত্যন্ত বেশি, আর অত্যন্ত কম, এ দুটোই সেখানে অচিন্তনীয় ; আমাদের জিহ্বার ও যন্ত্রযন্ত্রের এমন কোনো কসরৎ নেই যার সাহায্যে, স্বরবৃত্তের বিধান স্বীকার ক'রে নিয়ে, চার মাত্রার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে দুই বা ছয় মাত্রা উচ্চারণ করা সম্ভব।

পুরোনো ছন্দের পরিমার্জনা বিষয়ে পত্রলেখক যা বলেছেন, তারও প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। এই পরিমার্জনা ও পরিবর্তন—শুধু যে সম্ভব তা নয়, যুগে-যুগে কবিদের নিত্যকর্ম। এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কোনো-এক সময় (ধরা যাক 'কবিকঙ্কণ'-এর সময়) থেকে বাংলার লৌকিক ছড়ার ছন্দ রবীন্দ্রনাথের হাতে সুসংস্কৃত হ'য়ে স্বরবৃত্তে পরিণত হ'লো ; তাঁর নির্দিষ্ট চার মাত্রার পর্বকে—মুখে আমরা যে যা-ই বলি—পরবর্তী কোনো কবি কাজের বেলায় উল্লেখ্যভাবে লঙ্ঘন করতে পারেননি। (প্রসঙ্গত, নরেশ গুহ-র 'আজকে আমার মন ছুটে যায় তোমায় নিয়ে ঢেউয়ের সুরে' পংক্তির প্রত্যেক পর্বে ঠিক-ঠিক চার মাত্রাই আছে—শুধু ফাঁকগুলো ভরিয়ে দেয়া হয়েছে ব'লে পত্রলেখকের ধরতে ভুল হ'লো।) এ-বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র সেন ও আরো কেউ-কেউ অনেক আলোচনা করেছেন ; এ নিয়ে আজকের দিনে তর্কের কোনো অবকাশ নেই।

গ্রাম্য ছড়ার বন্ধুরতা আমাদের কানে যে এখনো ভালো লাগে তার কারণ ছেলেবেলার স্মৃতি, নূতন জিনিশের প্রতি সেন্টিমেন্টাল মমত্ববোধ, এবং, হয়তো, খাদ-বদলের ক্ষণিক উত্তেজনা। উপরন্তু, পত্রে উদ্ধৃত উদাহরণগুলোর মধ্যে 'ছাড়া টুকটুক'-এ বস্তুত চার মাত্রার বেশি নেই, 'বড়ো মরাইয়ে' 'ছোটো মরাইয়ে'—'ইয়ে' যুক্তস্বর ব'লে—বড়ো জোর সাড়ে-চার পাওয়া যায়, এবং 'কচ ক'রে কাটি' আর 'তোমার পাওড়ি'—মানতেই হয়—আধুনিক কানে অসহনীয়, এবং আধুনিক কবিতার কল্পনাতীত। অমিয় চক্রবর্তীর 'বৈষাত্রিক' কবিতায় যেহেতু ভিন্ন-ভিন্ন পর্বে তিন, চার ও পাঁচ মাত্রা পাওয়া যাচ্ছে—এবং কবিতাটি মোটের উপর নিশ্চয়ই সুখশ্রাব্য হয়েছে—তাই একে মিশ্র ছন্দের উদাহরণ ব'লে না-মানলে অন্ত নানারকম ভ্রান্তির ভয় থেকে যায়। (ছন্দের দিক থেকে এর খুব কাছাকাছি 'আনমনা গো আনমনা', কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনাটি, শেষ পর্যন্ত, অনেক বেশি নিয়মিত।)

'হয় কেউ সেই ছন্দ ব্যবহার করবেন, নয় নতুন কোনো ছন্দ উদ্ভাবন করবেন : এর অন্তর্বর্তী স্থান অনুপস্থিত'—এ-কথার উত্তরে আমাকে আরো একটু লিখতে হ'লো। যতদূর দেখা গেছে, পুরোনো পদকর্তা ও মাইকেলের পরে, ছন্দ-বিষয়ক সবগুলো আবিষ্কার রবীন্দ্রনাথ ক'রে গেছেন; এর পরে আর কোনো আবিষ্কার সম্ভব নয়, তাই নতুন ছন্দও সম্ভব নয়। কিন্তু তবু উদ্ভাবনার অবকাশ ফুরিয়ে যায়নি, বহু কর্তব্য র'য়ে গেছে সেদিকে—চিরকালই থাকবে—তারই নাম পুরোনো ছন্দের পরিবর্তন ও পরিশোধন, যার দ্বারা প্রত্যেক কবি তাঁর মৌলিক প্রতিভার চিহ্ন রাখতে পারেন। উদাহরণত, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও মাইকেলের পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে, এবং রবীন্দ্রনাথের পরে সমকালীন কবিদের হাতে, বাংলা পয়ারের এমন সব পরিবর্তন ঘটেছে যাকে অন্যায় বলা যায়, অথচ তার মূলসূত্র এখনো এক ও অবিচ্ছিন্ন। ক্ষুদ্র কবিরা 'নতুন ছন্দ' বানিয়ে তোলার চেষ্টা করেন, ভালো কবিদের লক্ষ্য থাকে পুরোনোকে নতুন ক'রে গড়ার দিকে। —সু. ম.

সাতটি এপিগ্রাম

বিষ্ণু দে

কবিতা-সর্কার বা সরকার

সে শুধু চাটিই চেনে, ঘাঁটে ধনাধন পদপাতে
কবিতার নাড়ি ছেঁড়ে, ঘরো ছেঁড়ে সেও তবো যাতে,
স্মাহতে চাটির স্মৃতি, আবাল্য সে টিক্‌টিক্‌-ধরদার
ছন্দ মিল শুনে ঘরে, আবেদার কবিতা-সর্কার ॥

বাগেতর

বাগেই ছেলেম দেবী বাক্‌দিব্যের প্রসাদে সদয়া,
বাগে তাঁর পক্ষপাত, জীববাত্রী বাগ্‌দেবী বরদা
ত্রিনয়নী ভ্রূকুটিতে মারেন সরোষে বাগেতরে,
অবশ্য বোঝে না মূঢ় বাগেতর কখন যে মরে ॥

এলার্জি

অবাক সবাই ভাবি কী অধ্যবসায়,
বাক্‌দেবীকে ক'রে দিলে মুহুর্‌ মশায়।
কীর্তিনাশা লেখা ছাপে কীর্তির আদ্যক্ষিতে,
জানে না বাক্‌দেবী ছুঁই তারই এলার্জিতে ॥

অমুকবাবু

কলকাতায় সুখ নেই, ঘরে পথে ভিড় ;
অর্থাভাব চিরস্থায়ী ; আজ্ঞাতেও চিড় ,
নিত্যসঙ্গী টাইফএড, বসন্ত, কলেরা :
এবং অমুকবাবু, দুর্ভোগের সেরা ॥

* সরকার সরকার হয়ে অবশ্য হ'লে ভুল, তবুও সর্কার লেখাই নিরাপদ।

সংস্কৃতি

কোথা পুত্তলিকা ? ভোজবাজিতে কমাল
দিকে দিকে সংস্কৃতির সাজে বারশাল।
শিল্পী সাহিত্যিক সব পালোয়ে বাজিয়ে,
নরহরি কেঁদে যান ত্রাহি রে ত্রাহি রে॥

পাঁচ সিকে

সিদ্ধান্ত যেই না হল, বিরাট খবর
খোলা হল, খবরিও যাচ কি সত্বর,
লক্ষ লক্ষ টাকা গেল, এদিকে ওদিকে,
অধিকর্তা ভিন্ন যেন ঝুলে পাঁচ সিকে॥

পেনসন

এ চাকুরি ও চাকুরি তবু কর্তা হন,
যাহিনার পরিবর্তে চাই না পেনসন।
শুনেছি বেকার সবে পরলোকে স্বর্গে,
কর্তায় নরকে লোভ, কমপক্ষে মর্গে॥

কবিতা
চৈত্র ১৩৬২
বিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
ত্রয়িংশ সংখ্যা ৮০

দুটি কবিতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

তীর্থপরিক্রমা

এখনও শেষ না তোলা, যদিও এ-দেশ স্নিগ্ধ নয়
সুবর্ণধারায় : তাম্রতলে সিক্ত মাটি, তবু ক্ষয়
এবং পিপাসা এখানে সর্বতোব্যাপ্তি ; অধিত্যকায়
গিরি কদাচিৎ তুষারকিরীটী বটে, কিন্তু তার
সান্নিধ্যে প্রশান্তি নেই—যেন অতিজীবিত ক্ষত্রিয়,
বাহুবল গত জেনে, তপোবিল সাধে, অন্তরীণ
প্রতিহিংসা শেষে যাতে অসিদ্ধ না থাকে ; শুধু শিলা,
বালু শোষিত নদীর গর্ভে বন্যার প্রত্যাশী ; নীলা
দিনে, হীরক নিশীথে—আভরণে এই যা প্রকারভেদ,
বর্ষর আকাশ নহেৎ বিরত নয়, অনির্বেদ
তথা নির্বিকার ; এবং নগরে, গ্রামে, বাহিরে ও
ঘরে আহবেরই উত্তরাধিকার যেহেতু অক্ষেয়,
তাই উহ্য অধিবাসে উদ্বিগ্ন মানুষ, অলঙ্কৃত
সৌজন্য সত্ত্বেও, মৎসর অনুষঙ্গে, ব্যবহিত
অথচ উদ্গ্রীব অন্তত সংসক্ত নৃত্যে।

লোকান্তরে

বুঝি, সম্ভবত অন্যত্র করেও, পুষ্পিত প্রান্তরে
পেতেছিলুম আমরা যে-অস্থায়ী যৌথরাজ্য, তার

চৈত্র ১৩৬২

অধিষ্ঠাতাদেবে ছিল প্রজাপারমিতা ; কি প্রাকার,
কি পরিধা সে-রাষ্ট্রকে ঘেরেনি কখনও : মুক্ত পথে
ছায়াপথ ক্ষিতিজের ডাক, উর্ধ্বশ্বাস মনোরথে
অবিচ্ছিন্ন নিরন্ন এষণা, সহচর স্রোতস্বিনী
অন্তরে মুখর, আগন্তুক অশ্রবাণী ও অরণ্যি
নিঃস্বও যেখানে, তার পরে দুর্বিষহ ঔদ্ধত্য
অন্ধ অবসাদ। কিন্তু চক্রচর ব্যাল : দুরাসুর
বিশ্বে সম্বল, সম্পূর্ণ পৃথিবী উদর, উর্ধ্ব
একাধারে, ধর্মে, কর্মে শুভাশুভ নিত্য নিরন্তর—
তা আমার সম্বরণীয় মানেনি, মানিনি আমি ;
ফলে আমাদের নিয়তি অগস্ত্যযাত্রা, অনুগামী
হত বা বিস্মৃত কপিঞ্জলসার বনে। তবু বলি—
এখনও গেল না তোলা : তীর্থরজে রক্তের অঞ্জলি ॥

ক্ষুধা

সবুজের স্বপ্নগ্রাম ফাল্গুনের রৌদ্রে হিরণ্ময়,
সংগত সে-ঐকতানে অদম্পৃক্ত আমের মুকুল ;
দূরত্বে চিত্রিত লাল, জনপদবধূর দুকূল
সংবৃত কূপের সাক্ষ্য : অন্তরাত্মা পর্যন্ত তন্ময়।

সে-চির মুহূর্ত এই, বিশ্বরূপ যার ব্যাপ্ত মুখে,
যার সঙ্ঘেয় ও সখ্যে ত্রৈত্য থেকে মুক্ত ক্ষণবাদী :
শস্যশ্যাম কুরুক্ষেত্রে অবিচল নিত্যের সমাধি ;
অনুপূর্ব সম্রাটেরা ধূলিসাৎ তাল ঠুকে ঠুকে ॥

পরিপূর্ণ বর্তমান : নাস্তি সুখ তারই অংশভাক ;
ভূত অনুনার স্মৃতি, উপস্থিত ঘন্ত্র ভবিষ্যৎ ;
পরিপ্রেক্ষিতের বশে অনেকান্ত প্রত্যক্ষ জগৎ ;
দেশান্তর তাবচ্ছেদি ; কৌক, কবি অতিথ, অবাক ॥

তবু অনুশোচনায় কেন প্রতিধ্বনিত ক্রন্দসী—
সূর্য আঁকে মরীচিকা, মরুরাবে মরায় চন্দ্রমা,
বিগত ইন্দ্রিয় প্রেতে ঝঙ্কৃত অসম্ভূত অমা ?
কী দেখে বিগতরাগে ফিরে ফিরে আসিছে প্রেয়সী ?

শক্তির অব্যয়ীভাবে মন্ত্র নয় তবে কি সংসার ?
বিকারের উপরে কি বিনষ্টিও সৃষ্টির নিয়তি ?
আগামী ও অতীতের প্রতিযোগে মথিত সন্ততি
আপাতমধুর বিষ নিরন্তর করে কি উদ্গার ?

তাই কি নিমেষমাত্র সর্বময় সংবিদের আয়ু,
এবং কালের গতি প্রভু ব'লে, তাকে সে চেনে না ?
কিন্তু অবচেতনায় পরস্পর সম্ভোগের বেদনা
আকর্ষিত হতে থাকে : দায়ভাগী জাতিস্মর আয়ু ॥

সান্টা মারিয়া দীপে

অমিয় চক্রবর্তী

"অ্যান্টনি সবুজ ছিজে গির্জের মাঠের তলে আছে।"

(গাঁয়ের লোক : ১) "এতদিনে পেয়েছ আরাম ?
পাথরে আজি কি লাগে উঁচুতে আরক নিজ নাম,
হাটির অতটা নিচে হক'র শোনো কি উঠলো গানে ?
অ্যান্টনি, ওরা তো বলে গভীরে পেয়েছ স্বর্গধাম।"

(গাঁয়ের লোক : ২) "উপরে হাঁটতে যদি দেখতে দৃষ্টির যেন খোলা
পুরোনো গ্রামের রাস্তা, দক্ষিণে তোমার চেনা নদী
যেখানে সংসার করতে, ডুবুরি নীলচে ঢেউ তোলা,
বাস-এ চ'ড়ে যেতে হাটে, বাজি হ'তে দূরে ঘুরতে যদি ;
প্রতিবেশী কানাতেজ বিক্রি করে ঠাণ্ডা কোকা-কোলা।"

(বিধবা বোন) "অ্যান্টনি, যা-কিছু বলো, সোনার সাধ্য কি আমাদের ?
তবু মনে হয় আমি ঠাট্টা হাসি, নম্র মুখে দেখি
সলজ্জ দূরের সেই, কাজে মগ্ন দৃষ্টি মেলে কের
কী যেন হঠাৎ খোঁজো—চমনা টেনে, যেমন আগের—
কিন্তু সব দেয়া-নেয়া কোথায় আজকে যায় রেখি ?"

(বিদেশী পথিক বন্ধু) "পঞ্চভূতে রেখে হাল্কা সারীর চৈতন্য, আজি চাও
আরোই আত্মীয় স্পর্শ ; এদিকে সংসার ফলে ফুলে
সমাধি ধর্মের শ্লোকে তোমাকে দুঃখের দূর কূলে
অক্ষয় ওপারে রাখে, সান্ধ্যধ্বনি মন্ত্র ওঠে দুলে
ঘণ্টার গম্ভীর স্বরে, অ্যান্টনি, অ্যান্টনি, শুনতে পাও ?"

(বন্ধুপত্নী) "তোমাদের শিশু আগে গিয়েছিল, শোনা তারি পাশে
পাবে তোমার এই—তৃতীয় স্থানের সূত্র যার
এসেছে সে মার্গারিটা : শিশু স্বামী তর্পণের ভার
নত হ'য়ে রোজ মানে, কে বা জানে কিসের আশায়
মুখে তার ছলছল দীপ্তি লাগে যৌন প্রার্থনার ॥"

(সব ঘর গির্জে ঘণ্টা)

(সকলে) "অ্যাউনি, তুলিনি আমরা, গির্জে ছেড়ে চলি যদি ঘরে ;
পরে শেষ-ঘরে যাওয়া, তফাৎ কেবল আগে-পরে ॥"

ঘরের আড়ালে শ্রুতি

বিষ্ণু দে

আমার বাহুতে ভর দিয়েও যে পাহাড়ে
যেতে পেরেছিল তর,
আজ শুনি সেই পাহাড়ের ঘন শিখরে
একলা বেঁধেছে বাসা।

মনে আছে সেই উপল-শিলায় ঝরনার গলা ধরা,
নিচুবাকে বালি-স্রোতস্বিনীর সোনা?
আজ নাকি তুমি একলা চূড়ায় সোনা-ঝলা ফেলে দিয়ে
গেঁথেছ সূত্রে একটি তপ্ত হীরা?

কালো কষ্টিতে আলোর শাণিত নগ্নতায়
হিংস্র বনের ছায়ায় মুখর দিনগুলি
কোন বিরাগের নৈঃসঙ্গ্যের অন্ধকারে
মেলালে, সে কোন তারায় পেয়েছ প্রহরী?

তাহলে রইব ঘরের আড়াল শ্রুতি,
সাতটি সুরের তলায় শাদা—না কালো?
অনুপস্থিতি দিয়ে ঢেকে রেখে দেব
সেদিনের চেনা হরিণীর চোখ দুটি?

যেন তাই হোক, তুমি থাকো একা সূর্যে,
আমি অদৃশ্য বাষ্পের নীলাকাশ।
তোমার হাওয়ায় চিতার দীপ্ত গর্ব,
আমি রই বাকি পশুপাখিদের কান্না॥

কবিতা
বর্ষ ২০, সংখ্যা ৩

দুটি কবিতা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

মাল্লাদের গান
(ট্রিওলেট-গুচ্ছ)

এখানে ডুবেছে জাহাজ ঢের
কেনিয়ে ঘুরছে চরকি জল
টানা পাড়ি দিতে পাট যে টের
এখানে ডুবেছে জাহাজ ঢের
ছড়ানো এখানে কুটিল ফের
সাবাস, মাল্লা, সজোরে চল!
এখানে ডুবেছে জাহাজ ঢের,
পেতেছে ফাঁদ এ-ঘুর্ণি জল।

কতো সদাগরি নৌকো লুঠ
হয়তো করেছে ওদের ঘল।
চালিয়েছে দাঁড় শক্ত মুঠ
কতো সদাগরি নৌকো লুট
ক'রেই দিয়েছে তুফানে ছুট,
দিয়েই পেয়েছে ধরিয়া-তল!
কতো সদাগরি নৌকো লুট
হয়তো করেছে ওদের ঘল।

৩

সাড়ে-তিন হাতও জোটেনি কুঁই
কাফন নামালো তারা কোথায় ?
এ খুন-পানি তো আমরা ছুঁই
সাড়ে-তিন হাতও জোটেনি কুঁই
কবে হয়তো বা আমরা শুই
এখানে ; তাদেরি পাশে কোথায়।
সাড়ে-তিন হাতও না পেলে ভুঁই
কাফন নামাবো বলো কোথায় ?

৪

তারার জনম, জলেই বাস ;
বিবি ঘরে ওরা পরদেশে।
মেটে না তাই তো পিরিতে আশ
তারার জনম, জলেই বাস—
নীলে নীলে বিষ বুকের শ্বাস ;
ঘুনে বিষ মেশে ভালোবেসে।
শুভরে কওয়ানি ; জলেই বাস—
যা কিছু পিরিত পরদেশে।

৫

প্রবাল হয়েছে তাদের হাড়
বার-দরিয়ার লবণ-জলে !
ডুবে-ডুবে জাখে ডুবো-পাহাড়
প্রবাল হয়েছে তাদের হাড় !
সবলে আমরা যাই যে দাঁড়
তাদেরি ছুছুড়ে ঠোকায় চ'লে।

এইখানে এসে তাদের হাড়
প্রবাল হয়েছে লবণ-জলে।

শুক্তি হয়েছে তাদের চোখ
অশ্রু হয়েছে মুক্তো ঠিক!
কবিনে আমরা কাজর শোক—
শুক্তি হয়েছে তাদের চোখ!
এখানেই চাপে ঝড়ের ঝোঁক
এখানে এলেই হারায় দিক।
শুক্তি হয়েছে তাদের চোখ
অশ্রু হয়েছে মুক্তো ঠিক!

জীবন-ক্লান্ত

মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ু—ক'টি পদার্থ মূল :
—এ থেকেই যত জড় জন্তুর তাদের আকৃতি পেলে···
বহু সন্ধানে মিলেছে সূত্র করেননি তিনি ভুল।

সিসিলির রাজমুকুট তুচ্ছ লোষ্ট্রের মতো ফেলে
জীবন-ক্লান্ত এম্পিডোক্লিস উঠে চললেন ঠিক
অগ্নিগিরি কি ডাক দিলো তাঁকে ধোঁয়ায় পতাকা মেলে?

এটনা অগ্নিগিরির শিখরে বিজ্ঞ দার্শনিক
উদাস চক্ষে দৃষ্টি ছড়ান চারদিকে, আর ভাবেন
মিছে সব, শুধু সত্য চারটি পদার্থ মৌলিক

চৈত্র ১৩৬২

কিসে গড়া এই শরীরটা তিনি আর কত অগ্নিলাবেন ?
ভেদ আর ঘৃণা এ দুই শক্তি নিয়ত জগৎ চালায়—
ভাবতে-ভাবতে জ্বালামুখী গিরি-গহ্বরে তিনি নাবেন।

মৃত্যু ? সে তবু মিথ্যা ধারণা···বললেন জোর গলায়—
মরে না কিছুই ফিরে আসে কেবা অনিত্য পদার্থেই···
জগতের এই নিয়ম, এ থেকে কার বা সাধ্য পলায়।

চিন্তা করলে মরণে তো কই বিভীষিকা কিছু নেই—
ঘরে ফেরবার আনন্দ আছে : অনুভূতিদের ক্ষয়
সইতে পারে না নির্বোধ যত নরনারীমাত্রেই ;

অনুভূতিদের দাস তারা তাই মৃত্যুকে করে ভয়।
আমার কী ভয়, এই সৃষ্টির তত্ত্ব-সারাৎসার
যদি বুঝে থাকি, অনুভূতিগুলো ক'রে থাকি যদি জয় ?

বুক তবু কাঁপে, দুর্মর কেন জীবনে সংসার ?
ঘুমন্ত বাষ্প গর্জন করে প্রখর অগ্নিতাপ
বারুদগন্ধে কলুক নিষেধে দেহটাকে অন্ধকার।

জুড়োবে এবার ঘৃণায় প্রেমের যত জ্বালা সন্তাপ
ফিরে যাই আমি, কোলে তুলে নিক জননী চন্দ্রমা।
—এই কথা ব'লে জ্বালামুখী সেই গহ্বরে দেন ঝাঁপ।

বিজ্ঞানী, কবি, গণতান্ত্রিক এম্পিডোক্লিস, জয়।
তাঁকে কোলে নিতে জড়-জননীরা এলো কিনা জানা নেই।
জীবনযুদ্ধে হেরো সৈনিক।—ইতিহাস হেসে কয়।

এই শীতে

শহীদ কাদরী

শীতার্ত নিঃস্বতায় কিছুই বাঁচে না যেন
বেঁচে থাকা ছাড়া ; বসন্তের শিথিল স্তন
নিঃশেষে পান করে নিঃস্বার্থ মাটি,
লতা-গুল্ম-গাছ কাঙ্ক্ষা শালিক চড়ুই
এমন কি অসহায় গর্ভের দেয়ালের জীব···

সে-উষ্ণতের দিনে, বিপ্রলাপী স্বভাবে যার
আসক্তি আসবে,—সে তো মৃত্যুগামী,
ভোমেট, অপ্রজও উপে ; অচিরে কায়ার
মনের সমতা সেই : ঘনতা : প্রজ্ঞা যার নাম।
কেননা বসন্ত শুধু কবির হৃদয়ে নয়,
কারো-কারো মগজেও নামে,
এবং
তারাও হয়ে হয়.অন্ধকার আয়েসে কাঁপে।

অথচ এ-শীতে একা, উদ্ধত আমি,
আমি শুধু পোষাই না ম্লান যোদ ;
প্রতিবেশী পুরুষ নারী আর বিশাল
যে-রিক্ত গাছ,—সে-ঈর্ষায় সুখী
বিগত উত্তাপ দিই বন্ধু-পরিজনে।

আমি শুধু
একাকী সবার জন্যে মুখোমুখি।

এবং আরো একজনের চোখে দেখি,
লক্ষ সূর্যের আসা-যাওয়া—এবং
সেও একা—আমারই আত্মার মতো—
প্রাঙ্গণের উরুণ কুকুর।

আবহমান

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

যখন, বর্ষণ শুরু তোমার শরীরে,
আমি যার স্পর্শজীবী শতশিরার
স্রোতস্বিনী অভিমান, তখনি প্রেমের
আকাঙ্ক্ষিত বিনিময় ; স্বপ্নে, সহবাসে।

তখনি,…প্রাচীন, দূর, পূর্বপুরুষের
রক্তের নিভৃত কণে স্ফীতশিরা-আঁকা বাসনার
কোনো হাত নেমে আসে : অন্ধকারে যায়
একাকারে পড়া যায় ঝরঝরিয়া, রেখার নিয়তি॥

কবিতা
বর্ষ ২০, সংখ্যা ৩

দুটি কবিতা

শান্তিকুমার ঘোষ

উত্তরণ

নিরন্ত সময় আর অনন্তবিস্তার জুড়ে যুযুধান কারা
সন্ধানীর আলো ফেলে আঁধার-সমুদ্র শেষে হ'য়ে যায় পার।
পরমাণুপূর্ণঘরে নিহিত শক্তির বেগ নিয়ন্ত্রণে তার
অবাধ মসৃণ গতি রেখেছে পৃথিবী এই—প্রাণ পূর্ণধারা।

সমবায় সমাজের মুক্ত সেই ঐকতান স্নাত আকাশের
সঘান আলোর ঘরে : অমৃতশিল্পের তনু মৃত্তিকার ঘরে ;
নক্ষত্রের ছন্দে-বাঁধা অবিরাম পরক্ষেপ দূরে দূরান্তরে।
সদসৎ চিনে ঠিক উজ্জীবন প্রতিদিন সব মানুষের।

অলৌকিক আলো তবু হঠাৎ পড়বে চোখে দিগন্ত আকর,
সবুজের তৃষ্ণা বুঝি আজীবন থেকে যায় প্রাণের গভীরে ;
হাসিতে কোটাতে মুখ অবেলা যৌবন যেন রোমাঞ্চিত নীড়ে ;
মানচিত্র নেই জানা, মনের সমুদ্রে ঢেউ উত্তাল মুখর।

রাত্রিলোক

নারী ॥ প্রিয়তম, মৃত্যুর প্রহর এই : নক্ষত্র রাত্রির রূপ চোখ ভ'রে নিয়ে
বিদায় জানাতে পারি পূর্ণ পৃথিবীকে। বিশাল প্রেমের ভার
দিয়েছি ছড়িয়ে
আলোর জগৎ ঘেরা অগাধ আকাশে। সমুদ্রগর্জন দূরে,
সৈকত অপরিমাণ,
মহান স্থিতির থেকে অনন্ত গতির পথে চলে এই প্রাণ।

পুরুষ ॥ সারস্বত রাত্রি তার কেন্দ্রে তুমি স্থিরপ্রেম মূর্তি হ'য়ে থাকো ;
না পেলে তোমার দৃষ্টি খচিত সৌন্দর্য তার চিহ্ন থাকে নাকো
সুস্তহিম অন্ধকারে। সহস্র শিখায় প্রাণ জেলে এই জাগরণ :
কংকার, মুরতি, স্পর্শ—অণুময় অস্তিত্বের সার্থক বন্ধন।

এ আকাশ মহাশূন্য, জ্যোতিবিন্দু অগণন—অপার বিস্ময় :
নক্ষত্র-সংঘর্ষে কোথা অপার্থিব বিশ্বলোক প্রসারিত হয়।
আমি না দাঁড়ালে তীরে সমাধে হইবে ধারা আঁধার-সংগমে ;
দুই মেরু ছুঁয়ে যাবে কালের দোলক তবু নিশ্চিত নিয়মে।

পুরুষ ॥ অমোঘ নিয়মে সেই প্রাণের উন্মেষ জেনো—জীবন-যন্ত্রণা ;
উন্মীলিত রাত্রিদিন, ছোটো এই গ্রহ তার অসীম মূর্ছনা।
সূর্যের সমান স্নেহ পত্রের হরিতে জমে—পুষ্পল বীথিকা, তরু,
শাখায় অজস্র তার ;
উৎসের খনিজ জল, হাওয়ায়-হাওয়ায় এই অমৃত-সঞ্চার।

তীব্র এক হিমবাহ চূড়ার ছুরার ভেঙে ক্রমে নেমে আসে—
দারুণ শীতল স্পর্শ। আমার অস্তিত্বে তবু ছায়া জলে ভাসে।
কেবল সময়স্রোত, অন্তহীন বেলাভূমি—সীমান্তে বেপথুমান ;
মুকুল, রঙিন স্বপ্ন, মুহূর্ত বুদ্বুদে মিশে সব অবসান।

পুরুষ ॥ মানবসমুদ্র তবু, উদ্বেলিত জোয়ার ঢেউ—প্রাবন, চুম্বন :
অভ্রান্ত তারায় নিচে প্রাণের উৎসব এই—প্রেম অকম্পন।
তরঙ্গিত রাত্রিলোক যার মাঝে তুমি এক দীপলক্ষ্মী নারী,
নেপথ্য আঁধার-লীন ; আমার সম্মুখে শুধু আলোর দিশারী॥

সূত্র

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

বিচ্ছিন্ন পদ্মের পাপড়ি ছিঁড়ি ফের ;
কোথাও মধু নেই। মধুকর
কী ভেবে করে পান ? হাওয়ায় আনে ঘ্রাণ !
ওষ্ঠে রাখে মধু আহরণ।

সাহস

ওমর আলি

ছোটো পাখিটিও ছড়িয়েছে ডানা ওপরে বাতাসে,
মাঝে-মাঝে গাছে অথবা মাটিতে দ্রুত নেমে আসে।
চেয়ে-চেয়ে আমি পাখিরে দেখি না, দেখি শুধু তার
ছোট বুকেও অসীম সাহস আকাশে ওড়ার।

কবিতা
চৈত্র ১৩৬২

ঘরনী

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

মশ্কিরচুড়া হঠাৎ যখন জ্বলবে,
গৃহিণী, তোমার মনে থাকবে না সাজানো গৃহস্থালি :
ব্যাকুল চোখের মণিতে-মণিতে কী যে এক ছায়া টলবে,
ছিঁড়ে পারবে না ঘরকন্নার বারবার জোড়াতালি।

ঘরনী, মিলোনো যাবে না পাতানো ঘর আর মশ্কির,
মিশ্কিত আলো তোমার হৃদয়ে একদা গেছে যে লেগে :
আর, মনে করো, সেই ঢাওয়া আর জলের সে-মঞ্জীর ;
মশ্কির কিছুতোলে না, গৃহিণী ; ঐ ছাখো আছে জেগে।

তোমার চেতনাচেতনে জড়িয়ে সে এক যাত্রা ঘর ;
প্রতিনিয়তই সংসার ছেড়ে সুদূরে এলে যে চ'লে :
সেই আগুনের রং মনে করো, আর সেই পরিচয়,
বিবাহকক্ষেই ভ'রে গেছো বধূ গৈরিক কল্লোলে।

সোনার কলস টলবে যখন, ঘরের কলসি আর
মিথ্যে ভোরো না, ভোরো না ভাঁড়ার, কিংবা সোনার ঘর ;
তোমার গায়ে যে ঢাওয়া লেগে আছে চূড়া-জ্বলা দেবতার,
আর সেই তাপ—এখনো উষ্ণ, বুকে মুখে সেই জ্বর।

প্রস্থানের মুহূর্তে

সৈয়দ শামসুল হক

এই দেখে যাবো চ'লে।
তার স্বপ্ন ব্যথা চ'লো শহরে সন্ধ্যায় ;
আকাশে যেমনি হং দুরন্তীন দোলে—
জীবনের কারখানা বিদ্রূপ ধোঁয়ার মতো
ছবিঘরে মুখর নাটক।
নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ-আলোয় আছি তুমি আর আমি
চকিত উদ্বেগ বুকে। এই দেখে যাবো।

ছোটোখাটো মূল্যবোধ আনো—
মানুষ মানুষও নয়, জিনিশের ভিড় :
যোয়ানো দরোজা ঘরে মানুষের সহজ প্রবাহ ;
উজ্জ্বল মুদ্রা কিছু তোলো,
ছোটোখাটো মূল্যবোধ আনো।

শহরে নির্জন আমি, সঙ্গী নেই,
টুকে নেই রেখে যাবো সময়ে মৃত্যুর আগে
আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি—
মসৃণ হিসাবের মতো সময় গড়িয়ে চলে গির্জের চূড়োয়।
সমস্ত শহর হ'লে শব্দহীন, তার ব্যথা বুকে নিয়ে যাবো॥

দুটি কবিতা

সুরেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

লীলিমা

হঠাৎ গম্ভীর শব্দে উৎকেন্দ্রিক লরি,
চৈতন্যের অন্ধকার হলকে প'ড়ে গেল ;
নাগকেশরের ডালে ঘরোঘরো ফুল
সব দুঃখ ক'রে তবু এলো।

তবু এলো ? ভেবেছ কি, শয়তান,
আমার হৃদয় নিয়ে খেলবে ফুটবল ?
পৃথিবীর সব বাড়ি যোগ দিলে যত উঁচু হবে,
তারও উপরে আছে সুমহান এক অনুভব।

তোমার মৃত্যুর পর

তুমি নেই ; আকাশের আলো
মুখ থেকে তুলে নিয়ে গেছো।
বুকের কতক চুল তবু লেগে আছে,
মেয়ালের হুকে আঁটা তোমার কামিজ ;
শেল্‌ফে বই, আলনায় জুতো।

ট্রেন আজো ডাক দেয় রোজ ;
ঘোমেল-চড়ুই বসে জানালায় রোদে ;
বাড়িওলা ইলেট্রিক-তার কেটে দেয়।

অলৌকিক

বিকাশ দাশ

পুরোনো শহর, এর গলি-ঘুপচি, আনাচ-কানাচ
আমার অত্যন্ত চেনা ; রোজ ভোরে উঠে
হেঁটে চলি, জীর্ণ-বাড়ি-জানালায় ঘুলঘুলি গাছ,
হঠাৎ নির্জন মোড়ে নিঃসঙ্গ বাতাস মাথা কোটে।
স্যাতসেঁতে এঁদো গলি, এঁটো পাতা খাঁচিছে কুকুর,
তবু ঘুরে সাইকেলের অদৃশ্য নূপুর
বেজে ওঠে। সূত্রে জোড়ে তীব্র
অচেনার মন্ত্রমুগ্ধ শালিকের কিচিরমিচির।

পউষে, উষায় তেজা নিমের পাতায়,
জানালার শার্সিতে, কাঁটাঝোপে, প্রান্তরের ঘাসে
জ্বলে ওঠে সোনাঝোর,—কুয়াশায় কাপসা আকাশে
একটি মুহূর্ত তার অলৌকিক বিস্ময় ছড়ায়।

পুরোনো শহর, তবু হঠাৎ অদ্ভুত মনে হয়।
হয়তো বা একে ঘিরে আরো কত গভীর বিস্ময়
আমার নীরব রাতে চক্ষু যায় খুলে দিতে পারে,
হাজার নক্ষত্র যাতে অন্ধ হ'য়ে জলবে আঁধারে।

কবিতা
চৈত্র ১৩৬২

মধুর বিস্মৃতি

অমিতা মুখোপাধ্যায়

স্থবির পৌষ আর স্থবিরতর মাঘে
অরণ্যের যত শ্যামলী কন্যারা
বস্ত্র বদলেছে কুয়াশা ওড়নায়;
সহসা ফাল্গুনে প্রেমের ছোঁওয়া লাগে
তরুণ সূর্যের বন্ধুক বিদায়ারা—
বেচারা বুড়ো শীত কাতর চোখে চায়।
যাবার কালে সে তো নিয়েছে লিখে ব'য়ে
পৌষ-মাঘের অশেষ মুলোমাখা
স্মৃতির মতো যত কচুর পাতাগুলি;
এবার প্রসাধন বউল কিশলয়ে,
রঙিন ফুলে-ফুলে বনে সেজে থাকা;
শ্যামলী কন্যার বিলোল কচুলী।

বোশেখে ওড়ে ধুলো, শ্রাবণে কাদা জমে,
আষাঢ় সারা শীত নীরব লাঞ্ছনা,
ফাগুন এলে পরে কী ক'রে ভুলে যাও?
আমার বিম্বে যে বিম্বাধ ঘনঘমে
অবাক ভালোবাসা কোথায় আছে, বলো।
মধুর বিস্মৃতি হৃদয়ে ভ'রে নাও॥

কবিতা

বর্ষ ২০, সংখ্যা ৩

ছিলো সে-ও

শামসুর রাহমান

ছিলো সে-ও ধূলোর নিঃসঙ্গ পথে, ছিলো কোলাহলে
ক্ষমাপিতা চিরদিন। দিগি তাকে ছেড়েছিলো ব'লে
সোনার শরীর নিয়ে ব্যর্থ হ'লো নারী।
ডুবিয়ে পায়ের পাতা, সহচরী শাড়ি
ডুবিয়ে নিঃসঙ্গ জলে নামলো যখন—
আপসা চোখ, মেঘ হ'লো মন।

অত শান্ত জলের ছুতোয় তার সমাজ সংসার হবে লীন
কেউ তাকে বলেনি সেদিন।

মাচার অর্পিতা লতা জানে যার প্রীত পরিচয়,
ভুলবো কি তার নাম? দূরে কাছে একই হাওয়া বয়?
প্রসারিত ধূলোর নিঃসঙ্গ পথ-রেখা,
তাকে দেখে ঘুরে-ঘুরে উঠোনে কুকুর কাঁদে একা?
খাঁচার পাহাড়ি পাখি সে-ও যেতে চায়
অজানা কোথায়—
গাছে-গাছে মূর্ত ভাষা, পৃথিবীর সমস্ত আকাশে
বেলা প'ড়ে আসে॥

'কবিতা'র গত পৌষ সংখ্যায় এই লেখকের নাম 'শামসুর রহমান' ছাপা হয়েছিলো। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।—সম্পাদক।

তিনটি কবিতা

পূর্বেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

অনৈয়ায়িক

অঙ্কের কাঁচা ছেলে চুল টেনে ছেঁড়ে,
নিজেরই ঝোঁকড়া ঘন চুল,
যন্ত্রণা-হারানো বাণি কি-পদেই তুলাতিত করে:
কিছুতেই মেলে না যে: ঘামে ভরে, জ্বরে।
তা হ'লে কি প্রশ্নই ভুল?
অঙ্কের কাঁচা ছেলে টেনে ছেঁড়ে চুল।

ঘড়ি বলে টিক টিক সকাল বিকাল।
ঘড়ির-পায়েই বাঁচে প্রত্যূষাদ কাল।
গণিত-ছায়েই তার ক্ষমা নেই,
একচুল হেলে যদি ভিন্নদিকেই,
একটু অন্যমনা হ'লে যেই
মায়া নেই, দয়া নেই, ছায়া নেই।

অঙ্কের কাঁচা ছেলে জলে শুধু জলে
বৃদ্ধির, প্রেমের ভুটিল অনলে।
ঘামে ভস্ম ধূসর নির্জীব,
জ্বরে শীতের বৃষ্টি টিপটিপ।

তবু কবে তারও চোখ থেমে যায় কোন সংকেতে,
বুকে নীল বেদনার বাষ্প,
সে যেন আলোর বাঁশি, কাৎরায়:
আসবো বেরিয়ে আমি, আসবো।

আসবো গাছের সাথে ডাল ভাঙা-যোগে,
ঘাসফড়িঙের ঢেউয়ে, শিউলির বোঁটায়,
সবুজ আঘের খেতে গোমতীর পারে
আসবো, আসবো আমি, আসবো।
প্রাণের ত্রিশিরা-কাচে স্বপ্ন বেদনানীল বাষ্প।

সংসার হেঁকে বলে আতঙ্কিতে :
যাও তাকে মনে,
খোলা আকাশের নিচে যাতাল কিশোর
বাজাক খেয়ালি তার গৎ।
ছুটির সোনালি হাওয়া কথা কয় :
গন্ধ আমের বোলে এই তো সময়।
আনো তার চোখে ঘুম বেঁধে
আদু শরীরের স্থির খেদে।

ঘড়ি বলে টিক টিক সকাল বিকাল।
ঘড়ম-পায়েই হাঁটে প্রভুপাদ কাল।
সংসার স'রে যায়, পায় না সে টের
ক'রে-যাওয়া গাঢ় ঘ্রাণ বনগোলাপের।
অঙ্কের কাঁচা ছেলে টানবে না চুল।
জানবে না কোনখানে প্রশ্নের ফুল॥

'এবার গেলে ফিরবে সে-মন'

যাওয়ার যা তা যাবেই।
তবু
যাওয়ার ঘণ্টা বাজে যখন
মনটা কাঁদা :
'এবার গেলে ফিরবে সে-মন।'
দুঃখ শোকের ছাড়াছাড়ি সাধ্য স্টেশন।

নীল আলোয় সংকেতিত
ট্রেনের চাকা,
রুমাল ওড়ে
ভাঙা বুকের হাওয়া বোঝায়
বাষ্পে ঢাকা॥

একটি অনুভব

পৌষ সমিতির জোম কেলে যায় মরা সাপটাকে,
তাকে ঘিরে কাকেদের তুমুল দরবার,
কী ক'রে শকুন এলে তাড়াবেই, তাই শলা আঁটে।
নিস্তেল কুপির মতো নিবে আসে পৌষের দুপুর।

কবিতা
বর্ষ ২০, সংখ্যা ৩

তিনটি কবিতা

আল মাহমুদ

প্রবোধ

যতই অসহ্য হই ঘাম ঝরে তত
ঘুটপাত তেতে ওঠে সারাদিন রোদে
সন্ধ্যায় ঘরে ফিরি ক্ষতবিক্ষত।

অন্তহীন যন্ত্রণায় রক্ত জলে বুঝি।

অন্ধকারে একদিন

একদিন ঘরে এসে হৃদয়ের প্রিয় শয়তান
ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলো টেবিলের মোম
নিবিকার দেহ ঢেকে অন্ধকার আলখেল্লার নিচে
ম্লান হেসে বিছানায় ব'সে
মায়াবী কথায় ফাঁকে বোঝালো সে : প্রভুর শহরে
আমি নাকি যেতে পারি! অপরূপ নিবিড় বিতান
পার হ'য়ে, চোখের পলকে
অলৌকিক ফলবতী বৃক্ষের নিচে।

বললাম, ভীষ্মদার আমার কিরিচে
অলৌকিক স্পর্শ দাও। ঈশ্বরের অনুরূপ বল
আমি যেন বিদ্ধ ক'রে নিতে পারি। যেন
ত্যাগ ক'রে দিতে পারি—আমার সে প্রিয়তমা নারীকে কেবল।

সিন্ধনি

ভেবেছি তো অন্ধকারে আমি হবো রাতের পুরুত
আদিম মন্দিরে একা তুমি এসো নগ্নতার দেবী,
নগ্নতার অন্ধকারে আমি যার একমাত্র সেবী,
ধূপের গন্ধের বাস দেবে এনে এখন যে মৃত—
সে তো শুধু গন্ধবহ পৃথিবীর পুষ্পময় বাস
পুরোনো মদের গন্ধে ভরা যায় রাতের বাতাস,
অসহ্য আনন্দ হেনে তোমাকেই করে যে নিষ্পিষ্ট,
অথবা হৃদয়ে ঢালে যন্ত্রণার করুণ নির্যাস।

শুরু হোক তোরণাঠ গন্ধবতী তোমার দুনামে,
শীতার্ত ধোঁয়ার তলে ডুবে যাক মন্দির-দেহলি,
শঙ্খমালা স্তন দুটি মনে হবে শ্বেতপদ্ম কলি,
লজ্জায় বিবর্ণ ঘন ঢেকে যাবে ক্লিসেনথিমামে—
অথবা রক্তের নাচে শুরু হবে সিন্ধনির সুর
বৃষ্টির শব্দের মতো মনে হবে তোমার নূপুর।

যম

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বিশ্রব্ধ তমোময় তোমার অস্তিত্ব
সৃজন দুর্জন বুকে তুমিই পরম
অপ্রদানী নামরূপ, লোকান্তরে যম।
প্রাণরজ্জু সাঙ্গ ব'লে তুমিই একদা
জড়ের বিশ্রামস্থান। দুই হাতে সদা
দুর্জয় প্রেমের বেণু বাজিয়ে সপ্রেম,
জীবনের নদবাহে সমুদ্র প্রথম
অসংসারী স্নান দাও, অপ্রমিত সুখা।

সে-নারীকে যম বলি। দিনের নর্মদা
সন্ধ্যায় অহল্যা হয়, স্বর অনুত্তম,
কখনো দক্ষিণ নয় সে-মুখের হাং
অথচ সুতনু স্পর্শে স্বপ্ন, হে বসুধা,
যৌবন সহসা অঙ্গে জ'লে-জ'লে সোম
নিলাজ নির্জল দেহ, বিভার সায়ং ॥

দুটি কবিতা

সুকুমার রায়

উপযাচিকা

জলের মতো চিকন তার হাসি।

শাদা ধানের অঘ্রে রসে ভেসে
নিরালা দিনে আমাকে বলেছিলো :
যাচ্ছো কোথা ? সঙ্গে নিয়ে চলো।
চোখের জল মুছিয়ে বললাম :
বকুল, তুমি জলো জলের বাসি ?

আর্তনাদে ধরণী স্থির হ'লো।

সন্দেহ

ঘোমটাখানি তোলো,
দেখবো কালো চোখের জলে
আমার ছায়া কাঁপছে নাকি কোনো !

বৃষ্টি যদি আসে,
তুফান যদি আকাশ চিরে উর্বশীকে ডাকে,
পিতামহের মতন আমি শ্বশুরবাড়ি যাবো,
দেখবো ওই নিভৃত-কালো কুলিন দুটো চোখে
আমার ছায়া পড়ছে নাকি কোনো।

অনুবাদগুচ্ছ

বুদ্ধদেব বসু

রাইনার মারিয়া রিলকে : অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট

১ : ৩

তা পারে দেবতা। কিন্তু মানুষ কেমনে
করে সেই সুর-তার বীণার অনুসরণ?
চেতনা দ্বিখণ্ড তার। আলোলোর মন্দির-তোরণ
ওঠে না বিনায়-ভরা-হৃদয়ের পথের সংগমে।

তুমি যে-গানের গুরু, সে তো নয় বাসনা, প্রয়াস,
নয় কোনো অন্তিম লক্ষ্যের পাওয়া, কিংবা-কিংবা সাধা;
অস্তিত্ব—তা-ই তো গান। দেবতার তাতে নেই বাধা।
কিন্তু কবে আমাদের হবে? কবে এই নক্ষত্র, আকাশ,

আর পৃথিবীরে, আমাদের ফিরিয়ে দেবেন তিনি?
শোনো, ছেলে, সে তো নয় প্রেমে পড়া, যাতে আকস্মিক
আবেগে বাঁধন ছিঁড়ে যৌন ঘুমে ঢেলে ওঠে বাঁশি:

ভুলে যাও কোনোদিন গেয়েছিলে। সে-গান ক্ষণিক।
সার্থক গানের উৎস অন্য এক অলক্ষ্য নিশ্বাস।
নিশ্বসিত শূন্য এক। ঈশ্বরে শিউরে ওঠা। একটি বাতাস।

১ : ১৯

যদিও, মেঘের মতো, চরাচর সরণ, অস্থির,
স'রে যায় রূপান্তরণে,
তবু যা একান্ত, পূর্ণ, অবশেষে খুঁজে পায় নীড়
অপরিবর্তনে।

চৈত্র ১৩৩২

নেই গতি, দৃপ্ত অভিযান,
আছো ঊর্ধ্বে, অবাধ, নির্ভয়,
হে বীণায় দেবতা, তোমার গান
আসন্নের প্রতিধ্বনিময়।

দুঃখেরে আমরা ভুল বুঝি,
ভালোবাসা শিখিনি এখনো,
মৃত্যু, আর মৃত্যুর খুকোনো

সন্দেহের আজো সুধা পুঁজি।
শুধু গান ঘুরে-ঘুরে যায়
অভিষেকে, অভ্যর্থনায়।

১৩২২

হবে ক্ষয়, বেড়ে উঠি তাই।
শুধু জেনো, কালের প্রমাণ
নিতান্ত সে তিলপরিমাণ
উদ্বৃত্তের অস্তহীনতায়।

বিষম যন্ত্রার অবসান
দেখা দেয় অদূরে এবার,
খুলে দেয় অন্তর-দুয়ার
গতি নয়, কেবল বিশ্রাম।

যুবকেরা, দূরে যেয়ো নাকো
প্রয়াসের পাখায় নির্ভরে,
ক্ষান্ত করো নিরুদ্দেশ ধাওয়া।—

যা-কিছু রয়েছে, চেয়ে থাকো,
সব আছে অবসরে ভ'রে :
বই, ফুল, আলো আর ছায়া।

ফ্রীডরিখ হোল্ডারলিন

সন্ধ্যাস্বপ্ন

কুটির-প্রাঙ্গণে ব'সে ক্লান্ত চাষি, শিথিল বিশ্রামে
পরিতৃপ্ত, আখে তার রাঙার খোঁয়ার উৎপতি।
প্রশান্ত পল্লীর পথে যেতে-যেতে বিদেশী পথিক
শোনে স্নিগ্ধ অভ্যর্থনা প্রার্থনার ঘণ্টার ধ্বনিতে।

এইক্ষণে যাত্রিরাও আপন বন্দরে ফিরে আসে।
সুদূর নগরে গন্ধে ব্যবসার মুখর উল্লাস
ক্রমে ক্ষান্ত হ'য়ে এলো ; নগরহীন কুঞ্জবনে
অন্ধকারের শ্রান্তি বন্ধুজনে একে-একে ডাকে।

কিন্তু আমি ? আমার কোথায় শান্তি ? পরিশ্রম, পারিশ্রমিকের
আশ্রয়ে মানুষ বাঁচে ; কর্ম আর বিশ্রামের বিনিময়ে
নন্দিত তাদের দিন : শুধু আমি, আমারই হৃদয়ে
কণ্টকের আকুলন কেন তবে হয় না শিথিল ?

সন্ধ্যার আকাশে জ্বলে বসন্তের হাজার মঞ্জরী ;
পাপড়ি মেলে অসংখ্য গোলাপ : সংহত সোনালি বিম্ব
ভ'রে যায় শান্তির আভায় ; ঐ ঊর্ধ্বে তুলে নাও মোরে,
রক্তপীত মেঘদল ! ঐ সুরে, আলোকে, হাওয়ায়

চৈত্র ১৩৬২

গ'লে যাক প্রেম আর হৃদয়ের ক্রন্দন আমার।
কিন্তু, বুঝি আমারই নিঃশেষ প্রার্থনায়, এই মায়া
একলাই বিলীয়মান। অন্ধকার নেমে এলো আকাশের তলে—
আমার নিঃসঙ্গ আমি, যেমন ছিলাম চিরকাল—

তবে এসো, অতল, কোমল নিদ্রা। হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা আমার
অচঞ্চল, অনশ্বর ; অবশেষে, হে যৌবন, স্বপ্নময়, শান্তিহীন দিন,
তুমিও বিলীন হবে নির্বাসিত নিষ্পাপ অন্ধকারে,
শান্তির আকর নিয়ে দেখা দেবে ব্যর্থতার রেখা।

আমার সম্পদ

এখন হেমন্তদিন বিশ্রান্ত আপন পূর্ণতায়,
পরিপক্ক দ্রাক্ষাগুচ্ছ, ফলভারে আনম্র কানন,
যদিও লাবণ্যময় ফুলদল, কৃতজ্ঞতায়
ইতিমধ্যে অনেকেই অবনত মৃত্তিকার বুকে।

যেখানে চলেছি আমি শান্ত পথে, চারদিকে তার
প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে সুমধুর শস্যের সম্ভার।
যারা সুখী, তাদের সম্পদ এই ; তাদের উদ্দেশে
পরিশ্রম রেখে গেছে অফুরন্ত আনন্দের দান।

স্মিত আলো, প্রীতিময়, তাদেরই গায়ের ফাঁকে-ফাঁকে
ঝ'রে পড়ে স্বর্গ থেকে এই সব জন্মঠের 'পরে,
নিতে চায় তাদের সুখের অংশ, কেননা কেবল মানুষের
চেষ্টায় হয়নি পুষ্ট ফলন প্রান্তর।

কবিতা
বর্ষ ২০, সংখ্যা ৩

আমাদেও দেখে কি তোমার স্পর্শ, হে সোনার আলো,
তুমিও কি, সবীরণ, মৃদু স্বরে, প্রতন অভ্যাসে
ব'য়ে যাবে আমার দুঃখের 'পরে, যেন কোনো
আনন্দের অতিরিক্ত ক'রে ?

সুখী ছিনু আমিও একদা। কিন্তু, যেন ক্ষণিক গোলাপ,
সে-পুণ্য জীবন মোর অচিরেই অবসিত হ'লো।
যারা আজো অনন্ত রয়েছে ফুটে, সেই স্থির, শুভ্র নক্ষত্রেরা
বার-বার, বার-বার তার কথা স্মরণে জাগায়।

সে-ই শ্রেষ্ঠ সুখী, যাকে মৃদুভাষী পত্নীর প্রণয়
ব'য়ে রাখে স্বগৃহে, প্রসন্ন মনে, নম্রিত ভূমিতে ;
পদতলে মৃত্তিকা যেখানে স্থির, সেখানেই দীপ্ততর
নীলিমার দৃষ্টিপাতে উদ্ভাসিত গৃহস্থজীবন।

তরুণ তরুর মতো, যদি তার নির্দিষ্ট আলয়ে
বন্ধমূল না হ'লো সে, তবে বন্ধ আত্মার অজায় নিয়ে
দিবালোকে নিঃসঙ্গল তিমায়িত মতো
পুণ্যময় ধরাতলে ঘুরে মরে অস্পষ্ট পথিক।

কঠিন, কঠিন তুমি, হে নীলিমা ! দুঃসহ বিক্রমে
অবিরল আকর্ষণ করো মোরে ঐ উর্ধ্বলোকে ;
রৌদ্রময় ঝড়ের উত্তাল দিনে, আমাকেই ছলনে
আত্মভেদী তোমার সংগ্রাম শুনি—ক্ষুধাতুর, পরিবর্তমান !

চৈত্র ১৩৬২

তবু আজ ক্ষণিক বিরতি দাও, সেই চেনা পথে
শান্ত পায়ে চলি যেন সান্ধ্য-নীল জাহ্নবীর দিকে,
যেখানে পাতায় গুচ্ছে তার চূড়া যেমন সোনালি
মধুর স্মৃতির মালো দীপ্ত হোক আমারও জীবন।

আর, যাতে ধরণীড়িত এই হৃদয় আমার
এখনো উদ্ধার পায়, তাই যেন, অন্তদের মতো,
আমারও লক্ষিত থাকে বিশ্রামের ধ্রুব নিকেতন—
উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা আজ যেন নিক পার্থিবের সীমা।

হও তুমি সে-আশ্রয়, অনুকূল কবিতা আমার,
আনন্দরূপিণী, তুমি পূর্ণ হও স্নেহের সাধনে,
সেই তো কানন মোর, চিরন্তন বসন্তপ্রতিম ;
মুঞ্জরিত তরুতলে, একান্তে সেথায়

ভ্রমি আমি নিঃশঙ্ক অনবধানে, যখন বিশ্বের
প্রান্ত ঘিরে কেবিল-তরঙ্গময় পরিবর্তমান
সময়ের প্রচণ্ড গর্জন বাজে, আর ধীর, অব্যয় পুরুষ
অবিরল উজ্জীবন এনে দেন আমার প্রয়াসে।

তোমরা, হে অমৃত, যাদের করুণা
প্রত্যেকের পার্থিব সম্পদে ভরে—আমারও সঞ্চয়ে
অতিরিক্ত ক'রে দাও, পাছে ক্ষিপ্রতর
অদৃষ্ট আঘাত করে অকালেই আমার বয়েসে।

শার্ল বোদলেয়ার : ল্য ক্যয় দ্যু মাল

মশাল

কবেল, সুখের সখা, তুলুয়াসে স্নিগ্ধ উপাধান,
আলস্যের কুজন, বিস্মৃতির মধুর নির্ঝর,
প্রেম নেই, আছে শুধু অবিরাম আন্দোলিত প্রাণ—
যেমন আকাশে হাওয়া, কিংবা মহাসাগরে, সাগর।

দা ভিঞ্চি, দর্পণ এক, অন্ধকার, গভীর আকাশ,
ছায়া ফেলে রেসিনার, দিগন্তরে পাইনের বন,
সেখানে দেবদূতের অপরূপ হাসির উল্লাস
সংকেতে জানিয়ে দেয় অন্তরালে তাদের ভবন ;

বিশ্রী হাসপাতাল, রেমব্রাণ্ট, দীর্ঘশ্বাসে ভরা,
অতিকায় ক্রুশকাষ্ঠে একমাত্র ভূষণসম্পাত,
বিদ্যার উদ্যত ভাষা, প্রার্থনার সম্বল পসরা—
একটি শীতের রশ্মি তারে দীর্ণ করে অকস্মাৎ ;

বিস্তীর্ণ অস্পষ্ট দেশ, অনিমেষ : মিকেলেঞ্জেলো :
দৃষ্ট আর অসুর সেখানে মেশে, প্রখর বিক্রমে
উদ্যত প্রেতের দল ভ'রে দেয় গোধূলির আলো,
স্থির করে শবেন্দ্র নখরের ভীষণ উদ্যমে ;

যন্ত্রের আরক্ত রোষ, কিন্নরের উন্মোল নয়ন,
চোর, গুণ্ডা, পাণ্ডুরোগী, মদক্ষীত হৃদয় বিরাট—
এদেরই অন্তর ছেনে করেছেন সৌন্দর্যচয়ন
পুগো[১], সেই ক্রোদির মনঃক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ সম্রাট ;

১। Puget, Pierre : সতেরো শতকের ফরাসি চিত্রকর, ভাস্কর ও স্থপতিশিল্পী।

ওয়াতো, মদনোৎসব : খ্যাতিমান ছন্দের কত না
আলোয় হারিয়ে পথ রক্ত হয় পতঙ্গ-প্রথার,
চটুল, মোহন বৃত্তে উল্লসিত দীপের চেতনা
ঘূর্ণিত বৃত্তেরে আরো গূঢ়তার আবেশে মাতায় ;

দারুণ ছন্দের, সোইয়া, অজানায় বিপদ সঙ্কুল,
ছদ্মবাসে অন্নদাত্রী ডাকিনীর পূজার থালায়,
দর্পণে নিবদ্ধ বৃদ্ধা, বালিকার নগ্ন অভিনয়
পা ছুলে, বোজায় বন্ধে, পিশাচের লালসা জাগায় ;

এই দেবতার বাসা, ব্যাঘ্রচোখা, শোণিতের হ্রদ,
চিরন্তায় তরঙ্গেরা ছায়াচ্ছন্ন ক'রে রাখে তারে,
অন্নদী আকাশ থেকে ক'রে পড়ে ধ্বনির সম্পদ
অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসে, হেবারের[১] অদ্ভুত ঝঙ্কারে।

এই সব অভিশাপ, অবিশ্বাস, নারকী শপথ,
পুলক, চীৎকার, কান্না, অনুতাপ, উন্মাদ বন্দনা,
পার হ'য়ে প্রতিধ্বনি-পরিকীর্ণ অন্তহীন পথ
এনে দেয় মর প্রাণে অবিনের স্বর্গীয় সান্ত্বনা।

হাজার গাত্রীর ছন্দে এই বাণী আবার উত্তাল,
হাজার দুর্যের ঘুমে পুনরুক্ত এক অভিযান,
হাজার দুর্গের 'পরে অনির্বাণ প্রোজ্জ্বল মশাল,
বিরাট অরণ্যে লুপ্ত শিকারির উদাত্ত আহ্বান।

১। হেবার। Weber, Carl Maria Friedrich Ernst Von (১৭৮৬-১৮২৬) : জর্মন সঙ্গীতকার। কেউ-কেউ এঁকে ভোনাস্টিয়েন-এর জনক ব'লে থাকেন।

আর কী প্রমাণ আছে ? ভগবান, এই তো পরম,
এ-ই তো নিষ্কর্ণ সাক্ষ্য আমাদের দীপ্ত মহিমার,
এই যে আকুল অন্ধ যুগে-যুগে ঘরে পরিশ্রম
অবশেষে লীন হ'তে অসীমের সৈকতে তোমার !

ব্রিকেলের গান

যদিও তোর কুটিল ভুরু-জোড়
দেয় তোরে এক ভঙ্গি অপরূপ
(নয় যা দেবদূতের অনুরূপ)—
মায়া-চোখের ডাইনি মনোহরা,

ওরে দারুণ, আহ্লাদিনী রতি—
মূর্তি নিয়ে যেমন পুরোহিত
আরাধনায় যায় ফুলে সজ্জিত,
আমার প্রেম জানায় তোরে নতি।

অরণ্য, আর মরুভূমির বাতাস
গন্ধ হানে বাঁকড়া যব চুলে,
যাযাবর তোর জানায় হেলে-দুলে
কত গোপন রহস্যের আভাস।

ছলনা তোর সন্ধ্যা মায়াবিনী ;
অঙ্গ ঘুড়ে, ঘুমপানির মতো,
সুবাস ঘুরে বেড়ায় ইতস্তত,
অপরূপা তুই, উষ্ণ, তমস্বিনী।

ওষধি-রস হোক না যত কড়া,
হার মানে তোর আলস্যের কাছে,
কাষকলা এমনি জানা আছে
তার প্রতাপে বাঘে ঘাটের বড়া।

পৃষ্ঠদেশ, নিটোল স্তনযুগল—
যখন তোর তাদের প্রেমে পড়ে :
লাস্যময় শিথিল অবসরে
বালিশগুলো উল্লাসে হয় উতল।

মাঝে-মাঝে, অন্ত আলোড়নে,
নাম-না-জানা আক্রোশে অস্থির,
প্রতিশোধের সন্ধানে গভীর,
বিশিয়ে দিস চুম্বনে দংশনে।

কাজলী, তুই ব্যঙ্গে অতি চতুর,
হাসির বাণে আমায় ছিঁড়ে ফেলে,
তারপরে দিস জখম ভ'রে ঢেলে
চাহনি তোর, চাঁদের মতো মধুর।

মনোহরণ রেশমি শাড়ি, মোজা
আর সাটিনের চটির তলে ছড়াই
আমার যত সার্থকতার বড়াই,
প্রতিভা আর অদৃষ্টের বোঝা।

তোরই কাছে স্বাস্থ্য দিয়ে নাই
ঘর্ম আর আলোর অভিধানে,
আমায় ভালো সাইবেরিয়ার প্রাণে
বিস্ফোরণের দুরন্ত যোগনাই।

বিড়াল

আমার কামুক বুকে উঠে আয়, বিড়ালসুন্দরী,
তীক্ষ্ণ নখ ঢেকে নে থাবায় ;
ছেলে দে, মোহন চক্ষে, ভয় আর যাদুর মদিরা—
ডুবে যাই অদ্ভুত আভায়।

নমনীয় পিঠে, ঘাড়ে, ঘুরে ঘুরে আঙুলি আমার
সোহাগের সুদীর্ঘ মন্থনে,
পুলকে মাতাল হাত প'লে যায় তোর তনিমার
স্পর্শময় বিদ্যুৎ-কম্পনে—

তখন তারেই দেখি, অন্তরের অন্তরতমারে।
তার চোখে, বর্শার ফলক,
তোরই মতো, স্থির জ্বরে হিম, গূঢ়, গভীর অমারে,
আর তার আপাদমস্তক

শ্যামল শরীর ঘি'রে ঘ'রে পড়ে অঙ্গের নিশ্বাস,
মায়াত্মক মদগন্ধ, আর এক কুটিল বাতাস।

বিড়ালেরা

প্রৌঢ় বহ্নির আগমে, প্রণয় জানায় তাকে
উগ্র প্রেমিক, শীর্ণ কঠিন পণ্ডিতেরা—
বিকেতনধনি বিড়াল—মৃদু কোমলে যেরা—
তাদেরই মতো সে, ঠাণ্ডায় ভয়ে, ঘরেই থাকে।

ভাবের, কাবের সেতুবন্ধনে উধাও বোধি,
খোঁজে সে বিজন, শুদ্ধ ভীষণ অন্ধকার ;
শবযাত্রায় আর হ'তো সে চমৎকার
এরেবস* তার গর্ব ভাঙতে পারতো যদি।

স্তিমিতের মতো, নির্জনতার অঙ্কে লীন,
আলসে এলিয়ে স্বপ্ন ভাখে সে অন্তহীন
ভাবের আবেশে মগ্ন মহান তন্দ্রিমায়,

ঊর্ধ্ব শুচি, যাদুবী মন্ত্রে ফুলকি ছড়ায়,
এবং সূক্ষ্ম যাদুর মতন রহিমায়
সোনায় কণায় তারা ভ'রে ওঠে চোখের তারায়।

বিড়াল

আমার মাথায় চলে তার আনাগোনা,
যেন তা আপন অঙ্গখানি তার—
প্রবল, মধুর, বিড়াল চমৎকার।
গোঙায় যখন, যায় কি না যায় শোনা।

সুর তার এত সূক্ষ্ম, যায় না ধরা,
অথচ কণ্ঠ, অনুযোগে আবেদনে,
গূঢ় বিলাস বিত্ত জোগায় মনে,
তাই সে এখন কুটিল হতে ভরা।

---

* Erebos : গ্রীক পুরাণে আদিম অন্ধকার। Chaos-এর সন্তান, এবং নিজেরই মাতৃর গর্ভে, নিশার পিতা।

আমার আঁধার সভায়, মোহাবিষ্ট,
দীপ্ত, তরল এই কণ্ঠের তান
আনে হৃদয়ের সুন্দর অভিযান,
ঢালে সম্ভোগে পূর্ণ ভ্রাক্ষাবিষ্ট।

তার কাছে, সব কষ্ট ঘুমিয়ে পড়ে,
নিখিলপুলকে দেয় সে অঙ্গীকার;
হেলায় হারিয়ে আমার অলসতার
বিনাবাক্যেই অযোঘ অর্থ ধরে।

হৃদয় আমার—অলস এই ঘরে
নেই কোনো ছন্দ, যার নিখুঁত চাপে
এমন গভীর আবেগে তন্ত্রী কাঁপে
এমন বিশ্ববিজয়ী গানের মন্ত্রে,

যেমন তোমার কণ্ঠের মৃদু শব্দ,
হরিণের বিড়াল, কর্পূত,
যে পায়ে হোঁটাতে, উতল পঙ্কতৃত
আসলে সুস্থ যেবার ছন্দোবদ্ধ!

তবু একবার আদর করেছি তাকে
কাল রাতে—আজো দেহ-মন নিস্পন্দ,
ঘরে অসুখন এখন ধূপের গন্ধ
গৌর, শ্যামল, কোমল রোদের ফাঁকে।

মানুষটার আত্মা তাকেই বলি ;
অন্তঃপ্রাণনে তারই নির্দেশ আছে,
বিচারে, বিধানে যাঁরে এক সামাজ্য ;
বুঝি না সে কোনো দেবতা, না কি সে পরি ?

এই যে বিড়াল, আমার প্রণয়পাত্র—
প্রেমিকের মতো চোখে-চোখে রাখি তারে,
কখনো আপন মনের অন্ধকারে
সন্তর্পণে চক্ষু ফেরানো মাত্র,

দেখি, বিস্ময়ে অবশ, আত্মহারা,
আমায় নয়নে তাকিয়ে নিবেদ-হত,
সপ্রাণ মণি, স্বচ্ছ আলোর মতো
তার সাত্ত্বিক, হালকা চোখের তারা।

প্যাঁচারা

ইউ গাছের কালো ছায়ার ঝাপে
কোন বিদেশের দেবতা, প্যাঁচার দল,
ঘুরিয়ে লাল চক্ষু অবিরল
কুলকি ছড়ায়। তারা কেবল তাকে।

নিথর তারা অসাড় হ'য়ে কাটায়,
যতক্ষণ বিষণ্ণ সেই ঘাম
হারিয়ে দিয়ে রবির সংগ্রাম
অন্ধকারের রাজত্ব না ঘটায়।

জানীর চোখ, তা দেখে যায় খুলে,
গাছের কাছে যা আছে নেয় তুলে,
আমার গতি, অবুঝ আন্দোলন :

হায় মানুষ, ছায়ার মোহে পাগল,
শান্তি তার এ-ই তো চিরন্তন—
কেবল চায় বদল, বাসা-বদল !

শ্রমণের আমন্ত্রণ

কবিতা, কন্যা, বোন,
আমার স্বর শোন,
সে-দূর দেশে কি বধূর হাতো না সবি,
অবসর, ভালোবাসা,
মরণ সর্বনাশা,
অবিকল তোর তনুর প্রতিছবি।
স্থির মেঘের ফাঁকে
সজল সূর্য আঁকে
আমাকে তোলাতে, তোর চাহনির ছায়া,
যখন, অর্ধ-বেলা
রহস্যময় বেলা
বিলায় চোখের প্রবঞ্চনায় মায়া।

সেথা কিছু নেই, যা নয় আলোয় জ্বলা,
শান্তি, বিলাস, উৎসব, শৃঙ্খলা।

চৈত্র ১৩৬২

সেই দেশে, তোর ঘরে,
যদি ঠিকানা পড়ে
বহু বৎসরে উজ্জ্বল আশ্বিনে,
বিরল ফুলের তোড়ায়
পাগল গন্ধ ছড়ায়
আপসা ঘুমের অনুকূল অনুভাবে।
কাজ বিলানের ভোরে
তলহীন দর্পণে
প্রাচ্য দেশের বৈভব যাবে ভাসা,
সব শুঠে কথা ক'লে
গোপন হৃদয়-তলে,
বিজনে সোনার মধুর মাতৃভাষা।

সেথা কিছু নেই, যা নয় আলোয় জলা,
শান্তি, বিলাস, উৎসব, শৃঙ্খলা।

তাথ রে অলস খালে
বাঁধা মুক্তির জালে
নৌকোর সারি—মেজাজ বাউণ্ডুলে;
তোর নয়ন সাথে
মেটাবার আহ্লাদে
নিখিলসাগরে ছোটে ওরা হেলে-দুলে।
অস্ত-সূর্যগুলি
ছড়ায় রঙ্গধূলি
যেমনি, সোনালি—খালে, পথে, প্রান্তরে,

বর্ষ ২০, সংখ্যা ৩

সকল নগর ধাওয়ায় ;
টানে দিগন্ত-ডাকায়
উক্ত আত্মার শুভ্রায় কক্ষরে।

সেথা কিছু নেই, যা নয় আলোয় মগ্ন,
শান্তি, বিলাস, উৎসব, শৃঙ্খলা।

এ মূক যন্ত্রণা ছিন্নের মতো

জ্যোতির্ময় দত্ত

চড়াই, চিরিলিক আর ছুঁচ-পাখা বালালাইকা পাখি
উড়ে এলে পরে, অজলের চুলে
টিকলির মতো তারি এক চাঁদ থাকে দুলে।
গাছের কোটরে এমনকি বহুরূপী গিরিগিটির সংসারও
চুপচাপ ঘুমোয়। ডালে ডালে ঘুরে বনবিড়াল শুধু এক
পাখিদের বাসা থেকে ডিম চুরি ক'রে খায়।
অরণ্যে এসো না কেউ যেন। যে ঝিনোয় প'চে-যাওয়া
শিকড়ের পাশে, কালো জলে এক ঝাঁক রুপোলি মাছের মতো
ঝিকমিক করে যার দেহে চাঁদ-গলা আলো
যার হলুদ পিঠের উপর সবুজের ছোপ যেন
ঝরনার ধারে পাথরের গায়ে পিছল শ্যাওলা, সেই
সর্পচক্ষু অজগরের নিদ্রা নেই আসলে কখনো।

নীলাভ ভোরায় জলে কাহিমের মুখ। শ্যাওলার মাঝে
কাহিমের ডিম যেন দোকানে, কাচের আধারে
সবুজ কিখাবে পাশাপাশি গোল-গোল মুক্তো সাজানো।
এ-চত্বর কাহিমের মতো। কাহিমের ছেলে
শয়তান শৃগালের নখে দাঁতে রক্তাক্ত হ'লে
আমার অপ্রকাশ্য ব্যথার মতো কাহিমের মুখাই রোদন।
কাহিম তো সারাক্ষণ জলে, কাহিমের চোখে জল এলে

অপর কাহিমে
বোঝে তা কী ক'রে ?

নরখাদক উপনিবেশে, জঙ্গলের অভ্যন্তরে, পর্বতগুহায়
ভোজ জমে শুয়োরের চর্বি-জলা অগ্নিকুণ্ড ঘিরে :
আকাশের থালিতে আনা, ঝুরাশা-ঢাকা, শীতের লালচে চাঁদের মতো
গণ্ডারের চামড়ায় রাখা ঘুষ্টে-ঘৃত কুমারীর ঝলসানো স্তন
বুনো-ফল-নিঙড়োনো শাদা-রস মদের আদরে
উল্লাস জাগায়। জঙ্গলে অতি হিংস্র
এমনকি উল্লাসও !
কাহিমের জাওলায় শিথিল অধরে
মদ ঢালো কুতির মতো, উল্লাসে সেও
মাতুক, কাহিম-সমাজে যা অভাবনীয়, সেই দানবীয় রীতিতে।

এ বুক যন্ত্রণা ছিন্নের মতো
শিরার খাল-নদী খালি ক'রে ফেলে :
রক্তের সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপ এই যে হৃদয়
সমুদ্র শুকিয়ে গেলে দেহের অভ্যন্তরে শোণিত
মরুভূমির মাঝে ফেলে রাখে এক টিলার মতো
অথবা মাঠের মাঝে কোনো এক পরিত্যক্ত উটের শব যেন।

রাত্রে অজগরের মণি জ্বলে।
অরণ্যের পৃথিবী যেন কোনো কাহিম-দেবতার
বিপুল ডিম, নিরত শুধু তার

চৈত্র ১৩৬২

নদীর কিনার বেয়ে মৃত্যুর অন্ধকার
সমুদ্রে ঝ'রে পড়া।
অবশ্যে মৃত্যু সহজ এতই!

আর তোরে আকাশ রক্তিম। পাহাড়ের গা বেয়ে
আকাশ গ'লে-গ'লে পড়ে সূর্যের তেজে।
যেন কোনো জংলি ব্যাধের তীরে আহত সূর্য-পাখির
রক্তে আকাশের সব দুধ লাল হ'তে আরো লাল হ'লো।

দুটি কবিতা

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

যখন তাকেই দেখি

বিস্ময়ে অবাক হই যখন সে মুগ্ধ কণ্ঠে তার
বেদনায় দিব্য সুর বিরহিনী বেহালার মতো
করুণ বেহাগে বলে : সুখী আমি, সুখী এ সংসার,
স্মৃতির ছড়ের টানে এ-জীবন তন্ত্রীতে নিয়ত
দুঃখের বিচিত্র ঘোড় নীল প্রেমে কখনো সাগর
কখনো আকাশ ছেয়ে গুমরে-ওঠা মেঘের প্রণয়।

প্রত্যহ বাসন মাজে, জল তোলে বেলা অবেলায়
যায়ো বাসনের মতো আজো তার ক্ষয় শাদা মন
এ-কাজে ও-কাজে মেলে দিন কাটে অস্থির খেলায়।
নিষ্ঠায় নিশ্চিন্তে মেপে না-দেখেই পুণ্যের ওজন
সন্তিন সন্ধ্যায় হটে গাঢ় ক'রে এয়োতির রেখা
কল্পনায় তুলসী-তলে জেলে দেয় রাত্রির ছন্দ!

স্বপ্নের আঠারো শিবরাত্রির সাধনা শেষ ক'রে
হয়তো বা অন্ত এক জন্মিতায় স্বামীকে জেনেই
দিয়েছিল মন ; আজ মোহের বসন্ত গেছে ক'রে,
সে-লোকটা ফিরে গেছে প্রথমার পুরোনো দিনেই।
তাই মহাভারতের এ-যুগের এও কি লিপিকা
বিরহের চিরতীর্থে উপমার আশ্চর্য প্রত্যয়!

চৈত্র ১৩৬২

প্রত্যহ অবাক হই, কাজের অরণ্যে প্রতিদিন
যখন তাকেই দেখি আবশ্যক ফুলের মতন,
হৃদয় পাপড়ি মেলে প্রতি ব্যস্ত দিবসের ক্ষণ
শোষ করে ; শব্দহীন গানের সৌরভ-সম্ভাষণ
প্রতিটি প্রাণের জন্য অধীর আনন্দে দুলে ওঠে
দৈনের দিগন্তে আনে বর্ণের বিচিত্র সমারোহ।

সতী নয়, পার্বতী

নিশি-পাওয়া ঘরে আশায় জোনাকি জেলে
আর কতকাল কাটাবে, ঠেকাবে কড়,
শুকনো ফুলের পরাগে অশ্রু ঢেলে
আর কতদিন সাজাবে বাসর ঘর।

আকাশের মতো হায়-হায় চোখ মেলে
আর কতকাল বাতাসে ছড়াবে জ্বালা ?

এপার ওপার কাকের কলহে ভরা
কোকিলের দিন ঘুরেছে তেপান্তরে
মাথা খুঁড়ে মরে, মনের নদীতে চড়া
কামনার বালি এদিকে ওদিকে ওড়ে।

চতুষ্কালের যাই-যাই বর দিন
তোমাকে দিলো কি তৃষ্ণায় নীল মালা ?

পলাশের কাল স্মৃতির চিতার জলে
গজাসুর দিনে তবুও না যেনে রতি
শ্মশানশিবের ধ্যান ভাঙাবেই ব'লে
তোমার শপথ সতী নয়, পার্বতী !

তাই কি পৃথিবী তোমাকে দেখেই জাগে,
তোমাকে দেখেই আমারো জাগার পালা ?

কবিতা
চৈত্র ১৩৬২

প্রমিতি

প্রভাকর সেন

কোমল পাতার আভা এলুমের শাখে,
দুয়েকটি ঘাসফুল পাথরের বুকে,
দুপায়েরা ছত্রভঙ্গ হাওয়ার চাবুকে,
ঘটনা কুর্নিশ করে সম্ভাষণাঙ্কে।

হালকা মেঘের ছায়া তারি জমা জলে,
নবীন ডানার শব্দ প্রায় স্তব্ধ রোদে,
অনিবার্য ফাল্গুনের শেষ অবরোধে
শিথিল শীতের মুঠি প্রতি পলে-পলে।

মুখর হাতের চাপ হাতে ঘর্মার্দ্রীতি,
খেলেছে চোখের আলো চোখের আলোতে,
আবার দিয়েছে ছেলে আলোতে কালোতে
এ ফাল্গুন অন্য যত ফাল্গুনের স্মৃতি।

স্মৃতি ছাড়া অন্য আর কী প্রমিতি আছে?
কত দূরে আছো তুমি, তবু কত কাছে।

দুটি কবিতা

সুরজ-মুখ

অর্চন জানগুপ্ত

লেবুর খোসার মতো অমসৃণ মাটির দেয়ালে
কমলা রঙের আলো ঘুছে গেল, শুপাকার খড়ে
আঁটি-আঁটি সোনাগুলি ম্লান হলো, পথের সিঁদুরে—
বলিষ্ঠ বন্ধুর যুবা, অপর্যাপ্ত কটিবাসে তার
শিল্পের সংকেত, আর চ'লে গেল গ্রামান্তের মেয়ে,
কাঁচুলির ছিদ্রপথে দুই কালো আঙুরের মতো
একটি স্তনের বোঁটা, ঘরে-ফেরা উড়ুচালকের
বিষণ্ণ সঙ্গীত ঘুরে—লাঙল চালানো আকাশের—
উৎক্ষিপ্ত মেঘের নিচে ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখ বালিহাঁস
সুরজ-মুখের বিলে উড়ে গেল এ-রাত্রির মতো।

একান্তে এ পৃথিবীর জন্ম মৃত্যু মৈথুন সংগমে
নির্বাসের পথে চলে স্ত্রীপুরুষ আর সমকামী,
পত্তর উরুতা নিয়ে অপার্থিব সন্ধ্যায় এখানে
আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন সুন্দর ঈশ্বর।

ব্রিজ্-এ

ব্রিজ্-এর ওপারে সারাদিন ওরা পাথর কাটে।
কালো-কালো ওরা একদল লোক। গরম হাওয়া
ঘর করে আর হুহু করে মাঠ। হলুদে শিখা
লেয়ালকাঁটায় ঝাড়লণ্ঠনে। অনেক হাতে

কবিতা

চৈত্র ১৩৮২

গাইতি শাবল ওঠে আর পড়ে। নত পিঠে
রৌদ্রচাবুক কেটে-কেটে বসে। আকাশ পোড়ে।

কোনো কালো দেহ : রৌদ্রশিহরণ পাথুরে পেশী :,
সিক্ত কপালে এক গোছা চুল ধুলোয় সাদা :
ওর বাহুমূলে আদিম কালের রোমশ রোদের
সারা ভারতের যুগে-যুগে জমা ঘামের ধারা।
অনেক দূরের গ্রাম থেকে আসে সোনার ভোরে.
সন্ধ্যায় নীলে ফিরে যায় সেই ধূসর গ্রামে,
যাকে সারাদিন রোদে ভিজে ওরা পাথর কাটে
ইতিহাসে আর রিজ্-এর ওপারে শূন্য মাঠে॥

ধবল হ্রদ (দূর হ্রদ) হ্রদটির আরো দক্ষিণে জলাশয়ের ধ্বংসাবশেষ. অবশ্য পাল বাদক ভোজে রাজপুত সাম্রাজ্যের কীর্তি, যিনি যা সংলগ্ন অঞ্চলে প্রাচীনতম হিন্দু নিদর্শন। রিজের উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে পাহাড়ি এলাকার নাম The Ridge।

দেবযানীর স্মরণে কচ

বুদ্ধদেব বসু

মাঝে-মাঝে, মাঝে-মাঝে, অবিরাম, যখন তোমারে
ভাবি, আজো দূরে, বৈতরণীপারে, অতিথিবৎসল
পাতালের ছায়াতলে, যেখানে বসন্ত আসে দেরি ক'রে,
গাছে ফোটে অল্প ফুল, অল্প তারা নিঃশব্দ চোখের জল
ফেলে যায় তাদের উদ্দেশে যারা কোনোদিন ফিরবে না আর ;—
টেনে ধরে তখন ফিরিয়ে আনি মৃত্যুভয়, মরুল, সম্বল
এই জ্যোৎস্নার, চূর্ণ করি নির্মোঘ চাঁদের ভাঁড়,
আকাশেরে টুকরো ক'রে, সুরাশায়
আসুর দুখের মধ্যে নির্জীব জাকড়ার মতো ছিঁড়ে—
তারপর অন্ধ, হিম, উদার উজ্জ্বল
প্রলয়ের কলরোলে ফিরে পাই আদিম আঁধার—
যেখানে নতুন সব জন্ম নেবে : তুমি, আর তোমার চোখের জল,
এমনকি আমার কামনা। কিন্তু কেউ তাকায় না ফিরে,
শোনে না আমার কথা। হাসিমুখে, অবিকল,
চাঁদ চেয়ে থাকে, বসন্ত ঝরে না দেরি, নির্বিকার
হাসা দেয় মলয়, ফুলের গন্ধ ; চরাচর বিস্মৃতিবিহ্বল।
তাই আমি নিরুপায়। যত ভাবি, যত মনে পড়ে,
তবু বাঁধ ভাঙে না, ছেড়ে না এই মৌলিক শৃঙ্খল
ফিরতেই। অতএব থাক সব, থাকো তুমি। আমি করজোড়ে
দেবতারে বলি, যেন ত্রিভুবনে কোথাও উজ্জ্বল
হ'য়ে ফুটে থাকে চিরকাল তার চোখ, আমার স্মৃতির তার
দেয় তার আলোর তরল ক'রে। তা-ই যথেষ্ট আমার।

তোমার কথা ভাবতে গিয়ে
উপড়ে আনি চাঁদ,
আকাশটাকে টুকরো ক'রে ছিঁড়ি ;
পাশড়ি খুলে এলিয়ে পড়ে
পরমাণুর বাঁধ
আর্তনাদে ভাঙে তারার সিঁড়ি।
মণি, আমার মণি, আমার সোনা,
তোমার পরে নাস্তি শুধু
রইলো আরাধনা।
আগুন, জল, অমল নীলে
শুদ্ধে তুমি মিলিয়েছিলে,
হারহারা দৃশ্য আজ
হারিয়ে ফেলে ছায়া ;
তোমার কাছে স্বপ্নের ভারে
নিখিল ডোবে অন্ধকারে,
মুক্তি ছুড়ে ছড়িয়ে যায়
অসীম অসনায়া—
এবং এক নূতন আত্মমরী,
মণি, আমার সোনা, আমার মণি।

হায়রে এ-সব ইশে শুধু
ব্যক্তিগত সাধ—
দিগন্তরেও কাঁদে না ক্রন্দসী ;

সম্প্রতিক প্রশ্নের
পূর্ণ প্রতিবাদ
অক্ষিতেরেই নিত্য করে সেবী।
মণি, আমার মণি, আমার সোনা,
কোথাও নেই, কেবল এই
শোণিতে যন্ত্রণা।
তাহ'লে থাক নিটোল সবি,
হৃদয়হীন রঙিন ছবি,
কঠিন জড়ে কাঁপন তুলে
মোমটা-মেয়া ভ্রূণ;
তুমি সে-প্রাণ, আবছায়ান,
তাই তো আর বাজে না গান,
ছন্দে-বাঁধা বিলয় থেকে
বিশ্ব ফোটে পুন—
এবং হয় তোমার জানে ধনী,
মণি, আমার সোনা, আমার মণি।

ভুলেও করি না উচ্চারণ
নাম, তোমার নাম—
পাছে ক্ষণিকের বিস্মরণ
আনে উন্মাদ বিস্ফোরণ,
পাছে সত্তার সীমানা ভাঙে
প্রাণ, আমার প্রাণ!

কবিতা

চৈত্র ১৩৩২

এ যেন স্বপ্ন ঘুমের নেশা :
নেই, কিছুই নেই—
অথচ বিশ্ব রয়েছে মেশা
অজ্ঞান স্বপ্নেই।
পাছে সে-ঘুমের উন্মোচন
করে বাস্তবের দারুণ পণ,
তাই যামপাল-যামিনী জাগে
গান, কেবল গান!

ভাষা ও রাষ্ট্র

বুদ্ধদেব বসু

আমি রাজনৈতিক নই, কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠির সঙ্গে যুক্ত নই, আড্ডায়-বৈঠকায় ব'সেও রাজনীতির চর্চা আমি করি না। এবং আমার মধ্যে দেশপ্রেম নেই। এই পৃথিবী নামক গ্রহের কোনো-একটি অংশে দৈবাৎ নিক্ষিপ্ত হয়েছি ব'লেই তার মধ্যে বড়ো-কিছু দেখতে পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। 'সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি'—এই ছন্দোবন্ধে আমার মন কখনো সাড়া দেয় না।

আমি লেখক ; বাঙালি লেখক না-হ'লেও বাংলা ভাষার লেখক। কাজের কথা, বুদ্ধির কথা, এমনকি হয়তো মনের কথাও কখনো-কখনো অন্য ভাষায় বলতে পারি, কিন্তু প্রাণের কথা বাংলায় ছাড়া বলতে পারি না। এবং এই প্রাণ, বা অচেতন মন, তার কল্পনাগুলিকে ভাষায় মূর্ত ক'রে তোলাই আমার নিরন্তর প্রয়াস। তার ফলে আমি একটি অদৃশ্য সূত্রে যুক্ত হ'য়ে আছি সেই কয়েক কোটি মানুষের সঙ্গে, যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাঙালির এবং বাংলা দেশের সঙ্গে এই ভাষাই আমার প্রধান বন্ধন। এমনকি হয়তো একমাত্র।

এর মানে এ-কথা হ'লো না যে আমার মনোলোক থেকে অবাঙালি বাদ পড়েছেন। আমি ইংরেজ নই, য়োরোপীয় নই ; অথচ ইংরেজি ভাষার সাহায্যে পশ্চিমী লেখকদের সঙ্গে নিত্য-নূতন সৌহার্দ্যবন্ধন আবিষ্কার করছি। ঠিক তেমনি, যিনি বাংলা ভাষা শিখবেন, তাঁর জন্মস্থান যেখানেই হোক না, তাঁরই সঙ্গে আমার মানসিক বাণিজ্য চলতে পারবে ; এবং যিনি তাঁর নিজের ভাষায় আমার রচনা অনুবাদ ক'রে নেবেন, তাঁর সঙ্গেও। কিন্তু প্রথম উচ্চারণ মাতৃভাষাতেই হ'তে হবে ; সেখানে লেখক (চিত্রশিল্পী এক্ষেত্রেও তা মনে) বিতাড়িত, নির্বাসিত বা মৃত হ'লেও, স্বদেশবিরোধী হ'লেও, স্বদেশের সঙ্গে ক্ষমাহীনভাবে যুক্ত থাকেন। লেখকের মতো এমন অনিচ্ছুক ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক আর নেই।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিয়েও এই কথা। আধুনিক জগতে নেশন নামে যে-ধারণা প্রচলিত আছে তার ভিত্তি কোথায় খুঁজতে গেলে ভাষা ছাড়া আর উত্তর পাওয়া যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু জাতি যারা বেঁধেছে : সেই বিচিত্র প্রজাসমূহকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে ইংরেজি ভাষা। ইংরেজ, স্কচ, ওয়েলশ ও আইরিশে স্থানীয় ঐতিহ্যগত প্রভেদ নিশ্চয়ই আছে (ঝাড়ুড়া ও শ্রীহট্টের হিন্দু বাঙালিতেও প্রভেদ কম নয়), কিন্তু বাইরের জগতের কাছে তারা সকলেই 'ইংরেজ' নামক একটিমাত্র ধারণার মধ্যে গৃহীত হ'তে পারে : ওয়াল্টার স্কট, টমাস, ডিলান টমাস, এরা তিনজনেই 'ইংরেজি' সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেছেন, এবং আয়র্লণ্ডের পূর্ণস্বাধীনতা লাভের পরেও আইরিশ ও ইংরেজ পরস্পরের কাছে কোনো অর্থেই 'বিদেশী' হয়ে যায়নি। অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রিক অবস্থা সাম্প্রতিক ইতিহাসে বহুবার বদলেছে, কিন্তু যেহেতু 'অস্ট্রিয়ান' নামক কোনো ভাষা নেই, পৃথিবীর কাছে অস্ট্রিয়া জর্মনদেশেরই অন্তর্গত ; অস্ট্রিয়ার কবি রিলকে বা সুইৎসার্ল্যাণ্ডের কবি স্পিটেলার—এঁরা জর্মন মানসেরই সন্তান ও প্রতিভূ। যে-দেশের স্বকীয় ভাষা নেই বা সে-ভাষা পরিণত নয়, অন্য একটি বড়ো ভাষাকে আত্মসাৎ ক'রেই সে মনের দিক থেকে বাঁচতে পারে। এর আর-একটি উদাহরণ ফরাসি-ভাষী বেলজিয়ম।

বলতে চাচ্ছি যে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রধান বন্ধনই হ'লো ভাষা। ধর্ম এক না হ'তে পারে, ঘরকন্নার অভ্যেসও ভিন্ন হ'তে পারে, কিন্তু যে-প্রজাসমূহ এক ভাষায় কথা বলে তারাই একটা 'দেশ' বা 'রাষ্ট্রে'র স্বাভাবিক অধিষ্ঠান ; সেই সহজাত ভাষার উপরেই 'রাষ্ট্র' নামক পরিকল্পনার স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা। এবং 'রাষ্ট্র' ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে, কিন্তু ভাষা ছাড়া পারে না।

আমাদের ইংরেজ শাসকরা ভারতীয় ভাষাগুলিকে অবজ্ঞাভরে 'dialect' বা 'vernacular' বলতেন ; কিন্তু (আর বোধহয় তারই প্রতিঘাতে) ইংরেজ আমলের আরম্ভেই বাঙালি তার ভাষা বিষয়ে সচেতন হ'লো, সচেতনভাবে তারা ভাষাকে ভালোবাসলো। এ-ঘটনা ভারতের অন্য কোথাও তখন ঘটেনি, এখনো সর্বত্র ঘটেছে ব'লে মনে হয় না। বাংলার দুর্যোগ 'ছেয়াত্তরের মন্বন্তর'র সময়েই বাংলা গদ্যের জন্ম এবং পদ্যের পুনর্জন্ম হ'লো ; য়োরোপের অভিঘাতের ফলে

বাঙালির মন ইংরেজি ভাষার মধ্যে আত্মবিলোপ চাইলো না, চাইলো মাতৃ-ভাষার পরিণতিসাধন। এবং এরই ফলে বাঙালির মধ্যে যে-সংহতিবোধ জেগে উঠলো, তা-ই ব্যাপ্ত হ'য়ে ক্রমশ পরিণত হ'লো ভারতীয় জাতীয়তাবাদে, সর্বভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের সেখানেই উৎস। বাংলা ভাষা যেখানে-যেখানে বলা হয়, সেই সমস্ত অংশ নিয়েই বাংলাদেশ, এই বিশ্বাসের প্রেরণাতেই সে প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ করেছিলো, আর দ্বিতীয় বঙ্গ-ভঙ্গের বেদনাও ফলতে পারলো না। নিশ্চয়ই, পদ্মার দুই তীরেই, এখন মানুষ অনেক আছেন যাঁদের কাছে পূর্ব পাকিস্তান বাংলার মনোলোকেরই অংশ। রাষ্ট্রের বদল রাতারাতি হ'তে পারে, কিন্তু হৃদয়ের বদল কত দুঃসাধ্য তার প্রমাণস্বরূপ বাংলা ভাষা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাতের উল্লেখ করা যায়।

কোনো দুই দেশ দূরবর্তী হ'য়েও এক ভাষার কথা বললে তারা আত্মীয় হয়, যেমন উত্তর আমেরিকা ও ইংলণ্ড, স্পেন ও দক্ষিণ আমেরিকা। এবং যদি ভৌগোলিক সান্নিধ্য থাকে, তাহ'লে ভিন্ন রাষ্ট্র হ'লেও তারা সমমনস্কতাপূর্ণ না-হ'য়ে পারে না। কিন্তু যেখানে ভৌগোলিক সান্নিধ্য আর ভাষার সমতা দুটোই আছে, সেখানে প্রজাসমূহ আত্মীয় নয়, একাত্ম হ'য়ে ওঠে। পূর্ব ভারতের যেখানে-যেখানে বাংলা বলা হয়, তা সবই মাটির এবং জলের অণুতে-অণুতে পরস্পরসম্পৃক্ত—সেটাই যথার্থ বাংলাদেশ—রাষ্ট্রনীতির খামখেয়ালে তার কখনই যা নামকরণ হোক না। সেই দেশে বাংলা ভাষা যদি প্রাধান্য না পায় তাহ'লে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা একেবারেই অর্থহীন হ'য়ে পড়ে।

ইংরেজ আমলে যা ছিলো 'vernacular', স্বাধীন ভারতে তার নূতন নাম হয়েছে 'regional' বা 'আঞ্চলিক' ভাষা। এই বিশেষণের অর্থ কী, তা ভেবে পাওয়া শক্ত, কেননা পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাই 'আঞ্চলিক', কোনো-কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সচল—ইংরেজি, এবং অংশত ফরাশি ছাড়া, আর কোনো ভাষাকেই আন্তর্জাতিক বলা যায় না। ইতালিয়ান, নরোয়েজিয়ান বা জাপানি ভাষার প্রচার খুব বেশি নয়, কিন্তু কেউ তাদের 'আঞ্চলিক' ব'লে উল্লেখ করে না, এক সভ্য দেশের ভাষা রূপেই তারা স্বীকৃত ও সম্মানিত। বাংলা, মরাঠি, তামিল প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার স্বাভাবিক মর্যাদাও সেই রকম, কিন্তু এই নূতন

বাষকরণে তাদের আতিজাত্যই শুধু উপেক্ষিত হয়নি, সত্যেরও অপলাপ ঘটেছে। ভারতের কোনো একটি ভাষাও যদি 'আঞ্চলিক' হয় তাহ'লে প্রত্যেক ভাষাই তা-ই; সারা ভারত স্বাভাবিকভাবে কোনো-একটি ভাষাও বলে না, এবং এই ভাষাগুলি যাদের মাতৃভাষা তাদের সংখ্যা কোনো-এক ক্ষেত্রেও অন্যদের তুলনায় অত্যধিক নয়। অথচ 'আঞ্চলিক' বললেই অধিকার সংকুচিত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়, শুধু ভারতের রঙ্গমঞ্চে নয়, এমনকি সেই ভাষার আপন সীমানারই মধ্যে। পাছে এই আশঙ্কা রূঢ় বাস্তবে পরিণত হয়, সে-কথা ভেবেই বাঙালির মন আজ বিক্ষুব্ধ। বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব বিষয়ে প্রথম কথা হ'লো এই: তাহ'লে বাংলা ভাষার অবস্থা কী হবে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দেখিয়ে বলা যায় যে ভারতবাসীকে নেশনে পরিণত করার জন্য সারা দেশে একটা সাধারণ ভাষা চালাতেই হবে—প্রয়োজন হয় তো কিছুটা মুশকিল ক'রে। কিন্তু ভারতের সঙ্গে মার্কিনদেশের ভৌগোলিক আয়তনে আর জাতিগত বিন্যাসে মিল থাকলেও অন্য কিছুতে মিল নেই। মার্কিন দেশ নতুন; মুষ্টিমেয় 'ইণ্ডিয়ান' বাদ দিয়ে তার সমগ্র প্রজাবৃন্দ মাত্র কয়েক পুরুষ আগে বিভিন্ন বিদেশ থেকে এসেছিলো, এবং যন্ত্রবহুল মার্কিন সভ্যতার বিশেষ ক্ষমতাই এই যে নানা দেশ থেকে প্রজা গ্রহণ ক'রে সকলকেই এক অভিন্ন মার্কিন ছাঁচে ঢালাই ক'রে নিতে তার দেরি হয় না। ভারত সুপ্রাচীন, তার উপর বিভিন্ন জাতিগত ও স্থানগত বৈচিত্র্যকে সে কখনো অস্বীকার করেনি, বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য খুঁজিয়ে চলেছে। এখানেই ভারতের প্রতিভার ও সাধনার বৈশিষ্ট্য। আমেরিকার আয়তন ভারতের প্রায় দ্বিগুণ; সেই বিস্তীর্ণ মহাদেশের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে মোটের উপর একই রকম জীবনের ধারা দেখতে পাওয়া যায়: একই রকম খাওয়া, পরা, দোকান, রাস্তা, ব্যবসায়, আমোদপ্রমোদ। কিন্তু ভারতে প্রত্যেক তিন শো বা চার শো মাইল পর-পরই জীবনের গড়ন বদলে যাচ্ছে, আর প্রত্যেকটি ছোটো-ছোটো বৈশিষ্ট্যের পিছনে বহু শতকের ইতিহাস সঞ্চিত হ'য়ে আছে। যে-বিশেষ বলে আমেরিকায় এই সমীকরণ সম্ভব হ'লো, সারা দেশে একই ভাষার প্রচলনও

তারই অঙ্গীভূত ফল। পক্ষান্তরে, আমাদের বিভিন্ন ভাষা, এবং বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহার, এগুলোই ভারতের নিজস্ব সৃষ্টি, তার চরিত্রলক্ষণ। ভারতকে তার ভবিষ্যৎ বিবর্তনের পথে সফলভাবে নিয়ে যেতে হ'লে এই বৈচিত্র্যের হৃদ্যকে স্বীকার ক'রে নেয়া চাই।

অর্থাৎ, সারা ভারত এক রাষ্ট্র হ'লেও কার্যত আমরা এক-একটি সুনির্দিষ্ট ভাষা ও ঐতিহ্যের মধ্যে বসবাস করি, অনেকটা য়োরোপের ভিন্ন-ভিন্ন দেশের মতো। ইংরেজ, জর্মন, ফরাসি যেমন আলাদা, অথচ তাদের মধ্যে সাধারণ ইতিহাসের পটভূমিও ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে, পঞ্জাবি, গুজরাতি, বাঙালি, ইত্যাদিকেও সেই রকম ধারণা করলে ভুল হয় না। য়োরোপীয় বা ভারতীয় সংস্কৃতি নামক একটা সমগ্রকে আমরা অনুভব করতে পারি, কিন্তু তার অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষা ও প্রদেশের ব্যক্তিস্বরূপও সুস্পষ্ট। ক্যাথলিক ধর্ম ও লাতিন ভাষা যা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার বন্ধনে ইওরোপ অথবা ভারতবর্ষ অতীতে যে-ভাবে এক হ'তে পেরেছিলো, আজকের দিনে তার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। আজকের দিনে কোনো আদর্শ নেই, যা কোটি-কোটি মানুষ একবাক্যে মেনে নিতে পারে। ভারতে শেষ সুযোগ পেয়েছিলো ইংরেজরা, তাদের সভ্যতা অনেক বিষয়ে উন্নত ছিলো, এবং ভারতের উপকূলে আধুনিক জগৎকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তারাই নিয়ে এসেছিলো, সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতবাসীকে তাদের নিজ-নিজ ভাষা আর জীবনধারা ভুলিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে গ্রথিত ক'রে ফেলতে তারা যে পারলো না তার কারণ তাদের অক্ষমতা নয়, ভারতের প্রতিভা। আর আজকের দিনে সে-রকম কোনো কল্পনারও আর স্থান নেই, বড্ড বেশি দেরি হ'য়ে গেছে তার পক্ষে, চারদিকেই আত্মচেতনা তীব্র।

তথাকথিত প্রাদেশিকতা ভুলে গিয়ে নিজেকে ভারতীয় ব'লে অনুভব করার উপদেশ আজকাল শোনা যাচ্ছে। কিন্তু নিজেকে বাঙালি বা মরাঠি ব'লে ভাবা যদি প্রাদেশিকতা হয়, নিজেকে ভারতীয় বা ইংরেজ বা চৈনিক ব'লে ভাবাও কি তা-ই নয়—এই আজকের দিনে, যখন এক পৃথিবীতে এক মানুষের আসন রচিত হচ্ছে দিকে-দিকে? কিন্তু যেহেতু 'য়োরোপীয়' বা

'ভারতীয়' নামক কোনো ভাষা নেই, তাই ফরাসি, জর্মন, ইংরেজ, স্পানিয়ার্দের মতো আমাদেরও প্রথম পরিচয় হবে তামিল, কানাড়া, মরাঠি, বাঙালি, গুজরাতি ব'লে। সেটা প্রকৃতিরই বিধান ; আমার গায়ের রং কালো ব'লে যেমন নালিশ করা চলে না, এও সেই রকম। এবং এই বৈচিত্র্যের অর্থ বিরোধ নয়, বিচ্ছেদ নয় ; এই বৈচিত্র্যই ভারতের ঐতিহ্য ও ভবিতব্য, তার চিরন্তন সম্পদ। বিভিন্ন পক্ষের বৈশিষ্ট্য লোপ ক'রে দিয়ে মিতালি গ'ড়ে ওঠে না ; চারিত্রিক ঐশ্বর্য বিকশিত হ'লেই সত্যিকার মিলন সম্ভব হয়। বন্ধুকে ভালোবাসি ব'লে তার সঙ্গে এক বাড়িতে বাসা বাঁধতে চাই না, ভালোবাসি ব'লেই এক বাড়িতে বাসা বাঁধতে চাই না। নিজ-নিজ পারিবারিক বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা থাকলেই বন্ধুতা সফল হ'তে পারে। এ-কথা সকলের পক্ষেই সমান সত্য ; বিহারি, আসামি, উড়িয়া, মলয়ালি যে-কোনো জাতির বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হ'লে তাতে ভারতেরই অবলুপ্তি হবে। আজ ভারতের প্রত্যেক ভাষা পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, চায় আত্মবিকাশের চরম অধিকার, নিজেকে ফলিয়ে তুলতে চায় বৃহত্তম কর্মজীবনে। সেই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে ব্যাহত ক'রে রাজ্যের সীমানা কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিতে চাইলে মানুষের মর্মস্থলে আঘাত করা হয়। এ-সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার সুবিধের কথাটা বড়ো ক'রে ভাবলে চলবে না ; কেননা রাষ্ট্র একটা যন্ত্র হ'লেও তার অন্তর্গত প্রজাসমূহ যন্ত্র নয়—তারা মানুষ—পাঠ্য বইয়ের কাল্পনিক 'economic man' বা 'political man' নয়—রক্তমাংস-হৃদয়-মন-সম্পন্ন জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ—তারা শুধু খেয়ে-প'রে বাঁচতে চায় না, শুধু কম দামে মাল কিনে বেশি দামে বেচতে চায় না, চায় প্রকাশিত হ'তে, আনন্দিত হ'তে, দুঃখ পেতে, ত্যাগ করতে। তাদের যে শুধু খিদে পায় আর খিদে মিটলেই ঘুম পায় তা নয়, তারা চিন্তা করে, অনুভব করে, সংগ্রাম করে ; আদর্শ আছে তাদের, সেই আদর্শ উপলব্ধি করার চেষ্টাও আছে। তার সেই আন্তরিক জীবনে বিঘ্ন ঘটলে তার ক্ষতিপূরণ অন্য কিছুতেই হ'তে পারে না।

['Voice of Bengal' থেকে সংকলিত]

ছন্দ ও কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

[শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর দুটি পত্রাংশ, তাঁর অনুমতিক্রমে এখানে প্রকাশ করা হ'লো ; তাঁর নিজের কাব্য ও ছন্দের পদ্ধতি বিষয়ে এই তাঁর প্রথম উক্তি। পত্র দুটির উপলক্ষ্য 'কবিতা'র গত পৌষ সংখ্যায় 'সমালোচনা', এবং সাম্প্রতিক কয়েকটি সংখ্যায় তাঁর ছন্দ বিষয়ে সমালোচনা ; কিন্তু তাঁর মন্তব্যগুলি উপলক্ষ্যটাকে অতিক্রম ক'রে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, কবিতার লেখক ও পাঠকের পক্ষে তার আলোচনা অবশ্যকর্তব্য।—সম্পাদক]

মস্কো
২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮

• • • কবিতা লেখা এক জটিল সূক্ষ্ম ব্যাপার ; তার মধ্যে কত স্তরের মনন, অনুভূতির সূক্ষ্ম-প্রায়, বহু আয়ত্ত প্রয়োগের চেষ্টা একত্র জড়িত হ'য়ে হঠাৎ দেখা যায় তা ভাবলে নতুন কিছু লিখতে বিধা হয়। সৌভাগ্যক্রমে সমস্তকে বিস্মৃত ক'রে এক-একটি লেখবার মুহূর্ত অনিবার্য আবার ফিরে আসে, সুরু হয় ডুব-সাঁতার দেওয়া। সজ্ঞানে মনকে কিছু শেখানো যায় মধ্যে মধ্যে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কতটুকু সৃষ্টি-ক্ষমতার কালে কাজে লাগে জানি না। আঙুলের অভ্যাস কণ্ঠাগত শুধু ঘিরে বীণা-বাজিয়ে যেমন তন্ময় অঙ্গুলি-চালনা, যেটা ব্যক্তিগত হ'য়েও তারো বেশি। এই সাধনা প্রত্যেক কবিকে শিল্পীকে কণ্ঠাগত নতুন ক'রে নেনে নিতে হবে।

সেদিন হাইফেজ্-এর ভায়োলিন শুনতে গিয়েছিলাম : তাঁর চোখ-মুখ এমন কি মন যেন অন্যত্র কোথায় চলে যায় অথচ ছড়ের একটি টানও মুহূর্তের জন্যেও ভ্রান্ত নয়। সমগ্র শ্রুতিকে অধিকার ক'রে কী আশ্চর্য সংহতি এবং নিঃসঙ্গতার ঐক্যজাল : তার পিছনে কত কঠিন সৃষ্টি-কৌশল এবং আত্ম-বিলীনতার শক্তি। অবাক হ'য়ে দেখছিলাম, শুনছিলাম। Mozart-এর একটি symphony ; Haifetz সেই ইন্দ্রলোক সকলের সামনে উদ্ভাসিত

করলেন। এক হিসেবে প্রত্যেক কবি নিজের কবিতার স্রষ্টা এবং শ্রোতা ও—বাহিরের কান দিয়ে শুনতে শেখা তাঁর ব্যবসায় অন্তর্গত।

আপনার প্রবন্ধ[১] প'ড়ে এই কথা আমার মনে হ'লো।

বন্দর
১৬ মাঘ ১৩৬৩

নামটার বানান "মার্গারিটা"ই[২] থাক: পর্তুগীজ উচ্চারণে ট-এর চেয়ে ঠ-ই কাছে যায়। দৈবক্রমে নিষিদ্ধ পর্তুগীজ রাজ্যে এই ভারতীয় আমি প্রবেশ করেছিলাম—Azores-এ Santa Maria দ্বীপে। Air France-এর প্লেনে এঞ্জিন্ গোলমাল হওয়ায় ঐ সুন্দর দ্বীপে নেমে সমুদ্র-দিগন্তরেখা করুণ, দূরান্ত, দরিদ্র গ্রামে দু-চারটে করেক ঘণ্টা ছিলাম। গত শ্রীষ্টাব্দে ছুটিতে। তা না হ'লে ভারতীয়কে এখন পর্তুগীজ সীমানায় ঢুকতে দেয় না, বিশেষ কারণ ব্যতীত। কিছু ঘটনা, কিছু কল্পনা ঐ আমার মলিন দ্বীপ এবং ঐ দ্বীপের বাসিন্দে সুহৃৎ অন্তরঙ্গ য়ুরোপ থেকে ফিরিয়ে কবিতা লিখেছিলাম। আপনাদের ভালো লেগেছে জেনে গভীর তৃপ্তি বোধ করছি। "চলতি" পংক্তিগুলিও[৩] ঐ দেশের ভাবায় মেলানো চিত্রপর্যায়ী, যদিও সংক্ষিপ্ত।

কোনো নতুন কাব্যের সূচনা এই সব কবিতায় আপনি দেখেছেন, হয়তো আমার বিরল গদ্য কবিতার ধারা অল্প বাড়বে। কিন্তু কী করি বলুন। বুকের ভিতরে গীতিকাব্যের সূচনা সমগ্র হয়ে উঠতে চায়, বাংলা ভাষায় গুঞ্জিত তার সকরুণ অনুভব করি অথচ কেবলমাত্র সময়ের অভাবে শিল্পবেদটুকু ভিড়ে যাবার বহুতর টুকরো কাজে কোথায় হারিয়ে যায়। অভিযোগ ক'রে লাভ নেই। যান্ত্রিকের ছুতুল জীবনে প্রবেশ ক'রে বাংলা গীতিক লেখার এই সাধনা: এবং অনিবার্য আমার এই সিদ্ধির অভাব। তবু মধ্যে মধ্যে চলতি সংবাদ

১. 'অমিয় চক্রবর্তীর স্বপ্ন-বহ'। 'কবিতা', পৌষ ১৩৬২
২. 'কবিতা'র বর্তমান সংখ্যায় 'লাস্টা মারিয়া দ্বীপে' দ্রষ্টব্য।
৩. 'যোগাযোগ' ১৩৬৩-এ প্রকাশিতব্য।

"কবিতা"র দপ্তরে পৌঁছিয়ে দিই। আখ্যায়িকায় রঞ্জিত দু-চারটি পদ রচনা করতে পারলে সুখী হতাম—পৃথিবীতে এসে যা দেখা গেলো তার বিষিত সংক্ষ একটি আক্ষরিক পরিচয়, সাক্ষীর বিমুখ আত্মভাষায় স্বীকৃতি। কিছু আপত্তি, কিছু সব বিরুদ্ধতা তুলিয়ে-দেওয়া আশ্চর্য সংসারের স্রোতোধ্বনি, আশ্চর্য গভীর কাহিনী যা দেখা-শোনা যায় না। তাহাতে আরো গাঢ় অথচ স্বচ্ছ করতে পারলে জীবনের ভঙ্গী আরো বেশি ধরা-ছোঁয়া যেতো; ইচ্ছে করে প্রতি ঘটনার সঙ্গে তার নাট্যগত মুক্ত পরিমণ্ডল ঠারে ঠোরে পৌঁছিয়ে দিই। কিন্তু এর জন্যে শুধু অভিজ্ঞতার শক্তি নয়, সময়ও চাই। অনেকখানি সময়, পরীক্ষার অবসর, কাগজের নির্মম অপচয়। ঐ সাদা-মাটিয়া ঘাসে যদি বন্দী ক'রে রাখতো তাহ'লে হয়তো দশরকম ঘাংলা পীরিতে 'দাসখৎ লিখে একদিন উদ্ধার পেতাম। (ঠিক এখন পশু পীজেরা এই যুক্তি শুনতো না) বাধ্য হয়ে মনের মধ্যেই সাদা মাটিয়া আবিষ্কার করতে হবে, এবং তার চতুর্দিকে পাখা-মেলবার আকাশ, নয়তো উপায় নেই।

বলতে ভুলেছিলাম: "দিঘি" কবিতায় আপনি বিবিধ ছন্দের মিশ্রণ লক্ষ্য করেছিলেন, (অথচ একই ছন্দের গম্ভীরে তাদের মিলিয়ে রাখতে চেয়েছি); তাতে খুব উৎসাহ পেয়েছিলাম। কিছু অভিসন্ধি ঐ কবিতায় লুকোনো ছিল, ধরা পড়ব তাবিনি। "দূরবাসী"র একটা পীরিকে ("কিছু নয়, কিছুই নয়…") ঐ রকমের প্রক্রিয়া ছিলো, কিন্তু অন্যভাবে। লক্ষ্য করেছি, বিষয়বস্তু যত সূক্ষ্ম, বিহ্বল, দূরবর্তী সেই অনুপাতে ছন্দের বাক্যের দুঃসাহসও অনেক সময় বেড়ে যায়; সঙ্গতিও রক্ষা করা সহজ হয়।

ঠিক কবিতা রচনার কালে নানা সূক্ষ্ম পরীক্ষা অজ্ঞাতে চলতে থাকে, পুরোপুরি মনের কোঠায় পৌঁছলে যুক্তির দৌরাত্ম্য প্রবল হয়ে ওঠে। নানা পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে যুক্তিতর্কের জোরে একমাত্র পথ নেয়া বড়ো কঠিন, এমন কি নিজের কৌশলও দ্বিধান্বিত প্রশ্ন হ'য়ে দাঁড়ায়। পরে এবং আগে বহু অসরৎ করা চাই। তার-বাঁধা, ঘাঁড়-টানা, আলাপ করা, সুরের মিশোল। কিন্তু পুরোপুরি আলাপের সময় ডুব-সাঁতারের বেলা, তখন আঙুলে কুহক লাগে, "magic hand of chance"-লোকের ব্যাপার। অন্তত এই ভাবে কোনো

কোনো শিল্পী অন্বেষক একান্ত কারিগরির সন্ধান পান। যেমনার পরমতা, যা তাপকে আগুন ক'রে তোলে তার কথা সব সত্ত্বীর মূলে, কবি যদি জেদের বশে ব'সে তার সন্ধান হারান তাহ'লে অবশ্য সবই লোকসান তা বলাই বাহুল্য)।

একবার ভালো ক'রে ছন্দের প্রসঙ্গে নামব। "কবিতা"য় যে আলোচনা জ'মে উঠেছে তাতে আমার কৌতূহল সজাগ হ'য়ে উঠেছে, সতর্ক হ'য়ে ভেবে নেখেছি। কিন্তু এখনো বোধ হয় আমার দিক থেকে কিছু না বলা ভালো। যে যন্ত্রের প্রয়োগে উদ্যত হয়েছি তাতে আরো এগিয়ে যেতে না পারলে বোধ হয় বলবার অধিকার পাবো না। নিজেকে ব্যক্ত করবার বেগে কোন সিঁড়িতে উঠে এসেছি—বা নেমেছি—তা ঠিক জানি না। যতটা পারি কাব্যছন্দের মধ্যে থেকেই তার পরিসর বাড়াবার কিছু আয়োজন করেছিলাম। তা ছাড়া হয়তো আমার উচ্চারণ পদ্ধতিও কিছু বদলেছে, যা স্বতন্ত্র, হয়তো তাকে মানবার কোনো কারণ নেই। [প্রথমে লিখেছিলাম "ভারতী আকাশে"। তারপর অত্যন্ত ব্যক্তিগত অভ্যাসের সাহসে লিখলাম—"এই তো এলেন। ভা—র—ত—বর্ষের্—কাশে।" যেন মৃত্যুত্তরের বীরোচ্চারিত এক একটি অক্ষর ঐ দ্বানকালপাত্রের অনুযায়ী সংস্কারে প্রলয় পেল। কিন্তু যদি বলেন সমগ্র কবিতার কাঠামোয় ঐ লাইন গদ্য-ধর্মী, এবং বহিষ্কৃত তাহ'লে তর্ক করব না।]

অবশ্য ফরাসী Vers Libre-এর এলাকায় বারে বারে নেমেছি। কিন্তু আপনি ঠিকই বলেছেন আটপৌরে গদ্যের ঈষৎ ছন্দ-মিশ্রিত চালচলন (যেমন Whitman-এর free verse-এ) আমার কাব্য-সাধনার একান্ত পরিপন্থী। আমার নিজের দিক থেকে বলব ঢের বেশি তৃপ্তি পাই অবলীন কলহংস এবং সংহত Verse Libre-এর রাজ্যে, যেখানে ব'সে লিখতে পারি "দুরন্ত আবদ্ধ পথে। তোমার দুখের জ্যোতি পৌঁছিয়ে যেবে।" জানি না ঐ মণি-পদ্মের আরাধনা—কবিতার পরতে পরতে ছন্দের নিক্কণ—যা আমার মনে বাজে—তা বাহিরে স্পষ্ট হয়েছে কিনা। না যদি হয় তাহ'লে আর কিছুই বলবার নেই।

আপনি জানেন কাব্য-রচনায় আমার দাবি অতি সামান্য, সুরে থাকি, ছন্দে উচ্চ ও গলায় আওয়াজ যে কোথাও একটুও পৌঁছবে সে আশা দুরাশা মনে

আলো-ছায়া

দিনের প্রখর আলোয়,
সে এক জাগ্রত বিস্ময়।
মেদুর সন্ধ্যার নির্জনে,
কেন তাকে স্বপ্ন মনে হয়,—

সে নিয়ত আলোছায়া বুনে
ধূসর রেখায়—তার মন,
(কোনোদিন জানবে না কেউ)
অন্ধকার নদীর মতন।

অগ্নি

সেও কি পড়েছে ধীরা হৃদয়ের অসংখ্য বন্ধনে,
সেও পোড়ে, যে আমারে অহর্নিশি পোড়ায় আগুনে ?
চেয়ে থাকি কালের জানালা-পথে আশায় উৎসুক,
নির্জন আলোয় যদি ফোটে সেই আকাঙ্ক্ষিত মুখ।
দিন যায়, রাত্রি আসে—অন্ধকার নিঃসঙ্গ কাঁদায়,
নিরন্তর কী এক দুঃসহ দাহ তোমাকে চাওয়ায়।

রঁদেল-পঞ্চক

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

১

[সন্ধ্যা]

রাত্রি আর নয় সুদূর,
আকাশ শোনে ছায়ার ঝড়।
সান্ধ্য যারা একটু নিক
রঁদেলে-আনা পুরোনো সুর!
রাতের ডাকে তার বিধুর
হৃদয় চোরা পড়লো ঠিক?
রাত্রি আর নয় সুদূর
আকাশ শোনে ছায়ার ঝড়।
তৈরি হও মন মধুর
রাত্রি আসে; দিগ্বিদিক্
ছায়ার মৃদু মন্ত্র নিক;
স্মরণ হোক বসন্তাতুর।
রাত্রি আর নয় সুদূর,
আকাশ শোনে ছায়ার ঝড়।

২

[প্রথম রাত্রির]

অতিসারে তুমি কে গো এলে?
দেখেছি দুয়ার খোলা-মেলা;
নেয়া-দেয়া ছলে কোন খেলা
অবলীলাভরে যাবে ফেলে?

অখ্যাতি-লাজ সব ফেলে
এলে যদি এলো এই বেলা।
অভিসারে তুমি কে গো এলে?
হেরেছি দুয়ার খোলা-মেলা।
এতদিনে পথ খুঁজে পেলে
মন নিয়ে ক'রে হেলা-ফেলা?
জীবনের এই মধুমেলা
যাবে না তো কেহ পায়ে ঠেলে?
অভিসারে তুমি কে গো এলে?
হেরেছি দুয়ার খোলা-মেলা।

৩

[মধ্যরাত্রি]

আকাশ-ধোয়া রাতের নীল
নীলাম্বরী শাড়ির খুঁটে
পড়েছে বাঁধা সোহাগে লুটে;
সহে না দেহ-দুয়ারে খিল।
বাধার পট গিয়েছে উঠে
অতনু রচে তনুর মিল;
আকাশ-ধোয়া রাতের নীল
পড়েছে বাঁধা শাড়ির খুঁটে।
জানালা-তলে তাপস ঝিল
উতল হ'লো কী ঢেউ উঠে।
দখিন ঘোরে কে মাথা কুটে
বলেছে—'খোলো দুয়ার খিল।
আকাশ-ধোয়া রাতের নীল
মুক্ত করো শাড়ির খুঁটে।'

৪

[শেষরাত্রি]

এখনো রাত রয়েছে বাকি
কী ভিতু, যাবে এখুনি কেন ?
উঠছে ডেকে কোথায় যেন
বসন্তের অতিথি পাখি।
ঘুমোলো ব'লে ভাবছো নাকি
সুখের রাত নিমেষ হেন,
এখনো রাত রয়েছে বাকি
কী ভিতু, যাবে এখুনি কেন ?
এখনো ঘুম ছাড়েনি আঁখি
আঁধার জমা নিবিড় হেন
শাশুড়ির কতোরা যেন
মনের রং অধরে আঁকি ;
এখনো রাত রয়েছে বাকি
কী ভিতু, যাবে এখুনি কেন ?

৫

[প্রভাতে]

জীবন-জবনদের রোল
ছুটেছে সাড়া চতুর্দিকে।
রোদের জালি পাতায় চিকে
কে দিলো মেলে নীল-নিচোল।
টাপায় ডালে লাগলো দোল—
প্রথম রোদে আবির ছিকে ;
জীবন-জবনদের রোল
উঠেছে জেগে চতুর্দিকে।

ঢাকবে কিসে চোখের কোল
অবসাদের কাহিনীটিকে ?
লুকোতে ছোটে রাতেরি দিকে
হতাশে দুটি বাহু বিলোল।
জীবন-অবসাদের রোল
উঠেছে জেগে চতুর্দিকে।

চিঠিপত্র

বাংলা সনেট

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু,

'কবিতা'র গত তিন সংখ্যায় প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'সনেটগুচ্ছ' একাধিক কারণে বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

সনেট রচনায় বাঙালী কবির উৎসাহের অন্ত নেই। মধুসূদন-প্রবর্তিত বাংলা সনেটের আদি-রূপ থেকে আরম্ভ ক'রে সনেট নিয়ে সাম্প্রতিক কালেও বহু পরীক্ষা চলেছে। চতুর্দশপদী কবিতামাত্রই যেমন সনেট নয়, সব কটি নিয়ম মেনে নিয়েও সনেট সৃষ্টি করা যায়নি—বাংলা সাহিত্যে এরকম উদাহরণও তেমনি বিরল নয়।

বুদ্ধদেব বসুর এই রচনাগুলিতে সনেট-কাব্যকলার এক আশ্চর্য বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রকরণের দিক থেকে এগুলি নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের দাবী রাখে। সনেটধর্মী কবিতার পয়ারে রচিত জোড়মাত্রার পংক্তিগুলি স্বভাবতই ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। কিন্তু তিন-তিন-দুই মাত্রার বদলে এখানে তিন-দুই-তিন মাত্রার পর্যায়ে নিশ্চয় বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে। নীচে উদ্ধৃত পংক্তি দুটির শব্দবিন্যাস লক্ষ্য করলে এই বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা যাবে :

(১) বাসনা অপরিসীম, কিন্তু কত দুর্বল ইন্দ্রিয় ('সনাতন সংঘর্ষ')

(২) তোমাদের বিরাট খামখেয়াল জয় ক'রে, হৃদয়সভায়

('অন্ধুর উত্তরে')

পয়ারে যুগ্মবর্ণগুলিকে সাধারণত একমাত্রা ধ'রে নেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমান সনেটগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে যুগ্মবর্ণকে বিশিষ্ট করে দু-মাত্রা ধ'রে মেনে নেওয়া হয়েছে। 'আমাদের দিয়ো না দৃষ্টি। বিদ্বেষে ভ'রে আছে মন' ('কোনো কুসুমের প্রতি')—পংক্তিতে 'বিদ্বেষে' কথাটি পড়তে গেলে নিশ্চয়ই তিন-মাত্রার বেশি সময় লাগে।

আঠারো মাত্রার পংক্তি-বিশিষ্ট সনেট (যার ফাঁকে ফাঁকে বাইশ মাত্রার দীর্ঘ লাইনও চোখে পড়ে) থেকে আরম্ভ করে মাত্র দশ মাত্রার ছোট নিখুঁত অনবদ্য সনেট পর্যন্ত প্রায় সব রকম উজ্জ্বল উদাহরণ এখানে পাওয়া যাবে। বিশেষ ক'রে সনেট কবিতার octet বা octet অংশে পদান্ত মিলের যত রকম বিন্যাস সম্ভব বোধ করি তার সবগুলিই উপস্থিত দেখে একটা আবিষ্কারের আনন্দ পাওয়া যায়। আবার ইংরেজিতে যাকে sonnet sequence বলা হয় (যাতে সনেটগুলি যেন পদবন্ধের মতোই একটি ভাবসূত্রে গ্রথিত হয়) তারও নিদর্শন মিলবে 'স্মৃতির প্রতি', 'আটচল্লিশের শীতের জন্য', 'না-লেখা কবিতার প্রতি' প্রভৃতি কবিতায়।

কেবল বহিরঙ্গের জন্য নয়, বর্তমান সনেটগুলি চিত্রগুণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। Abstraction বা বিমূর্ত ভাবনা-প্রয়োগ সনেট-শিল্পীর কাছে অপরিহার্য। কিন্তু সনেটের গঠন-সংহতি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে এখানে রূপকল্পের সাহায্যে পাঠকের মনে ভোতনা সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়েছে। এবং কোথাও কোনো statement বা নিছক বিবৃতির চিহ্নমাত্র নেই। চিত্রকল্পগুলি সবত্রে নির্বাচিত এবং এমনই প্রতিনিধিমূলক যে তারা প্রায় প্রতীকলক্ষণযুক্ত হয়ে ওঠে। শুধু চিত্রসমষ্টি নয়, প্রতিটি চিত্র যেন সমগ্র কবিতার রূপনির্মাণে সাহায্য করে যাতে সে কবিতার একটা পৃথক অস্তিত্ব ধরা যায়। বর্ণনাত্মক না হয়ে তাই রূপকল্পগুলি বিশ্লেষণমূলক হয়ে ওঠে। তার নমুনার জন্য পাতা হাৎড়াতে হয় না।

(১) সিক্ত করে স্মৃতির স্তনের বৃন্ত—দুধের কৌটায় ['ঘর']

(২) অবশেষে যখন মরীচিকার পর্দা ছিঁড়ে, দেখা দেয় প্রথম খেজুর,
বালিতে কালোর মতো প্রসবের চিহ্ন অনুমান ['মরুপথ']

শিশুদের জন্মটি মিছিল
ব'য়ে চলে প্রকাণ্ড পোকার শব, শৈশব যৌবন পার হ'য়ে
['স্মৃতির প্রতি' (২)]

(৪) সাদা, কাঁচা, বুদ্ধদের পরপারে এত কথা অব্যয় কত্তরী,
কঠিন ছিপিতে আঁটা, মদ্যতায় সঞ্চিত আঁধার ['অপেক্ষা']

'কবিতা'-য় এ পর্যন্ত প্রকাশিত সনেটগুলির সংখ্যা সবসুদ্ধ আটাশ, আর সবগুলি রচনাই একেবারে আইলোয়ে চলতি ভাষায় লেখা। দেখে ভালো লাগে. আমরা প্রতিদিন যে-ভাষায় কথা বলি, মনের ভাব প্রকাশ করি, সেই মুখের ভাষাই এখানে অক্ষরে-অক্ষরে রক্ষা করা হয়েছে। আর কথা ভাষার ভঙ্গি পর্যন্ত কী ভাবে কবিতায় সমৃদ্ধি ঘটাতে পারে তাও পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না।

(১) অথচ আমি যদি দিতে চাই, খানা ছলে কেয়া ও তারিখ
['না-লেখা কবিতার প্রতি' (২)]

(২) প্রাঙ্গণে কিছুই নেই ; পারিস তো বধির হয়ে যা।
যা তোর নিজের নয়, তা দেখাতে পারে কোন মুনি ?
['আটচল্লিশের শীতের জন্য' (২)]

(৩) ওরে সেই বরফ-গলানো রক্ত যদি আর না থাকে কিছুই
['আটচল্লিশের শীতের জন্য' (১)-]

(৪) ভালো।—কিন্তু বলো দেখি, হতে হবে আর কতকাল ['নেশা']

বাংলা গদ্য এখনো পর্যন্ত সম্যকভাবে গ'ড়ে না-ওঠায় কবিতার ভাষা-নির্মাণে কবিমাত্রকেই বেগ পেতে হয়েছে। কবিতালেখক এমন একটা ভাষা ব্যবহার করতে চাহা করেন যা সহজেই তাঁর সব রকম চিন্তার ভার বইতে পারে। বুদ্ধদেব বসুর কবিতাগুলি এদিক দিয়ে অনন্য। গদ্য ভাষাকে সনেট রচনায় নিযুক্ত করে তিনি সাহস ও শক্তির পরিচয় দিলেন।

আরো একটি কারণে আমার মনে হয় বর্তমান সনেটগুলি বিশিষ্ট। এই কবিতাগুলি এক-একটা চিন্তাবস্তুকে পাঠকের সামনে ধরে দিয়েছে। একটি জিজ্ঞাসা বা ভাবনা অতি সুস্পষ্টভাবে কবিতার রূপ নিয়েছে। লিরিক-কবির ব্যক্তি-মনের প্রসার, তার আবেগচঞ্চল প্রাণের আনন্দ এখানে বড়ো কথা নয়; কবি এখানে চিন্তাময়—জটিল মৌলিক জরুরি প্রশ্নের গ্রন্থিমোচনে নিযুক্ত। আর ঠিক এই সব চিন্তাই যে আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে সব সময় অস্থির করে তোলে তাও নয়। কিন্তু এর প্রত্যেকটিই নৈর্ব্যক্তিক, যা মনে হয় আমাদের নিজেদের চিন্তা হলেও হতে পারতো এবং যা শেষ পর্যন্ত স্পর্শসহ কিছু আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়। তাই এসব কবিতা পরিণতির দাবিকে বহন করে: যেন কবিদৃষ্টির সঙ্গে সরাসরি আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। ঠিক এ-ধরনের সনেট বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে রচিত হয়েছে বলে মনে হয় না। আর সে-কারণেই এই সনেটগুলির প্রতি অনুরাগী পাঠক, বিশেষ করে সম্ভাবনাময় পরিশ্রমী তরুণ কবিদের, মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

ইহুদা

শান্তিকুমার ঘোষ

অবরুদ্ধ জল

'কবিতা' সম্পাদক সবীপেষু,

'কবিতা'র সহকারী সম্পাদকের পক্ষ নিয়ে স্বয়ং সম্পাদক যখন লাঠি উঁচিয়ে এসেছেন, প্রতিপক্ষকে অবশ্যই এবার গা ঢাকা দিতে হয়। তার আগে অল্প কয়েকটি কথা নিবেদন ক'রে যাই।

কানে-কানে তফাৎ হতে যায়, তাই এখনো আমার প্রতীতি থেকে যাচ্ছে 'ঢেউয়ের ছবি' চায় যাত্রার সীমা লঙ্ঘন করেছে। 'উরে'-কে একমাত্রিক করার কোনো উপায় নেই, এবং 'য়' ও 'হ'-র সাহিত্যে উচ্চারণ একমাত্র

ভাষাবাজার-বাসবাজারের প্রান্তভজন। 'ঢেউয়েরকে' অথবা 'ঢেউয়ে হুকে' মানছি চার মাত্রা, 'ঢেউয়েহুঁকে' নিশ্চয়ই নয়।

'মাত্রা টুকটুক' সম্বন্ধেও সেই কথা। 'ত' অমন অনুরণনময় ব'লে 'মাত্রা' হ'মাত্রার পর্ব। 'টুকটুক'-এ 'ট' ও 'ক' দুটোই খাঁটি ব্যঞ্জনবর্ণ—hard consonants—ওদের পঠনকালে একটু হাঁসফাঁস খেতে হয়। ('অ্যাঠা ছেলের ঠ্যাঠামি' স্মরণ করুন।) এই হাঁসফাঁসানিই প্রমাণ করে সমগ্র পর্বটি চার মাত্রার ব্যাকরণিক গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে।

উভয় ক্ষেত্রেই 'ভিন্ন ভিন্ন পর্বে তিন, চার ও পাঁচমাত্রা পাওয়া যাচ্ছে', কিন্তু গ্রাহ্য হওয়ার যা 'অসহনীয়' (যদি কচিৎ কারো তা ভালো লাগে সেটা 'সেন্টিমেন্টাল মনস্তত্ত্ব'), অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে তা 'সুখশ্রাব্য', 'মিশ্র ছন্দের উদাহরণ': এই যুক্তি, আপনার উক্তির প্রতিধ্বনি করেই বলছি, আমি বুঝতে পারি না।

বুঝতে না পারলেও না-হয় মেনে নেয়া গেলো। 'মাত্রা রেঁখে মাত্রা কেঁদে সকলের প্রাণ প্রাণে বেঁধে' তা'লে কি ব্যাপারটা এই রকম: 'স্বরবৃত্ত-স্বরবৃত্ত-হ'মাত্রা-স্বরবৃত্ত'? ভয়ে ভয়ে বলছি, 'সকলের প্রাণ' এমন কি হ'মাত্রার স্বরতেও আমার একটু কষ্ট হচ্ছে।

ব্যাঙ্ক

অশোক মিত্র

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

এর পরেও আমাকে বলতে হচ্ছে 'ঢেউ। য়ের। হু। কে' চার মাত্রা, 'মা। ত্রা। টুক। টুক' নিশ্চয়ই তা-ই, আর 'স। ক। লের। প্রাণ', তাঁরি ওজন সত্ত্বেও, চার মাত্রার সীমাতিক্রান্ত নয়। 'মাত্রা টুকটুক'-এ, ঐমন কি, দম নেবার অবকাশ আছে, যদিও 'ঢেউয়ের হুকে' আর 'সকলের প্রাণ'কে বলা যায়,

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, কাঁক-ভরানো ঘনত্ব। কাঁক ভরিয়ে দিলে ঘনত্বের মোলা খেলে গিয়ে তাতে গাম্ভীর্য আসে, কিন্তু আত খোয়া যায় না ; রবীন্দ্রনাথের

মশাল তাদের ঊর্ধ্বশিখায় উঠলো জ্ব'লে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে

বার্তা আমার ব্যর্থ হবে
সত্য আমার বুঝবে কবে

মাত্রাবৃত্তের কাছে এসেও ঘনত্বের চরিত্র হারায়নি, কেননা মাত্রাবৃত্ত আমরা টেনে-টেনে পড়ি, আর এই পংক্তিগুলো পড়তে হয় চেপে-চেপে, দ্রুত নিশ্বাসে। এই সত্বরতাই ঘনত্বের চরিত্রলক্ষণ।

যদি লেখা হ'তো 'যাহাকে বেঁধে আমাকে কেঁদে সকলের প্রাণ প্রাণ দিয়ে রেখে' তাহ'লে তৎক্ষণাৎ টিমে লয়ে আবৃত্তি ক'রে প্রতি পর্বে ছয় মাত্রা মেনে নিতুম আমরা। এই পংক্তিতে 'সকলের প্রাণ' কী ভাবে উচ্চারিত হচ্ছে তার সঙ্গে মূলের উচ্চারণপদ্ধতি তুলনা করলেই ঘনত্বের স্বরূপ বোঝা যাবে। —বু. ব.]

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক : অমিয় ভূষণ। ৮।১ লালবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা, বসু প্রেসে মুদ্রিত ও ৪০৫ জগবিহারী এভিনিউ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

কবিতা
আষাঢ় ১৩৬৩
বিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
ত্রৈমাসিক সংখ্যা ৮৩

দুটি কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

আন্তর্জাতিক

"টোমাটোর লাল রস ঝকঝকে ছোট্ট গেলাসে
তারি পাশে সাদা-কেনা শ্যাম্পেন, হলদে লেমের
জালি-কাটা পাত্রে ঘুষে কেক, ডিমসাঁসি ক্রস্ত জমে
নকল চাকার ঘোরা আতিথ্যের ঘরে, ধামী ধোঁয়া,
উচ্চ কণ্ঠ টেবিলের চতুর্দিকে ; স্বামী সামনে গিয়ে
প্লেটে তুলে দেন কচি শসা আর চীজ-স্যাণ্ডুবিচ,
দুজনার সন্তর্পণে থাক রাষ্ট্র-দেহ-ভিড় ঠেলে
দাঁড়ালো মস্ত কাচ-দেয়ালের ধারে, দৃষ্টি খোলা,
নিরালা সোনায় ঢাকা জেনিভার নিস্তরঙ্গ লেক,
সৌম-কিরীটে সন্ধ্যা, বক্ষ ক'রে বুকে জেগে ওঠে—

"সেই অস্ট্রিয়ান গ্রামে কবে বোন টুপি তা'রে আনে
তারোলেট সদ্য গন্ধ বাড়ির বাগান থেকে তোরে
গান করতে-করতে, আজ মা'র জন্মদিন ভাই, মাঠে
পাহাড়ি ঢালুতে শস্য কাঁচা সোনা, স্তূপীকৃত ; ছিল
অগাধ তৃপ্তির স্থলে বাপের আশঙ্কা মুছ হ'লে
ভাক পড়বে ; তারপর ? তারপর ছায়াঘর, ভাঙা
টুকরো হুয়োপে দেশী-বৈদেশিক সৈন্য বুট-পরা
ঘরে ঘোরে শশানের রক্ত তপ্ত চীৎকারে বিকৃতে

ফাসিস্ট কিংবা ডেমক্রাসি কিংবা কম্যুনিস্ট বন্ধুকের
চূড়ান্ত উৎসব আনে ; কোথা বাপ, কোথা মেনে, ভাই,
মায়ের কান্নাও থামল সেদিন ঘুলেট লেগে, আমি
রাশি-রাশি জনতায় হারিয়ে হেঁটেই চলি, ট্রেনে
বার-বার ঘোষা পড়ে, তবু উঠি, দৌড়িয়ে বাহিরে
ছুটে যাই, তারা ব্যাগ শক্ত হাতে, খিদে দাবা চেয়ে,
কাদের শিকার চলে,—

"সুস্থিত, পালিশ-দুস্তি কিরে
ওঁদেরি অনেকে আজ ককটেলে প্রচুর কৌশলী
অনন্ত পার্টি দেন, সেই যৌথ নেতা দলে-দলে
সস্ত্রীক যেসেন এসে সোণালি নেশার কক্ষে, মনে
'ক্ষমা করো, ক্ষমা চাই' বার-বার বলি, হস্ত ক্ষোভ
নিভিয়ে আপন-লজ্জা ভরে, কত লোকে ; অভ্যাসের
তরাসে কথায় বাধি, খেতে-খেতে সদেজ বা ভুলি,
আমার হীরের ব্রোচ, হৃদয়ে আগুন জ্বলে মিছে—
ইনি এ কে ?

"মস্ত হাত কর-মর্দনের ব্যগ্রতায়
হাসিতে এগিয়ে যেন, 'সুখ-সন্ধ্যা', কর চেয়ে কের
আমার স্বামীর দিকে, 'হর্ অ্যাম্বাসাডর, ইনি বুঝি
বাজার ক্যোনিগ্ ? প্রীত, আপনাদের দেখে বড়ো প্রীত,
সুখ-সন্ধ্যা। বাজারকে মার্টিনি দেবো কি, কিংবা ফ্রেঞ্চে
কিছু ক্যাভিয়ার ?' এ কী, আমার স্বামীর মুখে চোখে
সংযম-অতীত কোন আঁধি নামে, একটু স'রে গিয়ে
ইথিওপিয়ন যন্ত্রী আর নব্য সোলিশ কন্যাল
তাদের পিছনে দেখি আমার জর্মান স্বামী যেমে

এড়ান মুখের সাদ্য আহ্বানকারীর সুবচন,
পরে একটু ব্যাতি চেখে, স্থির হ'য়ে বললেন আমায়
'চলো যাই।' 'কেন?' 'ঐ বিশেষ দেশের ঐ যাকে
বেষ্টনে জেনারেল, বুকে বত্রিশ মেডেল-তারা-ফিতে
ছড়াছড়ি, ওরই স্থানে সেই রাত্রে যুদ্ধ-শেষ ক্ষণে
সমস্ত শহর ওরা পুড়োলো, ধ্বংসের বন্যা তুলে
নিজে এলো সারি-সারি প্যারাস্যুট-সৈন্য সঙ্গে নিয়ে,
কিছুই রইল না বাকি।' 'কিন্তু ক্রিটজ্, তুমি আমি জানি
তোমার আমার ভিন্ন দেশে-দেশে উন্মাদ পর্বের
কত কীর্তি স্বজনেরা পরস্পর আত্মঘাতী রোষে
জালিয়ে তুললো, এল আটলান্টিকের পার থেকে
ক্রুদ্ধ মৃত্যুবিষ আরো ; তোলা নয়, সব রেখে মনে
বেঁচে থাকা অন্য ভাবে তাও কি সম্ভব?' স্বামী শুধু
স্মিথায় সম্মতি-মেশা মাথা নেড়ে, চেয়ে রন্ দূরে—
স্তিড় যেন স'রে গেছে, প্রলাপ-আলাপে তীক্ষ্ণ জমা
কফাসী গন্ধের বাষ্প, রমণীয় সিল্কের খ্যাতি,
ধবধবে সিল্ক শার্ট, কালো জামা সব অন্তর্হিত,—
অগণ্য প্রশ্নের শুধু তারা জ্বলে বাহির আকাশে,
ঘরে ঢোকে আর্ল্-এর সুপ্ত রাত্রি : 'চলো, রবিবার
কাল যাই শামোনিতে, সূর্যোদয়ে।' 'বেশ, তা-ই চলো।'
প্রতিশ্রুতি রেখে এসে জীবনের ঊর্ধ্ব গিরিলোকে।"

এর মধ্যে শুভ্র কেশ, তাপসিক মুখে স্নিগ্ধ হাসি
তরু বেনেগল্ রাও ঈষৎ সলজ্জ সম্ভ্রমে
বিদায় নিলেন, শান্তি দূর দেশ থেকে ছুঁল এসে,
সঙ্গে-সঙ্গে ওরা দুটি দরজা খুলে দাঁড়ালো বাগানে।

কাইরোর ভোরে

আকাশ-বাড়াইয়ে দেখি জ্যোতিঃখচা সমাচার
শূন্যের খেরালে রশ্মি-আঁকা
সর্বমন্ত্রি : প্রাচীন অক্ষর।
অবধূত সন্ন্যাসী ধূলোর
নির্বাসী ঔদাস্য তাকে কালে-কালে
ঘোচেনি প্রলেপে ; জড় দৈবের তাণ্ডব শৈব নাচে
রেখেছে অদৈত তাকে, আদি হোম
আগুন-জ্বলসানো গায়ে।
যদিও বিশ্বয়ে আছি বৃষ্টি ঠেলে পিরামিডে উঁচু,
তারো গায়ে পুরোনো আকাশে,
—জগদ্ধাত্রিণী মৃত্যু নিকোপের অনুকৃতি এই
এরা ভুলেছিল ধ'রে—
তবুও শাশ্বত মন ভারতী ওঙ্কৃত পড়ি পাঠ
নীল-নদী-মাতৃকের দেশে,
যেখাই দ্রাবিড়-আর্য আদি স্বর্গ স্তবে
আধুনিক হেলিয়োপলিস্
—উট সারি চলেছে সংসারে।

দশমিক

বিষ্ণু দে

স্বর্গে আর ব্যক্তির প্রত্যহে,
সাধ-সিদ্ধি এপারে ওপারে
বিচ্ছেদের দুস্তর বন্যায়
কান্না ফুলে ওঠে অহরহ,
হৃদয়ে জীবনে সংসারে
বিশ্ব চায় শুদ্ধ বন্ধুতার,
অন্তহীন দশমিক বাধা
অঙ্কের বৃত্তে যায় হানে।

ব্যথা কেন কখনোই কাব্য
প্রত্যক্ষে পাবে না মনোমতো ?
আপত্তিক কেন এ অন্যায়,
কেন কাব্যে নেই সুর সাধা,
মন নেই যোগাই পাষাণে,
ছবি কেন নয় স্পর্শগত ?
জীবনে মরমে যাকে বাঁধা
সর্বদাই অধরার ছায়া।

মন তাই অসাধ্যের গানে
অনন্তে বা কোনো অবসান
কালোত্তীর্ণ মুহূর্তের ধারা
খোঁজে নিত্য কালিন্দী বিষাদে ;
মহাযাত্রে অথবা কলায়
মানুষের মহাহৃদয়ের

আষাঢ় ১৩৬৩

মেটে না মেটে না অশনায়া,
তৃষ্ণা শুধু তিক্ত পায়াবারে।

কেউ তাই মাথা নত করি
ক্ষণিকায় লিপ্ত শোচনায়,
কেউ বা মাথুরে মাথা খুঁড়ি,
কেউ যাতি সক্রিয় সমাধে
নিত্য পরাজিত বিজয়ের
অক্ষত সত্তায় রচনায়,
যেখানে বৈত সত্তা হারে
অদ্বৈত তন্ত্রাণে কোল নেয়॥

দুই অপরাহ্ণ

লোকনাথ ভট্টাচার্য

দিন হ'লো ক্রূর শুষ্ক দীর্ঘায়ু প্রয়াস
ক্ষণ তার যত বাঁচে তত মরে ক্ষোভার্ত মরণে—
এলো না সে তার বুকে বিরুদ্ধ নিশ্বাস—
যত বাঁচে তত যারে যা-কিছু চাওয়ার ছিলো তার
দিন হ'লো যেন কার অকৃতার্থ কবিতার মতো।

তার চোখে তার দুই সকরুণ চোখের পাতায়
প'ড়ে এলো বেলা।

তোলো চোখ আজ এই আসন্ন সন্ধ্যায়
তাকাও আমার দিকে
তাকাও যখন রক্ত এখনো ঘনকে আছে দূর
আকাশের কোণায়-কোণায়

বলো একবার
মরলো না প্রবাহিণী এলোমেলো এধার-ওধার
ঘুরে শেষে অকস্মাৎ মরুগর্ভে, পড়লো না বেলা
কোথাও পড়ে না বেলা, ওপারে আগুন আছে
আছে কথা সব শুভতার
জ্যোতিহীন আত্মা নয় তামসী রাত্রির
বলো অর্থ আছে, তুমি বলো মুক্তি আছে
মুহূর্তের মুক্তি আছে নিরর্থক আজকে সন্ধ্যায়

সে শুধু রইলো ব'সে নিষ্পলক নীরব প্রণয়

আর তার চোখে তার সকরুণ চোখের পাতায়
ধীরে-ধীরে অন্ধকার ঘনতর হলো।

আষাঢ় ১৩৬৩

ব'সে আছি এইখানে, কখন বেলা পড়বে। আমার তিন পা জমিতে কখন সূর্যের শেষ আলো ঝলসাবে। আর আমি তাকে আক্রমণ করব!

বও, হাওয়া বও—তোমার কাছে চাওয়ার কিছু নেই, তুমি আমার ভাই। এই আকাশ আমার ভাই, এই হাওয়া আমার ভাই, এই অরণ্য আমার ভাই।

আর ঐ আলো, তাকে আমি আজ কামড়ে ধরবো—তাই ব'সে আছি অন্ধকারে। চারপাশে এই হাওয়া, এই পাগল-করা হাওয়া, এই অরণ্য, এই বাদল-মেঘের আকাশ।

বুকে ব্যথা—তোমরা শোনো গো, কী ব্যথা, কী উত্তাল আগমনী সুর।

যদি সে না আসে, তবে মরবার আগের শেষ ক্ষণটিতে দুঁড়ব যাব, যেন তার হৃদয় বিদ্ধ হয়, যেন রক্ত ছলকে ওঠে হঠাৎ ফল্গুর মতো। সেই রক্ত নিয়ে সন্ধ্যার আকাশ হবে রঞ্জিত এক দিন—সেই রক্ত নিয়ে জাগবে প্রেম তোমার হৃদয়ে।

আর যদি সে আসতে-না-আসতে মিলিয়ে যায়, তার পিছনে ছুটবো আমি উন্মত্ত শিকারী। আমার পায়ের ঘাস ব'য়ে যা-কিছু অচেতন জলবে বেদনায়—যেখানে মরু, সেখানে ছুটবে নদী।

আলো নাও নিলো বিজ্ঞান, আলো নাম নিলো সূর্য। আলো বললো আমি দেখেছি যা অন্ধকার দেখেনি। তাই আমার সমস্ত নাড়ি, সকল শিরা আজ পাগল হ'য়ে উঠেছে অবশেষে তাকে বাঁধতে চেয়ে, তার গলা টিপে ধরতে চেয়ে, যদি দৈবাৎ যে-বিদ্যাটি সত্য সে লুকিয়ে রেখেছে, তার লক্ষ কণিকার একটি কণাও পিছলে বেরিয়ে আসে!

যদি হৈমবাৎ হঠাৎ জাগতে পারি, চিরকেলে অজানের নয় এই পথ অভিনব, ফুল হ'য়ে কেন ফুটলো না সকল বেদনা, কেন আমি অনর্থক কথার পসরা সাজাই, বাড়াই আমার পাপ—যদি জানতে পারি আমরা সকলে যাবো ঐ পারে, দুয়ারে বাজবে শঙ্খ।

যও, হারিয়ো যও—তোমার কাছে চাওয়ার কিছু নেই, তুমি আমার ভাই।

দুটি কবিতা

নিমন্ত্রণ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ঝড় দিনান্তে, আকাশ, সেই সুন্দরীর ঘরে

থিরথিরিয়ে কাঁপতে থাকুক ভীরু দীপের শিখা
আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাক সে ওরে
একা ঘরের প্রতীক্ষিতা, আকাশ-কনীনিকা।

দিঘির মতো শরীর তার নরম জলে ভরা
ব্যথার দাগ যদিও আঁকে প্রেমিক কাপুরুষ
সওদাগর ভৃত্য এক, যাঁতার তলে মরা।

ঝড় দিনান্তে, আকাশ, তবু বিরহিণীর ঘরে

আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাকুক ওরে
ঝিকমিকিয়ে উঠুক কেঁপে ভীরু দীপের শিখা
প্রেমিক যেন নেতায় এসে একটি ফুঁতে ফুঁয়ে।

বিবৃতি

উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে উনত্রিশে এসে
গর্ভবতী হ'লো, তার মোমের আলোর মতো দেহ
কাঁপালো প্রাণান্ত লজ্জা, বাতাসের কুটিল সন্দেহ
সমস্ত শরীরে মিশে বিন্দু-বিন্দু রক্তে অবশেষে
যন্ত্রণার বন্যা এলো, অন্ধ হ'লো চক্ষু, দশ দিক,
এবং আড়ালে বসি আমিই সে সুচতুর গোপন প্রেমিক।

দিবসার্ধ পায়ে হেঁটে ফিরি আমি, জীবিকার দাসত্ব-তিয়াসী,
ক্লান্তি লাগে সারাদিন, ক্লান্তি যেন অন্ধকার নারী।
একদা অসহ্য হ'লে বাহুর বন্ধনে পড়ে ধরা
যন্ত্রণায় জর্জরিতা দুঃখিনী সে, আলোর স্বরূপে,
মাংসের শরীর তার শুভক্ষণে সব ক্লান্তিহরা
মধুকের মতো আমি মগ্ন হই সে-কন্দর্প-কূপে।

তার সব ব্যর্থ হ'লো, দীর্ঘশ্বাসে ভরালো পৃথিবী,
যদিও বিমর্ষ, নিষ্ঠা, স্বামী নামে অন্ধ-চেনা লোকটির ছবি
শিয়রেতে রুটহীন, তবু তার দুই শঙ্খতটে
পূজার বন্দনা বাজে আদিমন্ত্র রাত্রির নির্জনে।
সে তার শরীর থেকে ঝরিয়েছে কান্নার সাগর
আমার নির্মম হাতে লেগেছে বুকের উপকূল,
তারপর শান্ত হ'লে সুখে-দুঃখে কামনার ঝড়
গর্ভের প্রাণের সূত্রে ফুটে উঠলো সর্বনাশা ফুল।

বাঁচাতে পারবে না তাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বীরসিংহ সিংহ,
হরিত্রাভ-পুষ্ট দেহ ভবিষ্যের তারে হ'লো মরণদুরন্ত
আকিম, ঘুমের দ্রব্য, বেছে নেবে আগুন, অথবা
দোষ নেই দায়ে প'ড়ে যদি বা জঠরে ধরে যীশু।

চতুর্দশপদী

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সময়

সময়, তোমাকে আমি কী ব'লে যে সম্বোধন করি
সে-কথাই ভাবি। কী রহস্যে আছো ঘেরা জীবনের
প্রান্তিতটে ; তুমি ভুলা যৌবনের কোন উপমায়
সে-প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আজো : বারংবার চাঁদ ও শর্বরী
তোমাকেই খুঁজে-খুঁজে ক্ষ'য়ে যায়, পরম স্নেহের
কৈশোর যৌবন হ'লো, দন্তহীন বার্ধক্য জিয়ায়
প্রবীণ কীর্তির শেষে ; সর্বত্রই আছ তুমি গোপনে
জন্মহীন অন্তহীন অবজ্ঞাত সত্যের সন্ধানে

নিরন্তর পরিক্রমা : তোমাকে যে দেখবো কোথায়
স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে, জানি না তো। কেবল দেখেছি
তোমার খণ্ডিত রূপ জগতে জীবনে নানারূপে :
প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, চুম্বনের গাঢ় সান্ত্বনায়
অথবা হিংসায় ঘেষে, বেদনায়, বঞ্চনায় ক্ষুব্ধে
আমরা সবাই কিন্তু তোমাকেই শরীরে মেখেছি ॥

উৎকণ্ঠা

'If, O my Lubia, I should commit···'

অন্য কেউ যদি থাকে তার কাছে যাওয়াই সংগত
এই নব বসন্তলগ্নে : তোর এই স্মরণীয় দিনে
যদি আজ বয়সের প্রেমিকের কাছে পথ চিনে,
অপূর্ব সজ্জিতে হবে উপভোক্তা প্রণয়সম্ভব।

হরদসংকুল তোর শরীরের শুভ্র স্তরে-স্তরে
নদী, দ্বীপ, উপত্যকা, পাহাড়ের অবলিন চূড়া
সুবিন্যস্ত, ইন্দ্রিয়গোচর। দুই হাই তারাভুরা ;
নবীন যুবক তোকে ঘিরে যাবে শোভন বন্ধরে।

সে-ই ভালো। কিন্তু তুই আসবি না কখনো এদিকে
উত্তরযৌবন এই ছদ্মবেশী শুভ্রার্দ্রির কাছে—
যার স্পর্শে মূর্ছা তোর ; প্রেমহীন কামনাই আছে
যে অন্তর বিদ্যুৎ-নখরে। যার হিমে পাংশু ফিকে
বিন্যস্ত যৌবন তোকে সন্নিধানে পেলেই বিকারে
পোড়াবে বয়স তোর, পুড়বে তা ব্যর্থ হাহাকারে।

কার্ল স্যাণ্ডবার্গের কবিতা

অনুবাদ : কফরুদ্দাহান চৌধুরী

প্রবাহ

সমুদ্রের যাদু রক্তিম হয়
যেখানে গোধূলির আলো পৌঁছয় আর কাঁপে।
সমুদ্রের যাদু হলদে হয়
যেখানে চাঁদ ঝুঁকে প'ড়ে দোল খায়।

ক্ষতি

ভালোবাসি আমি
একটি শিশু,
একটি ব্যাঙ্গো
এবং প্রতিবিম্ব
(ঈশ্বরকে হারালেই
সব হারাবো
এবং একদিন
আমরা ম'রে থাকবো
শুধু প্রতিবিম্বগুলি।)

সত্যি

হলদে ধূলো আছে
মৌমাছির পাখায়,
ধূসর আলো আছে
কোনো নারীর জিজ্ঞাসু চোখে,
লাল ধ্বংসাবশেষ আছে
পরিবর্তনশীল সূর্যাস্তের জলন্ত অঙ্গারে ;

আমি তোমায় নিই এবং উঁচু ক'রে
ধরি তোমার স্মৃতি।
মৃত্যু তার নখ বিস্তার করবেই জানি
তার ওপর, যাকে আমি নিই।

পছন্দ করো

একক সুদৃঢ় কুয়াশা উত্তোলিত এবং প্রস্তুত,
অথবা ঘোলা জিজ্ঞাসার হাত প্রসারিত, অপেক্ষমান,
পছন্দ করো :
কেননা, আমরা পরিচিত হই একের অথবা অপরের দ্বারা।

উজল বসন্তে

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

ছায়া-কাঁপা তীক্ষ্ণ আমলকি বন
পেরিয়ে সুদূর অর্গাবয়ব ;
পরপারে সারি-সারি নারিকেল ;
বাতাবি গন্ধে হাওয়া উথল ;
পশ্চিমে মাঠ সীমানাবিহীন ;
আকাশে চাঁদের থালা অমলিন ;
শিমুলের ডালে তিতিরের স্বর—
বুঝিনি সেদিন সে-ও নশ্বর ॥

আজ যৌবন। নাগরিক জন
শোষ করে মন। বিবিক্ত দিন।
রাতের আকাশ বেদনা-মৌন,
বন্ধী-চোখের সে-ছবি গৌণ ॥

কান্ত বায়ুর কর্নেটে আর
বাজে না সিন্ধু-বারোয়াঁ। বাহার ॥

সমালোচনার স্বাধিকার

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

প্রায়শ্চিত্তের যে-বিধি সাম্প্রতিক ধামাচারের ধারক ও বাহক, তার সংস্কারে সনাতন আত্মশুদ্ধিও আজ রুদ্ধ; এবং আত্মহত্যার এই দুরূহ প্রণালী যখন স্বপ্নের গোচরে আসেনি, তখনই ক্রয়েড্ প্রচার করেছিলেন যে অতৃপ্তিকায় স্বভাব ও অভাব সমানুপাতিক। তাহলেও আপনার সমালোচনা পরজন্মের জন্যে তুলে রাখতে আমি অপারগ; এবং গত কয়েক বছর ধ'রে আমার প্রাক্তালীন পদ্য আমাকে কেবলই লজ্জা দিয়েছে। উক্তি ও উপলব্ধির অনৈক্য, চিত্রকল্পের পরিবর্তে কবিপ্রসিদ্ধির ব্যবহার, ভাষার সুবিধাবাদী বিকার ইত্যাদি নিকৃষ্ট কাব্যের যত উপসর্গ, সব কটাই আমার পুরাতন লেখায় বর্তমান; এবং তার বা বদলে, ওই দোষাবলীর সংস্কার আদৌ সম্পন্ন কিনা, সে-গবেষণায় আমি ইদানীং অনেক সময় কাটিয়েছি। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনও ফল পাইনি; এবং এই গত্য প্রমে চেষ্টার কার্পণ্য স্তবধানি পরিহার্য নয়, ততটা স্পষ্ট কবিতার প্রকৃতি। কারণ আবেগমূলক রচনায় অভিজ্ঞতা আর অভিব্যক্তির মধ্যে প্রভেদ থাকে না; এবং আমার তদানীন্তন অনুভূতি নিজস্বের ধার ধারত না ব'লেই, আমার আত্মপ্রকাশ সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতির আশ্রয়।

উপরের আবিষ্কারে অহংকারীর কপট বিনয় প্রচ্ছন্ন কিনা, তা মনোবিজ্ঞানের বিবেচ্য; এবং জ্ঞাতসারে আমি যেহেতু কবিযশের প্রার্থী, সম্ভবত তাই আমার অচেতন আত্মবিজ্ঞাপন স্বরচিত কবিতার নির্মম নিন্দায় নিরত। তৎসত্ত্বেও আমি মনে করি যে আমার পূর্বজন গদ্যে অনুশোচনার হেতু অপেক্ষাকৃত দুর্বল; এবং সে-গদ্যে কৃতজ্ঞতাভাজন প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির সন্নিকর্ষ, যাতে স্বপ্রাধান্যের অবকাশ নিতান্ত নগণ্য। অর্থাৎ "জগত"-এর প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধ সত্যসত্যই নিজের সঙ্গে বাদানুবাদ; এবং আপন ভুল-ভ্রান্তির উচ্ছেদ সে-তর্কের মুখ্য অভিপ্রায় ব'লে, সেখানে বক্তার চেয়ে বক্তব্য বড়। ফলত আমার অল্পবয়স্ক গদ্যে, রূপের আভাস না থাক, রীতির ইঙ্গিত হয়তো আছে; এবং কয়াসী সমালোচকদের মতে রীতি আর রুচিতা অভিন্ন বটে, তবু প্রকারী নিশ্চয় তখনই প্রকারের প্রয়োজন বোঝে, যখন বাধে বহির্বিশ্বের

সঙ্গে ঘোপলব্ধির বিবাদ। তার পরে শিল্পী যে-শৈলীর শরণ নেয়, বিষয়ীর বিষয়নিষ্ঠাই তার উপজীব্য; এবং উদ্দেশ্য আর উপাদানের সহযোগ যেমন সাহিত্যনামে পরিচিত, ব্যক্তিস্বরূপ তেমনই আত্ম-পরের সন্ধি।

নব্য বঙ্গের এক খ্যাতনামা কবি সদ্যপ্রকাশিত "ঘরণ"-এ চারিত্রের স্বাক্ষর দেখতে পেয়েছিলেন; এবং উক্ত বস্তুসাপেক্ষ বৈশিষ্ট্য তাঁরও চক্ষুশূল কিনা সে-সংবাদ আমি রাখি বা না রাখি, এতে বোধহয় আমাদের মতভেদ নেই যে আমার গদ্য এখনও ওই বিড়ম্বনায় বিপন্ন। অর্থাৎ কালক্রমে আমার ভাবনা যদিও ভেঙে বদলেছে, তবু তার স্বভাব শোধরায়নি; এবং বয়সে দুর্বোধ্যের সাহস ফুরিয়েছে বটে, কিন্তু সাহিত্যের ঘোরালো আদর্শে আমার আপত্তি আজও প্রবল। অবশ্য এ-বই যখন প্রথম বেরোয়, তখনই এর অনেক নিন্দাস্তুতিতে আমার সম্মতি ছিল না; এবং গত সতেরো-আঠারো বছরে আর কিছু না শিখলেও, আমি এখন বুঝি যে আস্তিকের ভগবান যেমন পূর্ণ ব'লে বিদ্যমান, সার্থক শিল্পবস্তু তেমনই বিদ্যমান ব'লে সর্বজনাকর। তাহলেও রসকার অবতার নয়; এবং ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সাহিত্যবিচারে নিরুৎসাহ কেবল মন্দধীরা, যাদের বাক্যস্ফূর্তিই বিশ্বব্যাপী বিপ্রলাপের চূড়ান্ত প্রমাণ। অপরে অগত্যা যুক্তির শরণাপন্ন; এবং সে-যুক্তিও পারমার্থিক নয়, উপায়বিশেষ উদ্দেশ্যের সহায়, না অন্তরায়, তাই তার বিবেচ্য।

তার মানে এমন নয় যে বর্তমান গ্রন্থ সর্বত্রই ন্যায়শাস্ত্রের অনুগামী; এবং আমার তর্কপ্রিয় বহু স্থানে বিদ্বিষ্ট ব'লেই, "ঘরণ" প্রাতঃস্মরণীয়দের নাম-সংকীর্তনে উন্মুখর। পক্ষান্তরে আমার পল্লবগ্রাহী বুদ্ধি পাণ্ডিত্যপরাঙ্মুখ; এবং উল্লিখিত মনীষীদের পর্যালোচনা দূরের কথা, তাঁদের মন্ত্রে দীক্ষা নিলে, পাছে হিতে বিপরীত ঘটে, তাই আমি আত্মবাক্যের উদ্ধার শুদ্ধ যথাসাধ্য এড়িয়ে গেছি। উপরন্তু এই দিক্‌পালদের যে-ব্যাখ্যা সর্বগ্রাহ্য, তা সময়ে সময়ে আমার পরিপন্থী; এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের বিষয়ে প্রচলিত মতবাদ জেনেও, সংকটে তাঁদের সাক্ষী ডেকে আমি হয়তো শেষরক্ষার পথ পর্যন্ত খুইয়েছি। অন্তত আমার এক দার্শনিক বন্ধু এক বার রটিয়েছিলেন যে আমার পক্ষে তাঁর যে-কার্যে নিযুক্ত, পক্ষে তাঁর নির্গাহ তাঁরজবির কর্তব্য; এবং যদিও এ-টিপ্পনীর টীকা আবশ্যক, তবু আমি যেকালে কবিদের উপযাচকমাত্র, তখন অব্যর্থ

উপসংহার আমার অভিষ্ট নয়, আমি অগত্যা সহজই পরিণামী সাধকের। তবে "জগত"-এ সাংগতির উদাহরণ বিরল ও বাহ্য; এবং সাহিত্যসাধনার সিদ্ধিও নিরিক্ত সমাধির মুখাপেক্ষী।

পক্ষান্তরে মার্কিনী উপযোগবাদের আদিপুরুষ চার্লস্ সেন্ডার্স্ অনুমান করেছিলেন যে নিরবধি কালের অন্তিম মুহূর্তেই চিৎশক্তির সর্বশেষ প্রতিনিধি সত্যের বিবর্তনসাপেক্ষ স্বরূপ দেখতে পাবে; এবং যেহেতু আমার বিকল্পনা মুক্ত ভূচর, তাই তাঁর সঙ্গে সে-পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত যেতে না পারলেও, আমি অগত্যা মানি যে অন্তত সাহিত্যচর্চার প্রয়োগ ব্যতীত মিথ্যার নিরসন সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ-বই যে-সকল প্রত্যয়-প্রতিজ্ঞায় কণ্টকাকীর্ণ, সেগুলোর প্রত্যেকটা তৎক্ষণাৎ পরীক্ষিত হয়নি; এবং সেই জন্যে আমার বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল যে তিলোত্তমার অনধিকার প্রবেশে কাব্যলক্ষ্মীর মন্দির যেমন অশুচি, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর চিত্তও তেমনই বিক্ষিপ্ত। তথাচ আমি যেহেতু রসসামগ্রীর সন্ধানেই অবতীর্ণ হয়েছি, তাই আমার মতামতে অনুবন্ধের শৈথিল্য হয়তো অল্প-বিস্তর মার্জনীয়; এবং আমার অপ্রামাণিক অপসিদ্ধান্তের স্বপক্ষেও এ-কথা নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য যে "জগত"-এর পটভূমি প্রথম মহাসমর, যার বিরতি সাম্প্রতিক সর্বনাশের প্রস্তাবনামাত্র। সে-শোকাবহ নাটকের উপরে এখনও যবনিকা নামেনি; এবং ইতিমধ্যে, উত্তরের নিষ্কৃতি দূরে থাক, তার মুখ্য প্রশ্নও আমাদের কানে ঢুকেছে কিনা সন্দেহ।

অতএব মনে রাখা উচিত যে উপস্থিত প্রবন্ধাবলীর একাধিক বিসংবাদ পাত্রমণ্ডিত নয়, যুগব্যাধির বহুরূপী উপদ্রব; এবং রুদ্ধ বিপ্লব-সম্বন্ধে আমার প্রাগ্রসর হতাশা যেমন সমবয়সী ছাড়া আর কেউ হৃদয়ঙ্গম করবে না, তেমনই যাদের চৈশব হিন্দু পুনরুত্থানের অন্তর্ভাগী নয়, তাদের কাছে আমার ঊর্ধ্বশ্রুত জড়বাদ উপহাস্য ঠেকবে। কিন্তু কাব্যব্যবসায়ীর অভিমানলাঘবে আমার ক্রান্তিকর নির্বন্ধ আপাতত রোমান্টিক্ আতিশয্যেরই প্রতিবাদ বটে, তবু সেই সঙ্গে কবিদের সম্পর্কে আমার অবশ্য উদ্ধাস নিশ্চয়ই আড্লার-বর্ণিত হৈতগ্রন্থির সাক্ষ্য; এবং প্রত্যেক গুটেবার্গ দুর্লভ দ্রাক্ষার আর রস নিহিত থাক বা না থাক, আমি যখন না মেনে পারি না যে শিল্পতত্ত্বি ঐকান্তিক প্রয়াসের পুরস্কার, তখন আমার পক্ষে সাধারণ্যের সাধুবাদ ভূতের মুখে রামনামের মতো।

—

আসলে এই রকম বস্তুসমাসের বাহুল্য আমার মজ্জাগত ব'লেই, "জগত"-এর সর্বত্র সমস্তার এত প্রাদুর্ভাব, অথচ সমাধানের চিহ্ন নেই ; এবং জীবনে অদ্বৈতের অভ্যাস সত্ত্বেও আমি যেহেতু বেঁচে আছি, এখনও আত্মঘাতী হইনি, তাই অনুরূপ বৈকল্যের অভিযোগে এ-বইখানার প্রাণদণ্ড অবিচার্য।

দুঃখের বিষয় স্বভাব সর্বদা নিয়মরাধ, কদাচ নির্বিকার নয় : অন্ততঃপক্ষে নাচতে না জানার দায় সব সময়ে বাঁকা উঠানের উপরে চাপানো যায় না ; এবং এ নৌকায় ভর ক'রে ভবনদী পেরোনোর বিপক্ষে "জগত" যদিও শতমুখ, তবু আমার লেখার কথা তারায় গুণগান আপাতত সেই চাতকের প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু এ-গ্রন্থের সূচনায় দেখাতে চেয়েছিলুম যে ব্যক্তিমানব যখন আত্মজিজ্ঞাসায় মন দেয়, তখন সে যেহেতু বিশেষের সাড়া পায় না, শোনে উত্তরের মর্মবাণী, তাই তার সঙ্গে বিশ্বমানবের সাক্ষাৎ পরিচয় অবশ্যম্ভাবী ; এবং সেই জন্যে যে-ভাষা যথার্থই স্বকীয়—যার সাহায্যে নিজের কথা নিজের কাছে পৌঁছায়, তাতে সাধু সাহিত্যের কৃত্রিম শুচি অচল। তবে এ-সত্য আমি বারংবার ভুলেছি ; এবং আপনার মধ্যে সামাজের উদ্বোধন প্রভৃত পরিশ্রমের অপেক্ষা রাখে ব'লে, এক দিকে যেমন দেখেছি যে নিয়তে জনগণের নাম জপলেই, মোক্ষ আমাদের আয়ত্তে আসবে, তেমনই অন্য দিকে মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারিনি যে প্রাকৃত আর যথাজাত এক ও অবিভাজ্য নয়।

তলিয়ে না দেখলে, এমন বিশ্বাস ও বোধের পোষণীয় যে আমার সাহিত্যাদর্শে পাশ্চাত্য প্রভাবের আধিক্য দেশদ্রোহের সাক্ষ্য ; এবং এক অনুকম্পায়ীর বিচারে আমার জ্ঞানাঙ্কবর্জিত পদ্যরচনা, অদ্ভুত ছন্দোদোষ সত্ত্বেও, নিঃসংশয়ে ভরতবংশীয় বটে, কিন্তু আমার সংস্কৃতসখল গদ্যের গৌড়ী পদপাত বাংলার মাটি ছুঁলেও যাতায় না। উক্ত দৃষ্টিদর্শীর রুচিতে ও বিবেচনায় আমার শ্রদ্ধা যদিও অসীম, তবু তাঁর অভিমতে আমি সায় দিতে পারিনি, বরঞ্চ ভেবেছি যে আমি বাঙালী ব'লেই, পশ্চিমের চিন্তাধারা আমার উপরে এতখানি সক্রিয় ; এবং বিগত শতাব্দিক বৎসরে বাংলার কৃতী সন্তানেরা ইংরেজী, তথা ইংরেজীর মারফতে য়ুরোপীয়, চিৎপ্রকর্ষের সঙ্গে যে-সম্পর্ক পাতিয়েছেন, তার তুলনা মেলে শুধু রোমক সাম্রাজ্যের সেই পর্যায়ে, যখন প্রত্যেক শিক্ষিত রোমান্ মাতৃভাষার ও গ্রীকে ছিল সমান ব্যুৎপন্ন। কেবল তাই নয়, আর্যাবর্তের অতীত

গৌরবও ইংরেজ বিদ্বানদের অধিকার : এবং এ-কথা মানতে আজ আর আমার সংকোচ নেই যে স্বাধীন ভারতবর্ষের যে-সকল অভিলাষ সমাদরের যোগ্য, সে-সমস্তের অধিকাংশ ইংরেজী উদারনীতির ক্রমবিকাশ।

গ্রীসের সঙ্গে রোমের ভাষাগত সাদৃশ্য যদিও একেবারে নেই, তবু উভয়ের সৌরাণিক উত্তরাধিকারে, ও তজ্জনিত মূলকর্মে, বৈষম্যের চেয়ে মিল বেশী ; এবং বঙ্গদেশ ও মেতজীনের মধ্যে সেরেছু আদলের আভাসটুকুও অনুপস্থিত, তাই বাইবেল্-তর্জমার উপলক্ষে বাংলা গদ্যের জন্ম ইতিহাসের অন্যতম অঘটনসংঘটন। সম্ভবত সেই জন্যে বঙ্গীয় গদ্যের ধারায় পরিণামী প্রাপ্তবয়স্কের বয়সোচিত জটিলতা নেই ; এবং আমার জ্যেষ্ঠেরা উনবিংশ শতাব্দীর আত্মপ্রত্যয়ে মাতৃষ হয়ে, সারল্য আর তারল্যের সহজ সম্পর্কটা ধরতে পারেননি। কিন্তু বাঙালী পাঠকের প্রতি তাঁদের তীব্র তাচ্ছিল্য কখনো আমার ধাতে বসেনি ; এবং আমার গদ্যে আবর্তের আবিল সূত্রপাত গুরুনিন্দায় যৌবনসুলভ প্রবৃত্তি থেকেই ঘটে, তাহলেও প্রথম সংস্করণে "সবুজ"-এর অপ্রত্যাশিত কাটতি দেখে আমি বুঝেছিলুম যে বাংলার মনীষা আসলে স্বভাবনিষ্ঠ নয়। সম্প্রতি "সংবর্ত"-নামক আমার একখানা কবিতাসঙ্কলনের বিক্রিতেও সেই অনুমানের আর একটা সমর্থন পেয়েছি ; এবং ইতিমধ্যে আমার গদ্যেপ্রগামী ভাবনা অনিশ্চয়ের জটাজালে এমনই জড়িয়ে পড়েছে যে এ-বইয়ের বহু প্রবন্ধ দুর্বোধ্য জেনেও আমি প্রতিকারে অক্ষম।

অবশ্য শব্দের অপপ্রয়োগ, ব্যাকরণবিভ্রাট, অপটু বাক্যবন্ধের দোষে অর্থের নিপাতন ইত্যাদির সংশোধন "সবুজ"-এর দ্বিতীয় সংস্করণে নেহাৎ নগণ্য নয় ; এবং কোথাও কোথাও অদল-বদল আরও ব্যাপক। কিন্তু জোরালো কথাকে ঘোরালো ক'রে তোলার অভ্যাস পঁচিশ বছরের আত্মবিচারেও কাটেনি ; এবং তির্যক্ রীতির বিপদ এই যে তার ভঙ্গুর অঙ্গবিন্যাসে যোগ-বিয়োগের ভার সয় না, পরিবর্তনের ইঙ্গিতে সে অভিপ্রায়ের বোঝা হুড়াকারে ছড়িয়ে, চলার পথে মুখ থুবড়ে পড়ে। তবে আমার উৎকট পদ্ধতি জ্ঞানত কোনও বিদেশীর পদানুসরণ থেকে উৎপন্ন নয় ; এবং শত চেষ্টায় বর্তমান লেখাগুলোর একটাকেও আমি ইংরেজী অনুবাদের ছকে ফেলতে পারিনি, যদিচ আমার কয়েকটা কবিতা অনুরূপ রূপান্তর

অস্বাভাবিক মেনেছে। সুতরাং আমার চিন্তাপ্রণালী অন্তত তাঁদের কাছে বক্রীয় লাগবে, যাঁদের অভিজ্ঞতায় তার ও ভাষা মমত্ব ; এবং আমার কাব্য কদাচিৎ সার্বজনীন আবেগের প্রসাদ পেয়ে থাকলেও, আমার প্রবন্ধে ব্যক্তিস্বরূপের দ্বন্দ্ববিমুখ ধারণা, আর্ষসত্যের প্রতি নির্বোধ পক্ষপাত, এমনকি কবিদের বিষয়ে দুর্মর আত্মবিলাস—এ-সমস্তের উদ্ভব স্বদেশী কৈবল্যের অনির্বচনীয় নির্বিরোধে।

অন্তত এই আমার বিশ্বাস ; এবং আমার জন্মভূমিকে আমি ভালোবাসি ব'লেই, আমাদের জীবনযাত্রার শ্রেয়োবোধের সার্বত্রিক অভাব আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় ঠেকে। সামান্য মূল্যজ্ঞানে দরিদ্র না হলে, বাংলার প্রথিতযশা লেখকেরাও প্রকাশ্য রচনার পরিমার্জনায় ঔদাসীন্য দেখাতেন না, অথবা আমি মূল কবিতা না লিখে, সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে হাত পাকাচ্ছি শুনে, পিতৃদেব প্রেরণার সদ্ব্যবহার-সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিতেন না ; এবং সাহিত্যের বহিরাঙ্গনে অনাস্থা এখানে কত বিস্তারিত, তার প্রমাণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের একাধিক গদ্য কবিতা, যার সঙ্গে আমার মতো দু-চার জনকে উচ্ছিষ্ট পোস্টকার্ডের পার্থক্য পর্যন্ত তাঁরা আবিষ্কার্য। অথচ বিদগ্ধ কলাকৌশলে প্রাচীন ভারতের আনন্দ ছিল প্রচুর ; এবং অজন্তা ও ইলোরা যে-অনুশীলনের পরাকাষ্ঠা, তার গুণেই দ্বিতীয় শ্রেণীর সংস্কৃত কাব্যও অন্যাবধি পাঠ্য। তবে অগণিত শতাব্দীর পরাধীনতা যে পারদর্শীর স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুণ ধরাবে, তাতে আশ্চর্যের অবকাশ নেই : এবং হিন্দুস্থানে আবার রাজা-প্রজার পরস্পরবিরোধী ধর্ম, তথা শাসকের সমাজে শাসিতের অনধিকার প্রবেশ অর্থবিনিময়ের সম্ভাবনাটুকুও অবশিষ্ট রাখেনি।

দারিদ্র্যস্বীকার তো বটেই, বোধহয় কাণ্ডজ্ঞানও আত্মঘ্নোর ঔরসজাত ; এবং আমাদের কর্মক্ষেত্রে জেঁকে বসেছিল কর্তার ইচ্ছা আর বর্ণাশ্রমের প্রত্যাদেশ। সে-অবস্থায় পুরস্কার যেমন অল্পনামাত্র, বক্রীয় ভাষ্যের ব্যপদেশ তেমনই অনাস্থীয়ের অনীহা বা অবজ্ঞা ; এবং তার উপরে গুরুভক্তি ভর করলে, হয় বন্দনায়, নয় ভর্ৎসনায়, সমালোচনার বিস্তার অনিবার্য। তখন সাহিত্যের নিজস্ব রসাতলে যায়, প্রতিষ্ঠা পায় জীবনেতিহাসের কপোলকল্পিত ভাষ্য ; এবং অতঃপর, যাঁদের কাছে দলের লোক ছাড়া বাকী

সকলে শত্রু নয়, তাঁরা মুগ্ধ লেখকের ব্যক্ত অভিপ্রায়কে বর্তব্যের মধ্যে না এনে, তাকে শাস্তি দেন, সে পাঠকবিশেষের অজ্ঞাত আবদার মেটাতে পারেনি ব'লে। অবশ্য কলাকৈবল্য পশ্চিমেও এত অল্প দিন বেঁচেছিল যে অনেকের মতে ওই কর্মঠবৃত্তি সাম্রাজ্যবাদের অনুরব্যতিরেক; এবং চিন্তুর বিশ্ববীক্ষা থেকে অধিষ্ঠীয়ের আত্মরক্ষা যেহেতু আবহমান কাল দুষ্কর, তাই ভারতবর্ষের কান্তবিদ্যা হয়তো এখনও ব্রহ্মাস্বাদের অন্যতম মার্গ। তৎসত্ত্বেও ধনসৃষ্টির ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়, বরং বিপজ্জনক; এবং আরও অনিষ্টকর ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠিচক্র ঐক্যের জন্যে রাজশক্তির বিসর্জন।

শিল্পিশিরোমণি যামিনী রায়ের মুখে শুনেছি যে পৃথিবী, ভারতীয় আর অভারতীয়, মাত্র এই দুই অংশবয়ে বিভাজ্য; এবং অনলস একনিষ্ঠা থাকলে, প্রতিযানের অনটন ও প্রতিবেশের অনবধান যে ইষ্টলাভের প্রতিবন্ধক নয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁর অমর চিত্রাবলী। কিন্তু কলোদয় মূলে স্বধর্মের জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম, গীতা যাঁদের কণ্ঠস্থ, তাঁদের মধ্যেও আজ আর প্রচলিত নেই; এবং বোধহয় তাই বাংলার এক উদীয়মান আলেখ্যকার একদা আমাকে বলতে পেরেছিলেন যে প্রদর্শনীয় বিশ-ত্রিশখানা ছবি তিনি এঁকেছেন দিন-দশেকের ভিতরে। অবশ্য প্রতিভার এ-রকম পর্যায়ি দেখে, হিংসার প্রকোপে জ্বলা ছাড়া আমার মতো প্রকৃতিস্থজনের গত্যন্তর নেই; এবং জগতে এমন মহাকবি এখনও অজ্ঞাত যিনি দ্বিত্রাবেদীর ভয়ে সচরাচর মৌনী। তাহলেও সাম্প্রতিক ভারতে কেন কেবল বিদ্রূপাক্ষেরা বেড়াতে আসেন, এ-প্রশ্নের সদুত্তর হয়তো ঔপনিবেশিক স্বার্থের পুনরুদ্ধারে নেই, আছে যামিনী রায় মহাশয়ের উদ্ধৃত মন্তব্যে; এবং তাঁর কাছে সে-মীমাংসার তাৎপর্য যদিও বিপরীত, তবু আমি মনে করি যে উপস্থিত যুগে একা আমরাই মর্যাদাবোধে রক্ষিত।

বর্তমান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লোকপ্রসিদ্ধ তিরস্কারও স্মরণীয়; এবং বাংলা ফুলে সেছে, অথচ ইংরেজী শেখেনি—এমন ইক্ষ-বক্ষ জীব এখনকার আবহে অভাবনীয় হলেও, ইদানীং সেই শ্রেণীর মানুষই সংখ্যাচুরিষ্ঠ, যাদের কাছে প্রাচ্য বিদ্যা কিংবদন্তী আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জীবিকাসংগ্রহের অব্যবহার্য উপায়। সুতরাং স্বাস্থ্যতত্ত্বের কলেজী বক্তৃতায় বীজাণুর বিভীষিকা

দেখিনে, বাড়িতে চরণামৃত খেতে আমরা আজও অভ্যস্ত ; এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে অধিষ্ঠানের মনান্তর যখন আর ঢাকা যায় না, তখন ভারতীয় দর্শনবিশারদেরা আধ্যাত্মিক আর্যাবর্তের তুলনায় জড়বাদী পশ্চিমের অনর্গল অজ্ঞান ত্র্যাড্‌লী-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের দোহাই মেনে। অর্থাৎ হিন্দুর বিবেক ঘুমায় ; এবং জীবন্মুক্তেরা অন্তর্যামীর নিকটে সদাচারের মত প্রেরণাই পান না কেন, লোকাচারের উন্নয়নে তাঁরা স্বভাবত নিরুদ্যোগ। ফলত এখানে মধ্যপন্থার স্থান নেই ; এবং যাঁরা এই অংশবর্ষ দেশের পরিচালক, তাঁদের কপালে অকথ্য দুর্গতি তো আছেই, এমনকি অপঘাতও অসম্ভব নয়। অন্তত পক্ষে গান্ধিহত্যা হিন্দুধর্মে বাধেনি ; এবং সে-ঘটনার আগেও রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে আমাদের সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব যে-পরিমাণ অবারিত, জাতিসংগঠন ততোধিক ব্যাহত।

সে যাই হোক, সৎসাহিত্যের বিকল বাংলাদেশ তবু আজ হারিয়ে ফেলেনি, কখনও হাতে পেয়েছিল কিনা সন্দেহ ; এবং এই পাণ্ডববর্জিত ভূভাগে জন্মেও যিনি শিল্পোৎকর্ষের ঐতিহ্য-সম্বন্ধে কৌতূহলী, তিনি সাগরলঙ্ঘনে বাধ্য। অতএব উপস্থিত প্রবন্ধে বিজাতীয় লেখকদের উপস্থাপন অহেতুক নয় ; এবং এখানে অর্বাচীনদের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত অতিরিক্ত এই কারণে যে প্রাচীনদের আমরা যে-দৃষ্টিতে দেখি, তার অনেকখানি গতানুগতিক। অর্থাৎ অনুপূর্ব প্রশস্তির পাত্র নয় ব'লে, আধুনিকদের সম্পর্কেই সাহিত্যসাক্ষ্যের মূলসূত্রাদির প্রতিগ্রহ আবশ্যক ; এবং সে-পরীক্ষায় তাঁদের কেউ কেউ উত্তীর্ণ নন বটে, কিন্তু সকলের বেলায় যে এক রকমের নিয়ম খাটে, তাঁদের বিষয়ে এটাই আসল কথা। দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের দৃষ্টান্তও আমাকে সৌন্দর্যসৃষ্টির উপায়, বা তত্ত্বসিদ্ধির খণ্ডন, শেখায়নি ; এবং তবু আমি যেকালে লিখতে প্রস্তুত, তখন শিক্ষা নিশ্চয়ই সংস্কারের অনুগত। কিন্তু আমার অক্ষমতা যেমন প্রাতিস্বিক, তাঁদের আদর্শ তেমনই বৈজ্ঞানিক ; এবং কাব্যসাধনা তথা সমাজসেবার জন্যে একটা নিরপেক্ষ উপযানের প্রয়োজন। সেই উপযানের সন্ধানে আমার অগস্ত্যযাত্রা হয়তো একেবারে অনর্থক নয়।

তথাচ মহাপ্রস্থানের পথেই প্রত্যাবর্তন নেই : অন্তর যদি উপচিকীর্ষা প্রতিগামীর বাধ না সাধে, তবে আমরা তাকে উন্মার্গ বলতে বাধ্য ; এবং এত

প্রবন্ধের পরেও আমার হাত দিয়ে যেহেতু স্বাধীন কাব্য বেরোয় না, তাই আমি লজ্জিত বটে, কিন্তু আমি অনুচরদের আমার প্রাত্যহিক জীবনে মাতব্বরির অধীন দেখতে আকারী ব'লে। তার মানে এমন নয় যে বয়স্থ হিন্দুদের মতো আমিও এ-বার পরকালের চিন্তায় প্রাণপাত করব : বরং উল্টো কথাই সত্য ; এবং দিনে দিনে নিজেকে যত চিনছি, তত বুঝছি যে সংসার আমার বৈরী নয়, বহির্জগৎ সুন্দর ও অতিথিবৎসল। তাহলেও আমার আর সন্দেহ নেই যে সজ্ঞান সৎকবির অগ্রগণ্য ; এবং উৎকৃষ্ট সাহিত্যের রচনা সুচরিতের সাধ্যে না কুলোক, কায়মনোবাক্যের অবৈকল্য-ব্যতিরেকে শ্রেষ্ঠ কবিতার উৎপাদন অসম্ভব। অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা আর উৎকাঙ্ক্ষার অদ্বৈত যেমন সামুষ কর্তব্য, তেমনই কবির প্রতিপাদ্য মর্ম, কর্ম ও মর্মের একীভাব ; এবং সে-সমীকরণের উপক্রম পর্যন্ত যখন আমার কোথাও দর্শনীয় নয়, তখন শ্রেয়োবোধের মন্ত্রপাঠ আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা।

(দিল্লীর প্রেস থেকে লেখকের আত্মপ্রকাশ প্রবন্ধসংগ্রহ "গদ্য"-এর মুদ্রণ সংক্রান্ত পত্রে প্রদত্ত পরিশিষ্ট)

মহিলাকে : শিল্পীর উত্তর

সৈয়দ শামসুল হক

লোকোত্তর কোনো-এক প্রহরীর, জ্ঞানী, দীর্ঘদিন
দর্শন, ভেষজ আর নীতিশাস্ত্রে ভ্রমণের পর
ঢেকে দিয়ে আলো নিজ পরিধেয়ে, আনীত আঁধারে
সোনালি আপেল ছেড়ে প্রার্থনায় করে উচ্চারণ।
একাকী অলিন্দে তার স্বগতোক্তি করে প্রহরিণ ;
মনোগত বাসনাবিলাস জ্বলে যেন রাত্রিভর
প্রমিত প্রদীপ এক পুরাতন স্বর্ণদীপাধারে।
অন্তিমে প্রস্তাব তার অলৌকিক নারীর চুম্বন।

আমি তার উত্তরাধিকারী, অপাঙ্গে যোজনা করো
বিদ্রূপের শর, অনাস্তিকে বলো, 'কেন সে-শিল্পীকে
হ'তে হবে অনাচারী, মৃত্তকাম, অসুস্থ, অনয় ?
কেন এ জরুরি, যদি পরিণামে সর্বনাশ জ্ঞাত ?'

পরিণামে সর্বনাশ ? হঠকারী যত মূর্খ মূঢ়
নিজপণে মৃতোৎপন্ন। কখনো কি ক্ষণিক সুখিকে
অনন্ত প্রয়াণ বলো ? আনন্দ তো সেই সূর্যোদয়
রশ্মি যার হর্ম্যদেহে চিত্রাবলী করে প্রতিভাত।

নিত্যকাল আমারো অন্বেষা সেই আনন্দ-আকর,
অগম্য সম্ভোগে নয়, প্রেমিকার বিলোল মুদ্রায়।
সহজে উদ্যত তাই আজ থেকে চব্বিশ বছর
এবং অনন্তকাল দুর্লভার চুম্বন-তৃষ্ণায়।

দুটি কবিতা

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

ইস্কাবনের বিবি ও রোদ

এ-ক'দিন একটুও রোদ নেই। ডিনামাইট-বিধ্বস্ত নীল।
ধাওয়া মেঘ বৃষ্টির বন
বুকফেরা খোঁয়া আলো আয়ত্তিম বিস্ফোরণে ভরা,
ইস্কাবনের বিবি অন্ধকার আকাশ এখন।

আজ তোরে আমার উঠোনে
খাতক প্রস্তুতি-বৌ রাশীকৃত সোনার টুকরো গোনে
ঘর শোধ দেবে ব'লে মহাজন পণ্ড পাখি মানুষের ঘরে।
অনর্গল দুধ ঘন দীপ্ত ফল ফুল অন্ন ঝরে—
আজ আমি বক্তকেলার-কোর্টের চেয়েও ধনী
এ-নারীর শান্ত সততায়,
আমার মোটর বাড়ি উজ্জ্বল আসবাব
ছড়ানো অশুদ্ধি নীলিমায়।

বিধ্বস্ত

কেউ মানে, কেউ তার নির্দেশ মানে না।
সন্ধ্যার স্বপ্নের মতো অন্তহীন মোটর-কবির ব্যস্ততায়
সে রাখে জালিয়ে তবু রক্ত-নীল আলো অন্ধকারে,
হে রূপসী, ফেরাতেই হবে মুখ শান্ত নীলিমায়।

এবার ফিরতে হবে। আতিথ্যের পেয়ালায় অমৃতস্তরেছি।
সুচতুর কারুকাজ কথায় লুকিয়ে সাপ হেসেছি মধুর :
আটলান্টিক বন্ধুকেও আচমকা পিঠে ছুরি মেরে
প্রেম কিনো চাকরির লড়াই করেছি।

কবিতা

আষাঢ় ১৩৬৩

কোথায় চলেছ তুমি ? আলো নেই, অন্ধকার তবু
আকাশে এখনো আছে অমলিন তারার রোদ্দুর—
যেখানে কর্ণমে কামে বাজনার শুলজার নরক,
চমকায় না প্লাস্টিকের চুড়ি কিংবা রেডিয়োর সুর
শান্ত ভোরে। কিবে দেখবে ভেঙে গেলে সমস্ত কুঁড়েঘর,
বিস্রস্ত মাড়িতে লেগে ছেঁড়া চুল, একঝোঁটা সিঁদুর।

ভিলানেল

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

তোমার ভালোবাসা ভোরের কথাকলি।
রাত্রিশেষে ম্লান মেঘের প্রসাধনে
প্রথম প্রণয়ের অরুণ অঞ্জলি।

গোপন রেখে হবে এ-কথা কাকে বলি।
এ কায় মায়ামুখ ভেবেছি মনে-মনে।
তোমার ভালোবাসা ভোরের কথাকলি।

কেন যে মনে আসো কেন যে যাও চলি।
স্বপ্ন ছিঁড়ে কের নতুন ক'রে বোনে
প্রথম প্রণয়ের অরুণ অঞ্জলি।

আকাশে জ্বালো তুমি তারার দীপাবলি।
স্পর্শ আঁকো এই দীপ্ত যৌবনে।
তোমার ভালোবাসা ভোরের কথাকলি।

ব্যাকুল বাসনার বেদনা নিয়ে অলি
হৃদয় নিয়ে একা, বিস্তৃত নির্জনে
প্রথম প্রণয়ের অরুণ অঞ্জলি।

এ কায় আশা নিয়ে প্রাণের তীব্র কলি
পাপড়ি মেলে দেয় তবুও আনমনে।
তোমার ভালোবাসা ভোরের কথাকলি।
প্রথম প্রণয়ের অরুণ অঞ্জলি॥

কবিতা
আষাঢ় ১৩৬০

ব্যর্থতা

সুশীলকুমার গুপ্ত

কী ক'রে তোমাকে ধ'রে রাখি ?

তোমার স্মৃতির আলো বুকে নিয়ে, পাখি
উড়ে যায় অকূল আকাশে।
যাহাদের ফাঁক এসে বিষাক্ত নিশ্বাসে
ঘুচে নেয় অনুরাগে-রাঙা ছলোছলো
সে-দিনের পাণ্ডুলিপি। স্তরে-স্তরে ধূল
বাসি হয়। ছবি ছেঁড়ে। স্মৃতির পুতুল
ভেঙে যায়। মেয়ে মন শূন্যতায় কাঁকি।
কালের চক্রান্ত দেখে বলো, চলা, বলো—
কী ক'রে তোমাকে ধ'রে রাখি ?

দুটি কবিতা

আসাদুর রহমান

যে-ছায়া আসবার

যে-ছায়া আসবার তাকো সকাল-সন্ধ্যার অবসরে,
তাকে কেউ কোনোদিন বলে কি রমণী অনুপমা ?
বলেও বলে না জানি কেউ তাকে ছলের আধার।
তোমার গালের কালো একটি তিলের বিনিময়ে
দেবে না বিলিয়ে কেউ অকাতরে সাম্রাজ্য বিশাল :
অথবা তোমার জন্য আসবে না সত্য রণতরী,
তোমার শিরায় ঝ'রে পুড়ে ছাই হবে না কখনো
পুরোনো শহর কোনো—কোনোদিন হবে না কিছুই।

আক্ষেপ প্রশ্রয় থাক, ক্ষমা করো এ-সত্যভাষণ।
জেনেছি ক্ষতির আয়ু, কী দরকার মিথ্যাচারে ব'সে ?
যা-কিছু অর্পিত এই কবিতায় সাধ্যের আধারে,
বিশ্চিন্ত এ নয় জানি প্রেমিকের উল্লাস-প্রপাত।
অথচ তোমার হবে নিত্য যে-অনল উদ্দীপিত,
তাকে চাই বিষাদীন প্রাণের সংসারে প্রতিদিন।

অলোকসামান্য নয় লেখনী আমার, তুমি তাই
পাবে না কখনো এড়িয়ে যেতে কালের তিমির।
তাতে কী ? অন্তত ছিলে আমার নিভৃত অন্তর্লোকে
গানের মতোই ব্যাপ্ত চিরদিন : সে-ও তুচ্ছ নয়।

সে

প্রেম তাকে করে না আকুল। উদ্ভাস্ত তার প্রাণে
একটি মরম জাগা উন্মোচিত—যেন সে ছুঁয়েছে কোনো বহমান গাঙে

আষাঢ় ১৩৬০

ধূলোর বিজনে বাজী মোহাবিষ্ট আর হলদে পাতার বালিশে
মাথা রেখে অতীত সহজ গাঢ় ঘুমে যায় মিশে
ক্লান্তির মতন লোকে.

অতিভূত হঠাৎ কখনো
ঘুঘুর পাগড়ির মতো আকাশকে বলে, 'ঐ শোনো
কার যেন বাঁশি বাজে, স্পন্দিত পৃথিবী।'—শুধু তার মনে হয়
কোথাও অলক্ষ্যে কোনো নিঃসঙ্গ কলের মতো একটি হৃদয়
গ'ড়ে ওঠে। সারাক্ষণ ভাবনার কত ছায়া ঝরে :
সে কার স্পন্দিত মাথা লোটে আজ ব্যথার পাথরে?

সোনায় নিটোল পায়ে পায়েনি পরাতে কেউ তার
ত্রিলোকের ত্রিশীমায়। একটি অরূপ নদী প্রাণে বয় যার,
সে যায় চলার ধ্যানে, জনহীন মনে সেও পথভ্রষ্ট, জানে সব দিক
নির্দয় কালোর মাখা, তবু এক তৃষ্ণা তাকে করেছে পথিক।
এবং অভ্যাসবশে
উদাসীন সে-ই আসে ফিরে
সাতপুরুষের জীর্ণ ভিটের তিমিরে
মাঝে-মাঝে, আলোর দাক্ষিণ্য সেই, তবু কিছু ভুলে নিতে বাসনার ভুল
পুরোনো শিশির জ্বালে। মনে পড়ে ছিল কার কালো চুল সুগন্ধে আকুল।

সে জানে নিজের কিছু পরিচয়, জানে তার বয়েসি কপালে
ভ্রূটির তিলক কাটা, একা-একা তাই শুধু জ্বালে
ব্যথার আগুন মনে। কোনোদিন অপরের দীপ্ত গুণে, জয়ে
চয়নি অন্বয়া-দীপ, তার ও চোখ রূপ খোঁজে অথচ আপন মুখ ভয়ে
কখনো দেখে না তুলে। তাকে আর কে দেবে অভয়?
একটি অরূপ নদী (জানে সে-ও) প্রাণে তার বয়॥

ঘুমলতা

অলোকবিজয় রায়

'লক্ষ্মীটি, শোনো,
কতবার বলেছি তোমাকে,
আর কথা নয়
এইবার চোখ বুজে শোও
একটু ঘুমোও।'—
মাথার বালিশটাকে একটুখানি ঠিক করে দিই।

কী জানি কী ভেবে
এইবার কথা শোনে,
ছোট্ট খুকির মতো হেসে,
বলতেই চোখ বোজে।
জানি আমি, ভিতরে-ভিতরে
কত ক্লান্ত ও যে,
কাল রাত থেকে
এক ফোঁটা ঘুম নেই চোখে
সমস্ত দুপুর গেছে আজ,
এবার ঘুমোয় যদি।

তাই ভাবি, কী ক'রে কী হল!
এত বড়ো নিদারুণ ব্যাধি
কোথা থেকে এল?
চারটি বছর
এখনো হয়নি পুরো
এরি মাঝে সব এলোমেলো।
খোকা এল, খোকা চ'লে গেল
তারপর দু'দিন যেতেই
এই অভিশাপ।

আষাঢ় ১৩৬৩

ঘুমিয়ে পড়েছে
শোনা যায় মৃদু নিশ্বাস
বুকটুকু ঢুকঢুক করে
পাখির বুকের মতো—
কী দুর্বল হয়েছে সুলতা !
সারাদিন কথা ব'লে-ব'লে
আরো শ্রান্ত হয়
কিছুতেই পারি না বোঝাতে
কী ক'রে বোঝাই ?—
কত স্বপ্ন, কত সাধ ছিল
কী ক'রে ও ভোলে ?

কেন ক'রে কেন যে সেবটা
শিলঙেই এল।
কত স্মৃতি ছড়ানো এখানে,
এই তো সেবার
বিয়ের ক'দিন পরে এসেছি দু'জনে
জেল-রোডে লাল বাড়িটাতে,
স্বপ্নের মতন
কেটে গেছে দুটি মাস,
সকাল-বিকাল
বেড়িয়েছি একসাথে,
আঁকাবাঁকা লাল পথ বেয়ে
কোনোদিন গিয়েছি পাহাড়ে
কোনোদিন লেকে
কখনো-বা বিজন-বিপিনে,
সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার
স্প্রেড-ঈগল বলুন—

কতদিন গিয়েছে সেখানে,
মাঝে-মাঝে পাইনের বনে
কী ক'রে হারিয়ে যেত
তারপর হঠাৎ কখন
পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে যেত তরতর ক'রে—
পাইনের ফাঁকে-ফাঁকে
আঁচল উড়ায়ে
খিলখিল হেসে
চঞ্চল ঝর্নার মতো ছুটে যেত পাথরে-পাথরে।

এই সে সুলতা
শুয়ে আছে বিছানায় মিশে
একমুঠো কৃষ্ণ চুল ছড়ায়ে বালিশে
ছোটো মাথাটিকে
একপাশে একটু হেলিয়ে।

ঘুমোক, ঘুমোক
এই শান্তি ওর
কিছুক্ষণ ডুবে থাক ঘুমে
ভুলে থাক জীবনের স্মৃতি।

বাইরে তাকাই
হঠাৎ চমক ভাঙে
পাহাড়-চূড়ায়
শেষ সূর্য আগুন ছড়ায়।
জ্ব'লে ওঠে জানালায় কাচ,
ঘর ভরে ঝকঝক আভায়,
পর্দা, টেবিলক্লথ, গালিচা, ফুলদান

আষাঢ় ১৩৬০

লাল হয়ে যায়—
লাল হয় বিছানা বালিশ,
তারি মাঝখানে
ক্লান্তির ক্ষীণ দেহ ভাসে—
মুহূর্তেই সব ভুলে যাই
অবাক বিস্ময়,
মনে হয় সুদূর আকাশে
রঙিন মেঘের কোলে সন্ধ্যা শুয়ে আছে।

বহুক্ষণ স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
ধীরে-ধীরে ছবি মুছে যায়।

কবিতা
বর্ষ ২০, সংখ্যা ৪

উত্তরাই

সলিলকুমার মুখোপাধ্যায়

যদি ভালো আর কেন আলো তুমি জ্বেলেছিলে ?
ভুলেই যে আমি, চাঁদকে যেই ডাকাডাকি।
এ-কথা জেনেও যদি আলো, আলোর নাই।
যদি ভালো তুমি কেন শুধু আলো জ্বেলেছিলে।
কবি নই আমি সে-কথা কবুল করি।
তোমার জন্য মন টানে যাকো জ্যোছনায়।
শুধু যদি ভালো মুখ কেন আলো জ্বেলেছিলে :
ভুলেই যে আমি, চাঁদকে যেই ডাকাডাকি।

তিনটি কবিতা

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

মোহিনী

শেষ রাতের পাৎলা পর্দা ছিঁড়ে
তুমি এলে বেরিয়ে
সহজ আলোয় ধোয়া শরীরে।

দু'হাতে শিউলি ছড়ালে
আমার অস্ফুট জাগরণে।
স্নিগ্ধ আয়ত চোখে দুইলে চেয়ে
নিশির অতল অপরূপ গান ভরে।

হীরে-পান্না-মেশা আলোয়
আমি যেন নেয়ে উঠলাম।

রুচি পাতায় ভোর জাগল।

আলো এখন গোলাপ হয়ে ফুটল
স্থির বিশ্বাসের আভায় মাখা ঝিকমিকে
নীলিমায় শান্তি নামল সোনালি ঘাসে।

দিনের সাথ ঘুচে এলে
গোধূলির লাবণ্য যেন বৃষ্টি হয়ে ঝরল।
তার নরম শব্দ
গানের রেশ হয়ে কাঁপল
আলোর-হাসিতে-ভেজা এই নগরে।

চেনা

ব্যথা-নদীর ওপার থেকে
আমায় গহন ঘুম তুমি এলে
সৌরভ ছড়ালে মায়াময়।

ব্যাকুল, বাড়াই দুই হাত—
ঘুম নিয়ে স্বপ্ন পলাতক।
ঘুম-ছেঁড়া সে-হাত তোমারো
পরশ্চুত এনেছে খবর।

দুটি কবিতা

শান্তিকুমার ঘোষ

আটত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখা

বিপরীত দিকে তবু সমান রক্তের দুই শিবিরে সৈনিক।
রাত্রির তিমির ছিঁড়ে অনেক প্রার্থিত সেই আসেনি পথিক :
নিঃশব্দ দুয়ার পড়ে, নির্বাণ পরিখা পারে বিরতির আলো
প্রহর আশার মতো ; ব্যর্থ সব অস্ত্র নীল মৃত্যু ভিন্ন কালো।

মানবপুত্রের নখ। শতাব্দীর বাস্প জমে অসংখ্য হৃদয়ে :
মুখোমুখি জাগে চেয়ে সমুদ্রের মতো দোলে দুঃখ মানবিক।

অন্য এক সমুদ্র

সমুদ্র ফিরোজা নীল উঠে যায় জমে :
পিছনে রক্তকেশর, বহুদূর বালিয়াড়ি আর এক জাউবন,
আলোকিত সারাক্ষণ।

অনন্ত প্রবহমান অপলক্ষ্য নিয়মে।
অতীত-ভবিষ্য নেই, বার্ধক্য-যৌবনহারা, শুধু এই বর্তমান :
তরঙ্গের সমস্থান।

সপ্তাট সৈনিক কিন্তু মিলিত নির্ঘোষে।
শোকের উল্লাসে মেশে দারুণ প্রসব-ব্যথা, শিল্পীর দুঃসহ দায় :
এই স্রোত এ-প্রবাহ।
সগরসন্তান তবু সমুদ্র শোষেকে :
বনস্থলী গ্রাস আঁকে মরুভূমি ছুঁয়ে। পরমাণু-বিচূর্ণিত মেঘ
সমুদ্রের আনে বেগ।

কবিতা
বর্ষ ২০, সংখ্যা ৪

'ল্য ফ্লার দ্যু মাল' থেকে

শার্ল বোদলেয়ার

রাজহাঁস

উৎসর্গ : ভিক্তর উগো

[ট্রয়ান সেনাপতি হেক্টরের স্ত্রী আন্দ্রোমাকি, ট্রয় নগরীর ধ্বংসের পর আকিলিসের পুত্র পিরহুস (Pyrrhus : নামান্তরে, Neoptolemus)-এর ভাগে পড়েন। পরে ট্রয়ান বন্দী হেলেনুস-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। হোমরের 'ইলিয়াডে' এই হেক্টর-পত্নী আদর ও মমতার আদর্শরূপে অঙ্কিত হয়েছেন, ইউরিপিদিস-এর 'আন্দ্রোমাকি' নাটকের অন্তর্বর্তী নায়িকা তিনি, 'ট্রয়ান উইমেন' নাটকেও সকরুণ শোকাবহ দৃশ্যের অবতারণা। এই কবিতায় তিনি নির্বাসিত ও বিপর্যস্তদের প্রতিভূ।—অনুবাদকের টীকা।]

আন্দ্রোমাকি, তোমাকে স্মরণ করি। সেই প্রভাত,
যা তোমার বিশাল বৈধব্য-দশা বুকে নিয়ে, ভবে
হয়েছিলো বিষাদে প্রদীপ্ত এক শোকের দর্পণ,
মিথ্যাচারী সিময়ীস,[১] পরিপ্লুত অশ্রুর গৌরবে.

তা ভেবে আকুল হ'লো সুপ্রসবী স্মৃতির মঞ্জরী
হঠাৎ, নূতনতর কারুজেলে[২] পা দিয়ে সেদিন।
হায়, নেই পুরোনো প্যারিস আর (এ-মহানগরী
নিত্যপরিবর্তমান, হৃদয়ের চেয়েও স্বাধীন) ;

তবু মনে-মনে আমি দেখি সেই বিলুপ্ত আবাস,
সারি-সারি টালি-ছাদ, চুন-খসা কার্নিশ, দেয়াল,
নর্দমার ফাওলায় সবুজ ঘাঠ, মধ্যে ঘন ঘাস,
আর কত ইতস্তত জ'মে-ওঠা উজ্জ্বল জঞ্জাল।

১। সিময়ীস (Simois) : উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার ক্ষুদ্র নদী, ট্রয়ান যুদ্ধের অনেক ঘটনার স্থান।
২। কারুজেল (Carrousel) : প্যারিসের সড়ক।

পশু. পাখি নিয়ে ছিলো খেলোয়াড়। আমি একদিন
ভোরবেলা, যখন হিমেল, স্বচ্ছ আকাশের তলে
জেগে ওঠে পরিশ্রম, আর শান্ত, শব্দহীন
বাতাসে দুকান তুলে তীব্র ঘাস ছোটে দলে-দলে,

এখানে দেখেছিলাম, ফুটপাতে, এক রাজহাঁস,
খাঁচা থেকে ছাড়া-পাওয়া, জালি-পায়ে কষ্টে হেঁটে চলে
কঠিন জমিতে টেনে পালকের ধবল উল্লাস।
নির্জলা নালার ধারে অভাগার চঞ্চুপুট খোলে,

গলিতে ধুলোর মধ্যে স্নান ক'রে, কাতর, অদ্ভুত,
প্রশ্ন করে—জন্মের লাবণ্য-দুঃখে উদ্গল পরান—
"জল, তবে বৃষ্টি হবে? কবে তুমি জলবে, বিদ্যুৎ?"
আমি সে-দুঃখীরে দেখি, অজস্রদ, আন্তর্য পুরাণ,

আকাশের লক্ষ্য ক'রে, ওভিদের[১] নায়কের মতো
(ঐ নীল আকাশ, হৃদয়হীন, ব্যঙ্গপরায়ণ)
বাড়িয়ে কম্পিত গ্রীবা, কণ্ঠদেশ তৃষ্ণায় প্রহৃত,
যেন তিক্ত ভর্ৎসনায় বিধাতারে করে সম্বোধন।

২

প্যারিস নূতন হোক। অবিকল আমার বিষাদ।
অচল হৃদয়ে সব স্মৃতি যেন পাষাণ-ফলক,
পুরাতন উপকণ্ঠ, পথ, ভারা, নূতন প্রাসাদ
হ'য়ে ওঠে সেখানে প্রত্নচিহ্ন, কঠিন রূপক।

১। Ovid (Publius Ovidius Naso। খৃ-পূ ৪৩-খৃ-পঃ ১৮): লাতিন কবি ও রোমান সাম্রাজ্যিক, কিন্তু কোনো কারণে রোম থেকে নির্বাসিত হ'য়ে জীবনের শেষ দশ বছর কৃষ্ণ সাগরের তীরে অতি দুঃখে বাস করেন। তাঁর কাব্য প্রধানত আদিরসাত্মক, কিন্তু নির্বাসনের বেদনারও বাহন। বোদলেয়ার-এর "অনুকম্পাহীন আদ" কবিতাতেও তাঁর উল্লেখ আছে।

তাই, দুঃস্বপ্নের পথে, আমার স্বরূপে করে হানি
ঘরালের চিত্রকল্প, নির্বাসনে নির্মোহ, মহান,
উন্মাদের মতো ভঙ্গি, আর তার চিত্তে অনুমান
কোন এক বাসনার জ্বালা ! তখন তোমারে ভাবি,

আত্মোদ্ধারে, ধরিত্রীর বাহ্যচুম্ব, পাশব অত্যাচে
শিরস্ত্রাণের ঘৃণ্য হাতে সমর্পিত, তুমি, পুনর্বার,
আনন্দে আনত হ'লে শস্যগর্ভ সমাধির পাশে ;
হায়, হেলেনুস-জায়া, চেঙ্গিসের সন্তপ্ত বিধবা !

আর ভাবি, কর্দমে আস্তীর্ণ পথে, ক্লান্তি বর্ষীয়ের,
ক্ষুধিত, বন্যায় ক্ষুণ্ণ, এই ব্যাপ্ত কুহেলি-দেয়াল
কাটাতে পারে না, তবু ক্লান্ত চোখে খোঁজে ফিরে-ফিরে
অপরূপ আফ্রিকার অপচ্ছত, অমৃত তমাল ;

ভাবি, কে হারালো তা-ই, কোনোদিন যা ফিরে পাবে না,
তৃষ্ণা কার মেটায় অজস্র ধারা, আর সহচর
ধাত্রিনীর মতো দুঃখ স্তন্য দিয়ে শোষ করে সেনা ;
মরন্ত ফুলের মতো ভিখারির বিস্তীর্ণ বিলয় !

অরণ্য আমার আত্মা, দীর্ণ ক'রে তার নির্বাসন
তূর্যনাদে বেজে ওঠে প্রাচীন স্মৃতির ব্যাকুলতা !
দূর দ্বীপে বিস্মৃত মাল্লার দল, ম্লান বন্দীগণ,
পরাজিত, ক্রীতদাস !···ভাবি আরো অনেকের কথা ।

অলকোষা

ফেলে দিলো বসন আমার প্রিয়া । আমার অদ্ভুত
খেয়ালের অর্থ বুঝে—সুলতানের সোহাগে গর্বিণী
সুন্দরী বাঁদির মতো—চন্দ্রহার, কেয়ূর, কিঙ্কিণী
(কিন্তু অন্য কিছু নয়) প'রে নিয়ে হ'লো সে প্রস্তুত ।

আষাঢ় ১৩৬৩

বাদুড় আর পাখরের মেলিহান এই পরিসর
চকল নিষ্ঠুর ছুরে সে-পুলকে ডোবায় আমারে,
যার স্বাদ পেয়েছি কেবল সেই অকূল পাথারে
যেখানে ছড়িয়ে আছে গীতি আর ধ্বনির অমর।

নিলো সে আমার কাম : তারপর, পালঙ্কবিতানে
এলিয়ে, ঈষৎ হেসে, ডাকলো সে অলসবচনা।
সমুদ্রের মতো শান্ত, অতলান্ত আমার কামনা
ছুঁলো তার ফুল চূড়া জোয়ারের প্রবল উত্থানে।

বুঝে নিলো, পোষ-মানা বাঘিনীর চতুর কৌশলে
তার স্তন, ঘর্ষিল দেহের লাস্যে আমার আহ্লাদ :
যে-ভঙ্গি যখনই যাচে, তা-ই পায় প্রবল আস্বাদ
শুভ্র, কূট, সরল, পিচ্ছিলে মেশা সহজ হিল্লোলে।

আমার তন্ময় চোখ, মত্ত হ'য়ে মধুরের ধ্যানে,
রাখে, তার দ্যুতিময় কটিতট, জঠর, জঘন,
মরালগ্রীবার মতো কম্পমান, কেলিনারায়ণ :
উদর, স্তনযুগল, দ্রাক্ষাগুচ্ছ আমার উদ্যানে,

উঠে এলো, বাসনার নাড়া দিয়ে, ডাকিনীর মতো।
ভেঙে দিলো, যে-বিলাসে করেছিলো আমারে বিলীন
প্রেয়সী, প্রোজ্জ্বল, দূর, সিংহাসনে নিঃসঙ্গ আসীন ;
শান্তির মাধুরী তার আন্দোলনে হ'লো প্রতিহত।

রোমীচক্রে তরঙ্গের ভঙ্গে হ'লো রূপান্তর তার ;
নিস্তব্ধে সে আন্তিওপি[১], ক্ষীণ অঙ্গে তরুণ যামল,
মিশে যায় বিপরীত ; আর তার রোমহর্ষ ঘর্ম
ঘামায়ি, বন্ধল, স্নিগ্ধ—মনে হয় স্বর্গের সন্তার।

নিবে গেলো ঘুমুর্ঘাতির শিখা। কোমলবিষণ
অস্তিভূত একা জ্বলে অন্ধকার, শুদ্ধ নিরাশায়,
ঘতবার দীর্ঘশ্বাসে লালিমার উল্লাস আলায়
শোণিতে প্লাবিত করে গাত্র তার অ্যাম্বারবরন।

মরণের মৃত্য

উৎসর্গ : এর্নেস্ত ক্রিস্তফ

[এর্নেস্ত ক্রিস্তফ (Ernest Christophe : ১৮৫৭-৯২) ফোদেসোর-এর সমসাময়িক একজন ভাস্কর, তাঁর গড়া 'Danse Macabre' নামক নারী-কঙ্কালের মূর্তি এই কবিতার উৎসমূল। মূর্তিটির নিম্নে ভবিষ্যদ্বাণী আলোচনা লিখতে গিয়ে ফোদেসোর এই কবিতার প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করেন। মূর্তিটি বর্তমানে কোথায় আছে জানা যায় না।—অনুবাদকের টীকা।]

সম্রাট রমণী যেন, গর্ব যার রুমাল, দস্তানা,
বিরাট ফুলের তোড়া, বরতনু সজ্জল, সরল,
উদাসীন যাদুকরী, মুখ ভরি, আছে তার জানা,
ক্ষীণাঙ্গী, বেণুমতী অভিবেল প্রমদার মতো।

নাচের আসরে কবে কে দেখেছে এমন তন্বীরে ?
ঘাসীয় অপরিধানে পরিস্ফীত তার গাত্রবাস,
আঁটো ছুতো, ফুলুষের মতো কান্ত, কঠিন ঝিল্লিরে,
পা বেঁধে, কোটায় তার মরমর মূর্ছার বিলাস।

১। Andope : গ্রীক পুরাণে বর্ণিত, Zeus-এর অন্যতম প্রণয়িনী।

কামুক কায়না যেন, আঘোষিত নিলাজ ঘর্ষণে,
লেলে-বোনা পলবন্ধ কেলি করে বিলোল কণ্ঠায়,
সে যারে লুকোতে চায়, মৃত্যুরঙ্গী সেই আকর্ষণে
বাঁচায় বিক্রম থেকে সযত্নে শোভন উৎকণ্ঠায়।

নিবিড় নয়ন তার সুস্তময় তমসায় গড়া,
মৃদুমার মেরুদণ্ডে তার দিবে, অতি মন্দ তালে
দোলে তার করোটির বেষ্টিবন্ধে সুপ্তের পসরা।
আহা কী মাদুরী করে সুপ্ত তারে উৎসবে সাজালে।

"ব্যক্তচিত্র।" বলে ওরা ; রক্তেমাংসে আত্মনিবেদনে
আসক্ত, মাতাল হ'য়ে বোঝে না তো ছুর্ণার মিছিল
মানবিক ওপকরে নামহীন এই প্রসাধনে।
কঙ্কাল ! আমার কাম তোমাতেই খুঁজে পায় মিল।

এলে কি জানাতে ত্রাস জীবনের অবোধ উৎসবে
বিকট ভবিষ্যৎ নিয়ে ? না কি এক প্রাচীন, দুর্বার
লালসায় অন্ধ তেজ অকস্মাৎ সঞ্জীবিত সবে
ভোগের চৈত্রচক্রে ঠেলে নিয়ে এলো পুনর্বার ?

প্রোজ্জ্বল যৌনের দাবে, শীতঘর তীব্র বেহালায়
বিক্রমে বিলোল ঐ ছুবস্তেরে ভেবেছো, ঠেকাবে ?
অথবা হৃদয়ে তার নরকের প্রদীপ্ত জ্বালায়
ডুবিয়ে দেবে কি এক অন্তহীন রতিমদভাবে ?

অধিকার নিকেতন, প্রবাসের অক্ষয় আধার,
শাশ্বত তৃষ্ণায় যার ফুরায় না এক পরিতাপ—
চেয়ে দেখি, খোপে-খোপে আকরি-কাটা পাঁজরে তোমার
নূতন উৎসাহ নিয়ে জাগে শুধু তৃপ্তিহীন সাপ।

আসলে, আমার ভয়, তাবিনীর চঞ্চল বিলাস
যত না বিলোল অর্থে, মিলবে না উচিত মহড়ি ;
এ-যুগ জগতে কে বা বোঝে ঐ গূঢ় পরিহাস ?
কেবল বীরের ভোগ্য বীভৎসের গহন মাধুরী।

গহ্বর তোমার চক্ষু, ভীষণের ভাবনাবিহ্বল,
উপরে তোলে অপলায়। বিকশিত বক্ষিম পাটিতে
চিরন্তন হাসিটিরে বিচক্ষণ নর্তকের দল
পারে না, ভক্ষায় বিনা, মুহূর্তের মনোযোগ দিতে।

অথচ, কেউ কি আছে, কঙ্কালেরে বাহুবন্ধে বেঁধে
কবরের উপচারে অতি যত্নে লালন করেনি ?
গন্ধ, বেশ, অঙ্গরাগ ত'রে আছে সে কোন সংবেদে ?
বিভূষায় জানে শুধু ধরা পড়ে বর্তমান ক্ষণী।

নাসাহীন দেবদাসী[১], আকর্ষণে গন্তানি অক্ষের,
ছুরি যাতে রাহুগ্রস্ত, সেই সব দাক্ষিত, যেমন
নর্তকেরে বলো, "ওরে, হা, তুমি, পাউডর সত্ত্বেও
তোমা সব মৃত্যুর দুর্গন্ধে-ভরা ! শুধু আন্তিনুস[২],

যামিনে যাতায়ো শব, পরিক্ষীর্ণ লাভিলেস[৩] ওরে,
নির্দোষ যাদু ও যিশু, যুগযাতি-যাযাবর কঙ্কাল—
যবনের মহানৃত্য নিখিলেরে আন্দোলিত ক'রে
সকলেরে ভুলে যেয় অজানায় দূর চন্দ্রযান।

১। মূল bayadere, যার অর্থ ইন্দিয়ানাচনীর নর্তকী। শব্দটির মূল আমি সন্ধান ক'রে পাইনি।

২। Antinous : গ্রীক : Antinoos রোমক সম্রাট হাড্রিয়ানের প্রিয়পাত্র তরুণ যুবক। এঁর অনেক প্রস্তরমূর্তির এখনো অস্তিত্ব আছে।

৩। Lovelace (উচ্চারণ : লাভিলেস) : স্যামুয়েল রিচার্ডসন-এর "Clarissa Harlowe" উপন্যাসের এক লম্পট চরিত্র।

তুহিন সেন্-এর তট, দহমান গঙ্গার পুলিন,
সর্বত্র খেলায় মাতে মরগণ, অথচ ভাবে না
মলতীর হত্ত দিয়ে—যেন ভালো, হিংসুক সঙ্গিন—
হানা দেয় সর্বশেষ কুরুক্ষেত্রে দেবদূত-সেনা।

সকল স্বর্গের তলে, সব দেশে, মৃত্যু নেয় দেখে
তোদের সঙ্গের ভাঙি, যে মানব, বিহ্বল নেশায়,
এবং, তোদেরই মতো, মাঝে-মাঝে মরণস্ক দেখে
তোদের উন্মত্ত স্রোতে আপনার বিজন দেশায়।"

নিখ্যার প্রেম

অলস আবরিণী, যখন দেখি তোরে—
কর্ণিত বেহালায় সীলিতে ভাঙে সুর,
চলায় বৃত্ত লয় ছন্দে বাঁধা পড়ে
নিবিড় নির্বেদে নয়ন তারাতুর ;

গ্যাসের আলো, দেখি, সাজায় তোর স্নান
ললাট যেন এক যোগের গহনায়,
সান্ধ্য ধাতি আনে উদার অনুমান
ছবির মতো তোর চোখের মোহনায় ;

তখন ভাবি, "সে যে সুন্দর, রূপবতী,
বিরাট স্মৃতি তার মুকুট মণি-জলা,
আহত পাকা ফলে স্মৃতির পরিণতি,
তৈরি তনু তার শিখবে কামকলা।"

বল, হেমন্তের পরব কল ছুই ?
না, চিতাবনের অশ্রু-অভিলাষ ?
মধু-উপাখ্যান ? গন্ধতরা ছুঁই ?
সুদূর মরুভূর দুলের নিশ্বাস ?

আছে তো জানি চোখ বিষাদে ঘন-লীন,
অথচ নেই কোনো গোপন আকুলতা ;
খচিত পেন্সিলের গর্ভ মণিহীন—
কেবল নীলিমার গভীর সুস্থতা !

কিন্তু প্রতিভাস—তা-ই তো যথেষ্ট !
মুখোশ হোক, আর মোহন প্রসাধন—
কী তাতে এসে যায় ? অন্তে যাবি মিছে
ও তোর মায়াজাল আমার আবাধন !

স্বীকারোক্তি

শুধু একবার তোমার বাহুর ছাতি
আমার বাহুতে করেছিলে বিস্তৃত ;
মধুর মহিলা ! সেই ক্ষণিকের স্মৃতি
মনের তিমিরে এখনো যায়নি অস্ত ।

গভীর প্রহর ; নতুন চাঁদের মতো
চাঁদ ঢেলে দেয় গভীর মধুরিমা,
সুপ্ত প্যারিসে জাগে অপ্রতিহত
বন্যার মতো উদ্বেল পূর্ণিমা ।

পা টিপে, লুকিয়ে, বিড়ালের আসা-যাওয়া,
কান খাড়া ক'রে, ছায়ার অন্তরঙ্গ ;
ওরা যেন মৃত প্রিয়ের প্রেতচ্ছায়া
সন্তর্পণে চায় আমাদের সঙ্গ।

আলোর প্রস্থন, অমল সে-বিনিময়ে
রম্য বীণায় তুমি ছিলে বাণীমূর্তি,
অথবা স্বপ্ন, প্রভাতের বিস্ময়ে
দুর্বনাদের উদার স্বতঃস্ফূর্তি ;

অথচ সহসা, তোমারি কণ্ঠ টুটে
(যা ছিলো সহজ পুলকে কলকে পূর্ণ)
তীব্র, ধারুণ আর্তনিনাদ উঠে
সে-বৈদূর্যে ক'রে দিয়ে গেলো চূর্ণ !—

জগৎ সিত, বিকট, অজহীন,
জমাটো যেন ভুলে কলঙ্ক মেখে,
যাকে রাখা চাই নেপথ্যে বহুদিন
অদর্শনীয়, গুপ্ত গুহায় ঢেকে।

হায় অপরা, সেই কর্কশ ধ্বনি
শোনালো বার্তা : "অবিভিন্নিক্ত বিশ্ব।
প্রসাধনে ব্যস্ত হোক সে পরিশ্রমী
অহর্নিকাতেই মগ্ন নিখিলমূক ;

রূপসী নারীর ব্যবসা কঠিন অতি
গতানুগতির নিষ্ফল বাহুপাশে,
নর্তকী যেন, শীতল, বেতনবতী,
মূর্ছা গেলেও পুতুলের মতো হাসে ;

শুধু সে-জন, হৃদয়ে যে বাসা বাঁধে,
ক্ষণভঙ্গুর অনুরাগ, সৌন্দর্য—
সব জড়ো করে চিরন্তনের কাঁধে
বিস্মরণের অথাহীন বাৎসর্গ।"

আজো মনে পড়ে, শান্ত সে-অবকাশে
যৌন চাঁদের মায়াবী অভিব্যক্তি,
এবং তীব্রণ, বর্বর বিশ্বাসে
হৃদয়ের সেই দুর্জয় স্বীকারোক্তি।

সৌন্দর্যের স্তব

উৎস কি তোর দ্যুলোক, অথবা পাতাল-তল?
সুন্দর! তুই অমৃতচক্ষে নরক ফেলে
উপকার, পাপ, বিকার ছড়াস অনর্গল,
তাই তো মনের পাত্রেই তোর তুলনা মেলে।

উষার উদয়, অস্তভানুতে নয়ন ভরা;
অবয়বতাও চুম্বনে ঢালে ওষধি-রস;
অঙ্গবাসে ঝড়ের সন্ধ্যা জমেছে ধরা,
বীরের বেপথু, এবং শিশুর দুঃসাহস।

উৎসব আর ধ্বংস বিলাস বিবিচারে,
সবম কর্মী। কারো কাছে নেই অব্যাহতি।
মৃত্যু নিয়তি, ছুছুন্দরের মতো, শিছু না ছাড়ে,
পাতালে, তারায়—বল ছিলি তুই কোথায় গৃহী?

আহত তোর মণিবন্ধের সংকলিত,
মুহূর্তে বাড়িয়ে চলে বাস দুই গর্বভরে ;
এবং হত্যা, ঘাতির প্রসাদে চকলিত,
পুতুলের মতো বিহ্বলে তোর মৃত্য ঝরে।

কণিকার পাখা তোর দীপালির সম্মোহনে
কাঁপে, জ্বলে, আর বলে, "এ-বহ্নি অমরাবতী।"
মুমূর্ষু যেন আপন চিতায় আলিঙ্গনে,
বধূর অঙ্গে আনত তেমনি তরুণ পতি।

স্বর্গে অথবা নরকে জন্ম, কী এসে যায়,
ওরে সুন্দর, বিকট, সরল, দারুণ ত্রাস!—
যদি দুই—আমি ভালোবেসে যাবে খুঁজি সুখায়—
চোখের জলকে সেই অসীমেরে খুলে দেখাস।

অনন্তা, তুই দেবী না ডাকিনী, কে আর ভাবে—
মরমল-চোখে অপরূপ তোর উজ্জ্বলতা
যদি ভরে লঘু, ছন্দে, গন্ধে, মধুরাবে
নিখিলকালিমা, আর সময়ের মন্থরতা।

অনুকম্পাহীন ত্রাস

অস্থির, তোর ভবিতব্যের মতো,
এবং ভয়াল, পাংশু গগন-তল
তোর ও-মুখে বাধায় অনবরত
সে কোন চিন্তা? লম্পট, কথা বল।

—তৃষ্ণা আমার তৃপ্তি আজো না পেয়ে,
অনিশ্চয়ের আঁধারেই আনাগোনা,
বঞ্চিত হ'য়ে লাভিন মর্ম থেকে
ওভিদের মতো কোনোদিন কাঁদবো না।

স্থির আকাশে সৈকত অনুমান,
তোমাতেই দেখি আমার অহংকার ;
তোমার মেঘের বিষণ্ণতার তার

সে যেন আমারি স্বপ্নের শবযান,
এবং তোমার রশ্মিতে তারি ভাষা
যে-নরকে আমি রেখেছি সুখের আশা।

ক্ষুদ্র কবিতা

আহা রে, কবিতা, বল্, কোন ব্যাধি তোরে আজ দহে ?
নয়নকোটরে দেখি গলদশ্রু নৈশ অতিভ্রম,
আর তোর গাত্রে মেলে, একাত্তর, সমান আগ্রহে
মুচ্, মূক অপস্মার, আতঙ্কের হিমেল বিক্রম।

এলো কি সবুজ প্রেত, কিংবা কোনো লোহিত প্রমথ,
কটাহমদনে তোর লালসার সম্রাস জ্বালা তে ?
অথবা ছুরপ্ত, এক বজ্রমুষ্টি দানবের মতো,
তোরে কি ডুবিয়ে দিলো মিনটার্ন[১]-এর বিকৃত জলাতে ?

১। ক্ষুদ্রাপি, Miturnae : ইংরেজি, Miturne : গ্রীক ও লাতিন, Miturnae : রোমের দিকটবর্তী জলাভূমির ক্ষুদ্র শহর। রোমান নেতা Gaius Marius (খৃ-পূ ১৫৭-৮৬) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী Sulla (বা Sylla) কর্তৃক বিতাড়িত হ'য়ে সেই জলার মধ্যে লুকায়িত অবস্থায় ধরা পড়েন। প্লিনি, প্লুটার্ক, সিসেরো প্রভৃতি লাতিন গ্রন্থকর্তারা অবশ্য মিনটার্ন-এর জলার উল্লেখ করেছেন।

আষাঢ় ১৩৬০

মনে হয় তোর বুকে ভাবনার গভীর উল্লাস
নিশ্বাসে বিলায় যদি একবার স্বাস্থ্যের সুবাস।
এবং সরল ছন্দে ঢেউ তুলে ধমনীর শোণিত

শিখে নেয় সেই দূর অতীতের দীপক-সঙ্গীত,
যখন ছিলেন প্রভু, একান্তর এবং ধরাট,
কীবাস, গানের পিতা, আর প্যান্, শব্দের সম্রাট।

উঠে আয় আমার বুকে, নিটুরা নিশ্চেতনা,
সোহাগী যাত্রী আমার, মদালস অঙ্গ ওরে,
প্রগাঢ় ছুম্বনে তোর ডুবিয়ে, ঘণ্টা ত'রে,
চঞ্চল আত্মস আমার—হ'য়ে যাই অন্যমনা।

ঘাসরায় গন্ধ ঝরে, ঝিমঝিম ছড়ায় মনে,
সেখানে কবর খোঁড়ে আমার এ-ঘিন মাথা,
মৃত সব প্রণয় আমার, বাসি এক মালার গাঁথা,
নিশ্বাস পূর্ণ করে কী মধুর আস্বাদনে।

ঘুমোতে চাই যে আমি, যে-ঘুমে ফুরোয় বাঁচা,
মন্থনের মতোই কোমল তন্দ্রায় অস্তগামী,
ক্ষমাহীন লক্ষ চুমোয় তবু তোর ঢাকবো আমি—
উজ্জ্বল তামার মতো ও-তনু, নতুন, কাঁচা।

তবু তোর শয়ন-'পরে আমার এ-কান্না ঘুমোয়,
খোলা ঐ বক্ষে ডুবে কিছু বা শান্তি লোটে ;
বলীয়ান বিস্মরণে তন্দ্রা তোর দীপ্ত ঠোঁটে
অবিরল লিখির ধারা ব'য়ে যায় চুমোয়-চুমোয়।

১। Lethe। গ্রীক কাব্যে বিস্মরণের নদী। হিন্দু বৈতরণীর সঙ্গে তুলনীয়।

নিয়তির চাকায় বাঁধা, নিরুপায় যাত্রা আমি,
নিয়তির পাশেই গাঁথি ইদানীং ক্ষুদ্র মালা ;
বাসনা তীব্র যত, বাসনার বাড়ায় জ্বালা—
নবিনয় চাহুনে সহীদ, নির্মল নিরলসাবী !

এ-কঠিন তিক্ততায়ে ডোবাতে, জয়বো সোমণ
ধুতুরার নেশায় ভরা গরলের তীব্র কৌটায়
ঐ তোর মোহন স্তনের আওয়ান মৃদু ঠোঁটায়—
কোনোদিন অন্তরে যার ছন্দের হয়নি সোমণ।

কোনো মালাবারের মেয়েকে

তোমারই হাতের মতো সুকুমার তোমার পা দুটি ;
সুন্দরী খেতার চোখে শুকতর ঈর্ষার ভ্রূকুটি
জাগাও জঘন-ভঙ্গে ; শিল্পীর আদরে গড়া মধুর শরীর—
তারও চেয়ে তোমার মখমল-চোখ আরো কালো—বিশাল, গভীর।
সেই নীল আভাস হাওয়ায় ভেসে, যেখানে বিয়াতা
তোমাকে দিলেন জন্ম—কৌটো ভ'রে লঙ্কা, জিরে, তেজপাতা
তুলে রাখো, কুঁজোয় ঠাণ্ডা জল, আরেসি তর্তার
কবিতে তামাক সাজো, ঠেকাও মশার হল্লা শয্যা থেকে, আর
যখন তোরের গান জাউবনে ওঠে কেঁপে-কেঁপে
কিনে আনো সস্ত বাজার থেকে আনারস, পেঁপে।
সারাদিন স্বাধীন বেড়াও তুমি, খোলা গায়ে যেখানে-সেখানে,
গুনগুন করো কোন অচেনা, পুরোনো সুর বাতাসের কানে।
আর লাল সন্ধ্যার আঁচল যেই ব'সে পড়ে দূরে,
যাও না এগিয়ে যেহে যায়াবর নরম মাদুরে ;

ভেসে-চলা তোমার স্বপ্নের দল, পাখির কাকলি দিয়ে ভরা,
ছড়ায়, তোমারই মতো রমণীয়, কুলন্ত পলয়।

হায় রে, দুলালী, কেন বেঁধে নিলি আমাদের এই
অনত্যকাতর ক্রান্ত, যেখানে দুঃখের শেষ নেই?
কেন তোর আজন্মের আদরিণী ঢেঁড়ুলতলারে
বিশাল বিদায় দিয়ে, নাবিকের বাহুর বিস্তারে
গ'ড়ে দিলি জীবন, যৌবন? কোনোদিন যদি পড়ে মনে—
পাৎলা মসলিনে ঢেঁপে শীত, শিলা, তুষারবর্ষণে—
দেখিস মধুর খেলা, ছেলেবেলা, আকাঙ্ক্ষার পটে,
তবুও চোখের জল ঠেলে রেখে, নিষ্ঠুর কর্সেটে
পিষ্ট স্তনে, তিন্-ফেরী অঙ্গের আস্রাণ ফেরি ক'রে,
আর খুঁটে খেতে হবে প্যারিসের পঙ্কিল খর্পরে—
এদিকে, বয়লা, ঢেঁড়া কুয়াশায় তোর পথ-চাওয়া
খোঁজে ক্ষীণ, সুদূর তুষুরিদের বিবশ প্রেতের মতো ছায়া।

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

মৈকালি লোক-সঙ্গীত

(জেরিয়র এলউইন-এর ইংরেজি থেকে)

বিকাশ দাশ

১

যাচ্ছো তুমি অনেক দূরের দেশে—
ওগো মেয়ে, ওগো সোনার মেয়ে।
যাও না দিয়ে নীল কাঁচলখানি,
যাতে তুমি ঢাকো তোমার স্তন।
সকাল আর বিকেলে সারাক্ষণ
দু' চোখ মেলে দেখবো চুলচাপ !

২

তখন ছিলো ঘুমুর আর এখন নীল রাত,
মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে বলো মেয়ে
কোথায় তুমি চলেছো ?—কেন একা ?

৩

তামাক-খেতে মোরগ ঘোরে একা—
তেমনি ঘুরে হৃদয় পায়চারি
যখন তোমায় পাই না আর দেখা।

৪

রাজা, তোমার জন্যে পাগল আমি,
হৃদয় পাগল এবং কেমন ভারি।
তুমি ছেড়ে গেছ ঘরের আরাম,
বাইরে কোথায় শয্যা পাবে গরম।
কোথায় গেলে আমায় ছেড়ে একা—
আমায় একাকিনী।

০০০

আষাঢ় ১৩৬৩

বাইরে কেবল খাচ্ছে খেয়ে ফল,
এসো পাগল দু'জন চলো যাই,
দূর পাহাড়ে—নীল পাহাড়ে চলো।
সবুজ পাহাড় সবুজ,
হলদে বাঁশবন।
সবুজ ফুল, কালিন্দর লতা
চুলে আমার কদম্বের ফুল।
কোথায় তোমায় খুঁজে পাবো, রাজা,
হৃদয় আমার পুড়ে হ'লো খাক্।
কোথায় তুমি, পাগল, আমার পাগল।

ঝিল্লির ঘুম

অর্চন দাশগুপ্ত

চু-সীটারে ঝড় আর মুহুর্মুহু স্টীডোমিটারের
অস্থির কাঁটাতে কাঁপে আশঙ্কার যান্ত্রিক নির্দেশ,
উইণ্ডস্ক্রীনের কাচে একটানা পাখার ঝাপটে
হাওয়ার চীৎকার : আজ অসম্ভব গীয়ার-বদল।

দু'ধারের দৃশ্যছবি রুদ্ধশ্বাসে পিছনে দৌড়োয় :
বিকেলের ক্লান্ত মাঠ, হাওয়ায় প্রণত ঘাস ফুল,
প্রবীণ পীপল গাছ, শুষ্ক গ্রাম্য কুঁড়ের উঠোনে
ঘুরঘিয়া দানা খোঁটে, সন্তানা শূকর-জননী,
ছাগলের পাল ফেরে, শুদ্ধ মুখে পুষ্ট বাঁট দোলে,
উজ্জ্বল টীনার ঝাঁক লম্ব-লাকা মকাইয়ের খেতে,
মরাইয়ের ম্লান চৌকা ছায়া মেলে অবসন্ন রোদে,
জীর্ণ ইঁদারার পাশে মুগ্ধ চোখ আহীর মেয়ের।
পাশের অবাধ্য চুল গালে ঠেকে, পলি-র আস্রাণ :
উড়ে চলো, উড়ে চলো—সময়ের সীমা কতদূর ?

ঊর্ধ্বগতি তাপমান ; আকাশে বারিশ ;
বিষাদে জলন্ত রোদ, পলেস্তারা-খসা
সদ্যুজে ফাটল-ধরা শাহী মসজিদে,
বেনামি কবরে ; দূ-তে খামের আড়ালে

আষাঢ় ১৩৬০

স্থবির ফকির ; কোনো প্রাক্তন সরাইয়ে
খুলোয় বসকে রাখা কাটা তরমুজ।
আবক্ত খরমুজ, আধ ; ঘোলাটে ঠাণ্ডাই
মাটির খুরিতে ; তিমতি, উজ্জ্বল মদক ;
পিয়াউ, কাঁদায় লোটা ; আরশুরি কুঁজো
খেজাক্ত গাধার পিঠে ; খসখসের ঘ্রাণ।

(আঙ্গামান উপকূলে, বঙ্গোপসাগরে
বর্ষার সকায় ইতি আবহপণ্ডিত।)

এখানে স্বর্গের দিবা সোনালি হলুদ
ঘুমে-থাকা সৌদামের চীনে-লণ্ঠনে ॥

দুটি কবিতা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

জানলা

দূরের পাখি তারার ভুয়াসা
তুমি আমার পাশে,
একা পাইন আপন-ঠিকানিয়া
বিষণ্ণ নিশ্বাসে।

সীমা-টীমার কতকালের ছায়া,
উলঙ্গকা চূড়োর মুখোমুখি—
ঐখেনে, কাল কক্ষকে রোদ হ'লে
শতভ্রুর উঁকি।

ভ্রষ্ট প্রেম

সে এসে দাঁড়ায় বুঝি আকাশের মতো,
তবু, স্থির, আলোয় আনত
শরীরে কোথাও আমি চাবেলি কি ছুঁই
রাখি না কিছুই ;

সে যদি হাওয়ায় সরে, জলে ভেসে যায়,
দাবানলে পোড়ে—
তার মৃতদেহে, নাকি স্মৃতির শরীর
তীক্ষ্ণ হাতে, চুপিচুপি ছুঁই।

পূর্বরাগ

দুর্গাদাস সরকার

দু বেলা দু দণ্ড দেখি। বাইরের খোলা বারান্দায়
যখন দাঁড়ায়—মুগ্ধ বিস্ময়ে থামায় তার গতি,
নিস্তব্ধ দিগন্ত তাকে নীলবনে আসন্ত আনায়।
অনবগুণ্ঠিত তার চোখে মুখে আশ্চর্য সংগতি,
যৌবনে অবনীজাতী, এ-জীবনে পরম নির্ভয়।
ললিত কণ্ঠের তার হয় রাগ, ত্রিভঙ্গ রাগিণী
যেদিন বৈকালে বাজে—সে-রাগের সাগরে হারাই,
আড়ালে নিকটে যাই। ভাবি, হবে আলাপচারিণী
যখন থামাবে গান। তবু ফিরে করেছি খোলাই
অক্ষরে আস্তীর্ণ ক'রে তার নাম প্রতিটি প্রহর।

কী ভাবে যে কথা বলি। সেথা কথা বলাই কঠিন।
সতৃষ্ণ চোখে সে চায়। স্মিত মুখ নামায় কৌতুকে
গোপনে লালন করে বুকে কথা। জানে না তা মুখে
সন্ধ্যায়, জড়ায় সে যে আমার চিন্তায় অনুদিন।
আমাকে দেখলে তার ফুল হয় গান। শুধু ঝরে
না-বলার কথার সিন্ধু বিন্দু-বিন্দু তার কণ্ঠস্বরে।

তিনটি কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

প্রেমিকের গান :

এসো এসো যায়, হও না তুমি হৃদয়হীনা—
আমার প্রেম দুই হৃদয়ের সমান বড়ো ;
লাজ হেনে যত আমায় দাও তাড়ন করো,
শুধাবো না, সত্যি ভালোবাসো কিনা।

বক্ষ তোমার কঠিনতায় পুলক লাগে
যখন দেখি নিখিল ছুড়ে নাস্তি আশা,
অথচ ধীর হৃদে আমার ভালোবাসা
ধূসর সব বহুর মাঝে রক্তরাগে।

কিন্তু যদি সম্ভাবনা অবাস্তব,
তাহ'লে প্রাণ শান্তিহীন কিসের টানে ?
নয় কি অনাগতেই ইতিহাসের চাবি ?

যেমনা দিনের অন্ধকার তাই তো ভাবি—
একটিবারও ঘটলো যদি অসম্ভব,
আবার যখন ফেরবে না পা, কেউ কি জানে।

প্রেমিকের গান : ২

কাছে যাওয়া বড্ড বেশি হবে,
এই এখানেই দাঁড়িয়ে থাকা ভালো ;
তোমার ঘরে ঘুমকে আছে দুপুর,
বারান্দাতে বিকেল প'ড়ে এলো।

মধ্যিখানে পরদা নাড়ে হাওয়া
অলির মতো ফুলের অবসরে,
গন্ধভরা তরুর দাক্ষিণ্য
সম্ভাষণার প্রান্তে খেলা করে।
কিন্তু আমি চোখ ফিরিয়ে দেখি,
ক্যালেণ্ডারে বছর উড়ু-উড়ু,
ক্লান্ত ছুটো শালিখ নেচে বেড়ায়—
এবং শুনি বুকের দুরুদুরু।
শুনি আপন বুকের দুরুদুরু,
সেখানে এক মস্ত আগন্তুক
রক্তকণায় তুলেছে তোলপাড়—
সেইটুকুতেই সুখ, আমার সুখ।

কথা বলা বন্ধ বেশি হবে,
থাকো আমার চোখের দাবদাহ,
লক্ষ শিখার স্বপ্নে যেমন জ্বলে
অস্বাভাবিক নিথর বাজুরাহো।
শান্ত দুটি বাহুর অভিধান
আলিঙ্গনের প্রকাণ্ড এক বনে,
ঠোঁটে তোমার দীপ্ত কমণ্ডলু
উপচে পড়ে বিদ্যুতে চুম্বনে।
কিন্তু আমি মুগ্ধ হ'য়ে দেখি
তোমার পিছে জানলা আছে খোলা
আকাশ, তারা, দিগন্তেরে নিয়ে—
এবং শুনি অনন্তের দোলা।

তুমি অতল জলরাশির ঢেলা
যেখানে জড়—অন্ধ, অনিচ্ছুক—
বাধ্য তোমায় সৃষ্টি করার কাজে—
তাতেই ভরে বুক, আমার বুক।

এক তরুণ কবিকে

পাঞ্জাবিতে টাঙ্গি রেখো কড়া,
ছাটা চুলে ঘরে এঁকো টেরি,
লোকে দেখে ভাবুক, 'আমাদেরি!'
নয়তো ঝড়ে ছিঁড়বে দড়িদড়া।

সামনে তোমার অনেক আছে বাঁড়া :
আক্রমণ, কাকের করতালি,
অবসাদের মলিন জোড়াতালি—
চতুর মন, ছদ্মবেশ ছাড়া

ঢাল-তলোয়ার আর কী তোমার আছে,
যদ্দে যার বানের জলেও বাঁচে
ভূতের মতো, অক্ষয় সেই আগুন?

আর তাছাড়া, সত্যি যদি উদ্ধব
বাড়িয়ে তোলে নিশ্বাসের হাওয়া—
আর কেন যা বিজ্ঞাপনের খোঁয়া।

আধুনিক কাল ও বাংলা কবিতা

জ্যোতির্ময় দত্ত

অগত। সুকুমার রায়। কাহিনী। আড়াই টাকা
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা। প্রমোদ মুখোপাধ্যায়। নতুন সাহিত্য ভবন। দেড় টাকা
তৃতীয় নয়ন। পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য। ইতিবাস প্রকাশনী। ছ টাকা
লঘু গোধূলি। রবীন্দ্র বিশ্বাস। বিকল্প সাহিত্য ভবন। ছ টাকা
মুক্তির আস্বাদ। দিলীপ রায়। জিজ্ঞাসা। দেড় টাকা
দক্ষিণ মারুত। অরবিন্দ গুহ। ক্যালকাটা পাবলিশার্স। ছ টাকা
হেমন্তের দিন। রাজলক্ষ্মী দেবী। অভ্যুদয় প্রকাশমন্দির। দেড় টাকা

আমার প্রবন্ধের আলোচ্য এই সাতজন কবি প্রমাণ করেন যে আধুনিক বাংলা কবিতার বয়স অনেক হ'লেও এখনো স্বভাবচরিত্র বিশেষ বদলায়নি। আজকালকার কবিরা সাধারণত খুব নিপুণ : এ-কথা বহুবার শুনেছি এবং হয়তো মিথ্যে নয়। জীবনানন্দ তরুণ বয়সে যে-সব বিষয় নিয়ে কবিতা লিখতেন, কিংবা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অথবা প্রবীণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ, তাও অনেকে ছেলেবেলার অনেক অভ্যাসের মতো ত্যাগ করেছেন, এবং অনেকেই লক্ষচয়নে জীবনানন্দের অল্প বয়সের (এমন কি শেষ বয়সেরও) লেখার চেয়ে পটুত্বের পরিচয় বেশি দেন। কিন্তু আসল চরিত্র বিশেষ বদলায়নি। কবিতায় ভাষার ব্যবহারের পরিবর্তনে কবিতার সত্য পরিবর্তন সূচিত হয়। আমার ধারণা সে-পরিবর্তন বাংলা কবিতায় আসেনি।

প্রত্যেক কবিকেই কোনো-না-কোনো সময়ে নিজের ও সমাজের কাছে নিজের শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জবাবদিহি দিতে হয়। এবং খুব স্থিতিশীল সময়ের ক্ল্যাসিকাল সমাজবাদী কবিরা ছাড়া অন্য প্রত্যেকের নিজের সম্বন্ধে একটি মাত্র বক্তব্যই থাকে : সেটি এই যে তিনি ভাষাব্যবহারে কোনো অপূর্বতা, একটি নতুন বাচনভঙ্গি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

কবিতার ভাষাই অর্থের জন্মদাত্রী। নতুন ভাষাবোধ বিনা নতুন অর্থের প্রকাশ সম্ভব নয়। যখন কবিতার প্রগতি না থাকে পরিবর্তন আসে, তখন ভাষার ব্যবহারে পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং কাম্য।

যুবকেরা স্বভাবত ঔদ্ধত্যের বশে, পরিবর্তনের জৌলুসে ভুলে যুরে যাওয়ার ইচ্ছের ঐতিহ্যের সব উত্তরাধিকার ফেলে দিয়ে পাড়ি জমাতে চান। অন্যেরা শুধু বিষয়ের পরিবর্তনেই ভাবেন ভ্রান্তিরা বদলালো, নতুন দেশে এসে গেলেন। আর অনেকে যুরে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলবার ভয়ে যাত্রার আগেই কোনো কল্পিত কিংবা মৃত স্বর্গযুগে প্রত্যাবর্তন করতে চান, কিংবা সমান নিশ্চিন্ততা লাভ করেন প্রমিকশ্রেণীর সামাজিক চেতনার সুত্র হ'য়ে।

এ-যুগের তরুণরা প্রায় প্রত্যেকেই নিশ্চিন্ততা কামনা করেন। শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও। পাশ্চাত্য দেশে আধুনিক শিল্প ব্যক্তিমানসের জটিল আলিগলি ঘুরে যেন অপ্রকাশের সীমান্তে এসে থমকে আছে। এবং বাণিজ্য-বিহীন নীরব দীপে নির্বাসন যখন, আর যার পক্ষেই হোক, শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়, তখন প্রকাশের নতুনতর পথ খুঁজতে প্রত্যেকেই ব্যগ্র। সেজন্য অনেকে সহজবোধ্য হওয়ার আশায় কবিতায় বুদ্ধিগ্রাহ্য বক্তব্যের বদল করেছেন, জন-সঙ্গীতের কিংবা গুয়েলকেয়ার-স্টেটের বন্দনা গাইছেন। কিন্তু পূর্ব-নির্ধারিত বক্তব্যের সুচারু প্রকাশ কবিতা নয়। শিল্পের বক্তব্য শুধু শিল্পের মধ্যেই মূর্ত, শুধু শিল্পকর্মের পরিধির মধ্যেই সেই শিল্পের অর্থের বিকাশ। সুতরাং নতুন অর্থ যদি সৃষ্টি করতে হয় তবে ভাষার নবজন্মও প্রয়োজন। এমন ভাষা, যা সেই অর্থটি সৃষ্টি করবে, কোনো পূর্ব-জ্ঞাত কিংবা পূর্বজাত তথ্যের সুপরিবেশনই করবে না।

২

আমার হয়তো প্রথমেই স্বীকার ক'রে নেয়া উচিত যে আলোচ্য বই ক'টি পড়বার আগে থেকেই আমাকে অনেকটি করিত আশা এই আশঙ্কা বিব্রত করেছে। প্রত্যেকটি বই অল্পবয়সী কবিদের লেখা—নিজেরাই যাঁরা নিজেদের "তরুণতর" ব'লে অভিহিত ক'রে থাকেন। সুতরাং ভেবেছিলাম এ ধের কবিতা হবে তারুণ্য না হোক ছেলেমানুষিতে ভরা ; বয়সোচিত স্পর্ধা, ঔদ্ধত্য

ও ফল প্রত্যেক পাতায় লক্ষ্য করবো, প্রচলিত ধারণাগুলিকে তাঁরা বার-বার প্রশ্ন করবেন, একটুও ভক্তি দেখাবেন না কখনো। এবং অপরিণতির ফল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পূর্বলক্ষণ হ'য়ে দেখা দেবে; সাহস, অধ্যবসায়, অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা এই ফলগুলিকে পরিণত কীর্তিতে রূপান্তরিত করবে।

কবিতাগুলি পড়বার পরও বিস্মিত বোধ করছি, কিন্তু অন্য কারণে। পূর্বগামীদের আধুনিকতার বদলে এঁরা নতুন কোনো আধুনিকতা আনেননি, তাঁদের ভাবাচেতনার বদলে নতুন কোনো চেতনার জন্ম দেননি; এঁদের কবিতার ধারণা জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু বা বিষ্ণু দে-র ধারণা থেকে স্বতন্ত্র নয়। দুঃসাহসিকতা এবং বয়সোচিত বিদ্রোহের বদলে এঁরা সামাজিক ভাব বিবিবাদে যেনে নিয়েছেন। এঁরা জন্মাবার আগে থেকেই যেন প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হ'য়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন।

প্রথমে মনে হ'তে পারে এতে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। বিদ্রোহের টগবগ হ'য়ে ফুটে ফুরিয়ে যা গিয়ে প্রথম থেকেই এঁরা প্রজ্ঞা অর্জন করেছেন। ইওরোপ ও আমেরিকায় এ-রকম হাওয়া-বদল ঘটেছে; এর অস্পষ্ট আভাস বাংলা কবিতাতেও লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের মতো পাশ্চাত্য দেশেও, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুদিন পর থেকেই, অনেক ব্যক্তির চিন্তায় লক্ষ্য করা যায় দেশজ ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা, সামাজিক দায়িত্ব ও লোক-সাধারণের চৈতন্যকে প্রবেশ করার প্রয়াস।

উনিশ শতকের ইওরোপীয়ের কাছে পাশ্চাত্য শিল্প ছাড়া অন্য কোনো শিল্প ছিল না, যেমন পাশ্চাত্য দর্শন কিংবা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো সভ্যতাও তাঁরা কল্পনা করতে পারতেন না। অপর সংস্কৃতি বিষয়ে চেতনা বিশ শতকের একটি প্রধানতম লক্ষণ। চিত্রকলা, বাদ্যযন্ত্র-তে তা যেমন বুদ্ধিগ্রাহ্যরূপে দেখা দিয়েছে, তেমনি শিক্ষালয় বা এজরা পাউণ্ডেও তা মূর্ত। এবং এই অপর সংস্কৃতিসমূহের অস্তিত্বের চেতনা প্রত্যেক সংস্কৃতির আভ্যন্তরীন চেতনার রূপও বদলে দিয়েছে। আজ কোনো দেশের ঐতিহ্যই সরল রেখায় বিস্তৃত নয়; দেশাতীত ও কালাতীত শিল্পের জ্ঞান সমকালীন দেশীয় শিল্পের মূল্যায়নে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

অথচ এ-যুগের কবিদের প্রত্যেকে অদ্ভুতরকম বিদেশবিমুখ। তাঁদের

মধ্যে সমস্ত যুগ ও সমস্ত পৃথিবী তোলপাড় ক'রে নিজেদের কাব্যচর্চার আদর্শ-সন্ধানের উৎসাহ প্রায় দেখাই যায় না। বাংলাদেশে যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে শুধু ইংলণ্ড নয়, ইওরোপের প্রধান-প্রধান কবিদের রচনা অনুবাদ ক'রে সারা ইওরোপকে আমাদের আপনার ক'রে তুলছেন, তখন বিস্মিত হ'য়ে আবিষ্কার করি আমার সমবয়সীরা ইয়েটস কি এলিয়টের সবচেয়ে কাঁচা লেখা বেছে নিয়ে "অনবস্থা-বিষয়ক সংবাদ" কিংবা "La figlia che piange"-এর অনুবাদ করছেন।

এতে দুঃখিত হবার কারণ থাকলেও বিস্মিত হবার কারণ হয়তো নেই। ঠিক যেমন এই প্রতিষ্ঠিত কবিদের দ্বারা অনুদ্ঘাটিত কবিতা ও কবিদের বদলে অন্য কোনো বিদেশী কবি কিংবা কবিতার যুগ আমরা নতুন ক'রে খুঁজে পাইনি, ঠিক তেমনি নিজের দেশের কোনো কবি কিংবা যুগও আবিষ্কার করতে পারিনি আমরা। এবং তার কারণ, এঁদের কাব্যাদর্শের বদলে আমরা নিজেদের হ'য়ে কোনো নতুন শিল্পধারণার জন্ম দিইনি। বিষ্ণু দে কিংবা সুধীন্দ্র দত্তর আধুনিকতা হয়তো আমার বয়সের কবিদের কাছে এখনো অত্যাধুনিক। শিল্পে এখনো আমরা হয় "সমাজবাদী" নয় "আনন্দবাদী"।

নতুন শিল্প-ধারণার বদলে আমরা এনেছি কবিতার বিষয়বস্তুর ও বুদ্ধিগ্রাহ্য বক্তব্যের পরিবর্তন। আমরা প্রত্যেকে আজকাল এক জটিল "সুস্থ জীবন-বোধে" বিশ্বাসী। এবং সেই সুস্থ জীবনবোধ যেহেতু সত্য, ব্যক্তিসচেতন বুদ্ধি-জীবীর মধ্যে প্রাপ্তব্য নয়, তাই আমরা অগণ্য লোকসাধারণের চৈতন্যে ফিরে যেতে চাই। আর তারই ফলে আমরা মনে করি যেন লোকশিল্পের আদর্শ যেনে নিলেই সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের সবচেয়ে উঁচুতে পৌঁছতে পারবো। সেইজন্য ছড়া ও বাউল ভঙ্গিতে লেখার ('মাটি, আমার মাটি। তুমি সোনার চাইতে খাঁটি') হিড়িক আজকাল ব্যাপক। আমাদের সোপন বিশ্বাস, সত্য এবং ব্যক্তিসচেতন হওয়া কোনো অনির্দেশ্য কারণে যেন জনসাধারণের প্রতি "অমার্জনীয় বিশ্বাসঘাতকতা"।

কবিতার বক্তব্যের পরিবর্তন নতুন শিল্প-ধারণা ছাড়া আসে না। কিন্তু আমরা এমন এক সময়ে লিখতে শুরু করেছি যখন আধুনিকতা আর আধুনিক নয়। শিল্পের ও আমার যে-ধারণা মালার্মে, এমন কি ভালেরির কাছেও বৈপ্লবিক

ছিলো আজ তা তাকে ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠে এসেছে। আধুনিক শিল্পের মূল ধারণাগুলি এখন ক্লিশে-তে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশেও জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কবিতার যে-ধারণার দুই দিক মূর্ত করেছেন, আমাদের ভাষাচেতনা যেন সেখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ভাষাব্যবহারের ধারণা যেন চিরকালের মতো নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, এর পর যেন আমরা বক্তব্যের বিষয়ান্তর করতে পারি, ভঙ্গির ("new criticism"-এর ভাষায় যাকে বলে strategy) পরিবর্তনও হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু ভাষার ধারণার কোনো মৌল পরিবর্তন আনতে পারি না, শুধু ছন্দসূত্র, এবং রুচির অলিখিত নির্দেশ আরো বেশি যত্নের ও একাগ্রতার সঙ্গে পালন করি। তাই কবিতা লেখা আজকে অনেক বেশি সহজ ও কঠিন। সহজ, কারণ যে-কোনো রুচিবান ব্যক্তিই কয়েকটি বাঁধা গতে বাঁধা চিত্রকল্পের সাহায্যে ("ফোলা-বুক সাদা-সাদা হাঁসের মতন", "আসন্ন মহাবিশ্বের মহামানবের এক অপরাহ্ণের বিদ্রুপ", "নদীকে এলায়ে দিতে তারা মন, মাটিরাঙা জল। এ-দুজন বিয়ে যদি ছিনিমিনি খেলে তো খেলুক") খুব অবশ্য ভাষায় লিখে কবিতা ব'লে প্রকাশ করতে পারেন। কঠিন, কারণ এটা অব্যবসায়ীসাপেক্ষ, এবং আধুনিক কবি, প্রকরণের যে-দিকটির দাবিকে করা হলে সেই দিকে অর্থাৎ ছন্দ সম্পর্কে বেশ সচেতন। আলোচ্য বই ক'টির ছন্দ ও অন্ত্য কয়েকটি বিষয়ের নৈপুণ্য আমাকে মুগ্ধ করে। শুধুমাত্র বিষয় ভালো কবিতা আজ আর শুধু নৈপুণ্য দ্বারা রচনা করা যায় না, কবিতায় নতুন সংজ্ঞাও সেই সঙ্গে কবিকে জোগাতে হবে। আমার আশঙ্কা হয়, পূর্ব-নির্ধারিত বক্তব্যের চাপে শিল্পের নতুন রূপ আবিষ্কারের সাহস এঁদের লুপ্ত হয়েছে ; বিদেশবিমুখ ব'লে দেশীয় ঐতিহ্যকেও এঁরা যথার্থভাবে ব্যবহার করতে পারছেন না এবং কালনিক জীবনবোধ ও অর্ধান রোমান্টিক ধারণা এঁদের নিজেদের দিকে ভালো ক'রে তাকাবার ক্ষমতা নষ্ট করেছে। কী হওয়া উচিত সেই চিন্তায়, শিল্পী হিসেবে এঁদের যে-একমাত্র নীতি থাকা উচিত, যে-কোনো প্রলোভনেই সত্যের স্বরূপ আবিষ্কারে বিরত না-হবার যে-নীতি, তা থেকে এঁরা ভ্রষ্ট হয়েছেন।

৩

"দশক"র কবি সুকুমার রায়ের নামগৌরব আছে। কিন্তু সে-গৌরব ধার-করা ব'লে তাঁর পক্ষে তা পরিহার্য ছিলো, নিজের নামটির না হোক, অন্তত বইটির। বইটির চব্বিশটি কবিতার মধ্যে তিনটি হ'লো বিদেশী কবিতার অনুবাদ। ভক্টিউ. বি. আর্চারের কোনো লেখা আমি ইতিপূর্বে পড়িনি; যদি তাঁর অন্য সব কবিতা অনূদিত কবিতাটির তুল্য হয় তবে তিনি একজন অতি সাধারণ কবি। কামিংস বড়ো কবি নন, কিন্তু যে-কবিতাটি অনূদিত হয়েছে সেটি বোধ হয় তাঁকেও পীড়া দেয়। এবং এলিয়টের যে-কবিতাটি অনুবাদ করা হয়েছে সেটি হ'লো "দি লাভ-সং অব আলফ্রেড প্রুফ্রক"র একমাত্র কবিতা, যা সেকালের এডওয়ার্ডীয় পাঠকদের কাছে কিছুটা সমাদর লাভ করেছিলো।

এগুলি হ'লো সুকুমার রায়ের কাব্যাদর্শ অন্বেষণের একটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত। তিনি যে সজীব, দেশে ও বিদেশে তাঁর কবিতার মূলের সন্ধান করতে চান, তা নিশ্চিত। কিন্তু তাঁর হয় তাঁর অনুসন্ধান বিশ্বগামী। তাঁর কবিতায়, বিশেষত "কবিতা"য় প্রকাশিত নতুন কয়েকটি কবিতায় যে-ঐশ্বর্যের সারল্য লক্ষ্য করেছি তার আড়ালে, ভয় হয়, আর বেশি কিছু নেই। এলিয়টের কবিতাটিতে এক অলীক myth-এর আভাস আছে, কিন্তু সুকুমার রায়ের কবিতায় তির্যক, ইম্প্রেশনিস্ট ছবিগুলির পশ্চাতে অর্থের আটো বাস্তবির আভাস শুধু আভাস ব'লেই মনে হয়।

"দিনরাত সুরের আকারে
ধরণীর বেদনন, ধারে ধারে করাঘাত হেনে
কি ছন্দ সন্ধানে আমি খুঁজি সেই নতুন প্রতীক।"

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের "এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা" বইটির শেষ এই কটি পংক্তি তাঁর উদ্দেশ্যের পরিচয় দেয়। সুকুমার রায়ের মতো তাঁর কবিতা প'ড়েও অনুমান করা যায় যে তিনি বাংলা কবিতার বর্তমান চেহারায় সন্তুষ্ট নন। কিন্তু যখন সুকুমার রায় বিদেশী কবিতায় (অথবা বিদেশী ইমেজিস্ট কবিতায়) যান আকৃষ্ট, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের চোখ ঘরের দিকে। তাঁর নিজের চোখে নিজের

চেহারাটা হ'লো : "ব্যাপা বাউলের মতো আমি তাই তোমার সন্ধানে। পাথরে কাঁটার ক্ষত গর্বিত চরণে পথ হাঁটি। হাতে নিয়ে একতারা ঘাটে-ঘাটে, সভায় মিছিলে।"

এ-প্রবন্ধে লোকসাহিত্যের সঙ্গে কবিতার অথবা শিল্পের যোগ আলোচনা করবার স্থান নেই। এমনও যদি সত্যিই হ'তো যে গণজীবনেই একমাত্র উৎস লোকশিল্প তাহ'লেও এই পংক্তিগুলির নাটকীয়তা সমর্থনযোগ্য হ'তো না। "ব্যাপা বাউল", "হাতে নিয়ে একতারা ঘাটে ঘাটে, সভায় মিছিলে", "ঘরে ঘরে কড়াঘাত হেনে", "থরথর দেহমন", "রুদ্র সন্ধান"—এর প্রত্যেকটাই বাধা বুলি। শেষ পর্যন্ত লোকশিল্পের আদর্শ কি এই রকম দু'হাতে একতারা সভা বুলি ছড়ানো হ'য়ে দাঁড়ায়?

পূর্বেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য কী এক অনির্দেশ্য কারণে জীবনের প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে গেছেন যে তাঁর "তৃতীয় নয়ন" থেকে নির্গত মৃত্যু ও ঘুমের প্রার্থনায় তিনি তাঁর কবিতার বইয়ের অর্ধেকটা ব্যয় ক'রে ফেলেছেন। অনির্দেশ্য কারণে বলছি, কারণ তাঁর কবিতা প'ড়ে জানা যায় না কেন তাঁর জীবনে এত অরুচি। যদা তত্র জায়গায় অন্ত কথাই তিনি বলেন : "আমি মরতে চাই না। কি ক'রে থাকবো।" "অনেক সুন্দর আছে পৃথিবীতে"। অবশ্য কবিকে স্বাধিকারের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই দিতে হবে, কিন্তু যে-স্বাধীনতা কবির নেই তা হ'লো ভাষাকে আত্মাবলের মতো ব্যবহার করবার। বোরো শব্দগুলি যেখানে-সেখানে ছড়ানো, এবং একই শব্দের পুনরাবৃত্তির ভিড়ে ঠাসাঠাসি। নমুনা হিসেবে "ঘুমের দেশ" কবিতাটির কয়েক লাইন উদ্ধৃত করি। কবিতাটির সমস্ত শব্দসংখ্যা প্রায় ষাট, তার মধ্যে "ঘুম" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আঠারো বার। আঠারো লাইনে আঠারো বার। "কোথায় ঘুমের দেশ। ঘুমের আকাশে ছাওয়া দেশ। যেখানে ঘুমের রেশ। ঘুমানো বিছায় চাহিবার। যেখানে ঘুমায় ঘুম আর ঘুমের ঘুমন্ত শিশু। স্বপ্ন দেখে অনন্ত ঘুমের। সেই ঘুম নির্বাসের, পরম সুখের। সেই ঘুম আমাতে আসুক। দুচোখে নামুক। এসো ঘুম, এসো ঘুম। আর না-জাগার সেই ঘুম।"

এঁদের তিনজনের মধ্যেই বিভিন্ন ব্যক্তিগত বাচনভঙ্গি গ্রহণ করার যে-চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় এটুকু অন্তত প্রশংসার যোগ্য। রবীন্দ্র বিশ্বাস কিন্তু চলতি ঢং

বিষিচারে গ্রহণ করেছেন। তাঁর সব কবিতাই কয় কোনো-না-কোনো প্রতিষ্ঠিত কবির pastiche, নয় সব কয়জনের স্টাইলের অদ্ভুত জগাখিচুড়ি। অবশ্য সব-কিছু ছাঁইয়ে তাঁর অবক্ষতা তলানির মতো প'ড়ে থাকে। চলতি বুলির আরে তাঁর কবিতা তাঁরা বুজরুকের উপর টুথপেস্টের মতো দ্রুত। তাঁর বক্তব্য "এ-জীবন ধুয়াড়ীর হাতে খেচটা তাস। এই প্রাণ মাতালের হাসি," "সময়ের উচ্চৈঃশ্রবা। উল্লোল ঘৃণায় তীক্ষ্ণ তীর ছুঁড়ে অবিশ্রাম চলে। এ হৃদয় খাঁ খাঁ করে,···কি নির্জন···জনপ্রাণী নেই। শস্য নেই···পাখী নেই···শুধু কঙ্কা খড় কাঁড়ি কাঁড়ি।" (বিশ্বাস করুন, দুটকিগুলোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব শ্রী বিশ্বাসের নিজের।) অর্থাৎ, অল্পবয়সে অনেকেরই যা মনে হ'য়ে থাকে, তাঁরও অধিকাংশ তা-ই; অবশ্য অন্য সকলে সে-কথা আর একটু সুরুচির সঙ্গে প্রকাশ করেন। কিংবা বুদ্ধিমান ব্যক্তি একেবারেই করেন না। সুধীন্দ্র বিশ্বাসের প্রত্যেক কবিতাই তাঁর পরিচিত কোনো-না-কোনো ব্যক্তিকে উৎসর্গ করা। তাঁদের প্রত্যেককে আমার সমবেদনা জানাই। আর লেখককে আমার অভিনন্দন জানাই তাঁর অদ্ভুত ভূমিকার জন্য। বাংলা ভাষার উপর তিক্ততার প্রভাবের উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করবো ভেবেছিলাম। "আমার কাব্যে অনেক পতন ত্রুটিও লক্ষ্য কিন্তু সততা-সহৃদয়তা দুর্লক্ষ্য নয়। আমার লক্ষ্য আত্মসমীক্ষায় সচেতন সবিৎ।" কিংবা সুধীন্দ্র দত্তের গদ্যের প্যারডি ব'লেও ভ্রম করা সহজ। হয়তো তিনি সুধীন্দ্রনাথের গদ্য-ভঙ্গি সমর্থন করেন না, কিন্তু তাঁর অসমর্থনের প্রকাশ আর-একটু শোভন হ'লেই ভালো হ'তো।

"মুক্তির আস্বাদে"র কবি দিলীপ রায়ের কবিতা, বইটির প্রচ্ছদপটটির মতোই, অধিকাংশ চলতি রচনা থেকে স্বতন্ত্র। যে-নিউরিটানিজমের প্রভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে ইনি তা থেকে মুক্ত। এঁর চিন্তায় এক বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করি যা এঁকে, কবি বলতে যে-মেরুদণ্ডহীন জলীয় উদ্ভিদ-জাতীয় জীবের জন্মনা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেই ঘাসের বাইরে রাখে। কিন্তু কবি হ'তে গেলে আরো কয়েকটি গুণেরও প্রয়োজন হয়। যেমন, যিনি মাঝে-মাঝে কবিতাও লিখতেন, এক সন্ধ্যায় মালার্মেকে এসে বলেন, "আজ সারাদিন একটি সনেট লিখতে হিমশিম খেয়ে গেছি। প্রচুর ভাব আসছে কিন্তু সনেটটির মাথাল পাচ্ছি না।" মালার্মে জবাব দিলেন, "One does not

write a poem with ideas, one writes it with words." এদিকে দিলীপ রায় নিজের সম্পর্কে জানিয়েছেন "কিছু-কিছু শুধু কথায় সাজানো সৌখ। ছন্দ তার সব আছে। ভাবের ওজন সৌখ।" এ-থেকে বোঝা যায় আত্মচেতনা ওঁকে কতটা দুর্লভ বস্তুর সন্ধানে।

কিন্তু কখনো-কখনো দিলীপ রায় নিজেও বোঝেন "লিখেছি যে-সব কবিতা। সব তা কবিতা সবই তা" কিংবা, তাঁর কবিতা-প্রসঙ্গে বলেন, "যেন একখানা খাতা। আর তাতে লেখা যা, তা।" প্রশ্ন জাগে, এত কথা জানবার পরও কবিতা ছাপাবার জন্য এত তাড়াহুড়ো কি একটু দৃষ্টিকটু নয়? তাঁর অতিপ্রতা কখনো-কখনো সত্যই কোনো নির্ভেজাল চিত্রের মধ্য দিয়ে উঁকিঝুঁকি দেয়, কিন্তু আত্মসমালোচনার অভাবে সেই ক্ষীণ আলোওলি জঞ্জালের মধ্যে লুপ্ত হয় অতি সহজেই। তিনি লেখেন বালকের মতো, কিন্তু সময় ও অধ্যবসায় ব্যয় করলে পরিণত বয়স্কের মতো নিশ্চয় লিখতে পারবেন মনে হয়। যেমন তাঁর নতুন বই "দুই আর দুই" কোনো বিয়ক্ষরের কিংবা বালকের লেখা ব'লে ভ্রম হয় না। সেই জন্য তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বইয়ের অপেক্ষায় থাকি, আশা রাখি যে ভালো হবে, অবশ্য যদি খুব তাড়াহুড়ো ক'রে নয় বছরের মধ্যে প্রকাশ ক'রে না বসেন। কারণ অনেক দিন ধ'রে পুরোনো মনের মতো অন্ধকারে জমিয়ে না-রাখলে, লোকচক্ষুর আড়ালে মজতে না-দিলে, সব চোলাই-এর মাঝে থেকে যায়। এবং তার আগে তিনি ভাষাকীর্ত, শুধু ভাবের ঐশ্বর্যে বিত্তবান কবিতা লেখবার বাসনা পরিত্যাগ করতে শিখুন।

৪

এই আলোচনার গোড়ার দিকে আমি লিখেছিলাম যে এই কবিদের মধ্যে কয়েকজনের শব্দচয়নে নৈপুণ্য ও সুরুচি আমাকে মুগ্ধ করেছে। রাজলক্ষ্মী দেবী ও অরবিন্দ গুহের কবিতায় এই নৈপুণ্য সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করেছি। অবশ্য বিচ্যুতি কখনোই ঘটে না তা নয়। কয়েকটি উদাহরণ "হেমন্তের দিন" বইটি থেকে সংগ্রহ করছি :

> মৃত্যু আসে ছলে বলে,—মৃত্যু আসে শতধার সন্ধানে।
> ...মৃত্যুর সকলে তবি অবাতীর্ণ ললাটের বাসরে।...

ভালোবাসা, এই শব্দে কি যে মন্ত্র আছে।
আবেশ, আলো, ঘোর, দুরন্ত আবেগ,
অবহেলা ভয়ের ঘোর উল্লাসনা,
ইথা লকলক করে আগুনে কাঁপায়ে।...

এক মুঠো অন্ন তাও জমা করে খাওয়া।
হায় হায়,
আমাদের ভালোবাসা অন্নিমূল্য হায়।

অবহেলে ছুঁড়ে দিয়ে, ফেরে দিয়ে হৃদয়ের সোনা
যদি ভুল ক'রে থাকি—তুমি কিন্তু ভিক্ষে কোরো না।

কিন্তু এই উদাহরণগুলির বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতার প্রকৃত আস্বাদ উৎসাহজনক, তাঁর উচ্চাশার অভাবই সে-আস্বাদের জন্য দায়ী। কবিতা-গুলি থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি নিরভিমান, দম্ভহীন, অল্প বাসনার পরিপূরণে সহজেই তৃপ্ত। ("জীবনের সাধারণ ছোটো সুখগুলি ধরবার। টেনেছে আমার মন। আশ্চর্যের পেয়েছি খবর। সাধারণের মুখ থেকে।") কথাটির মলাট ছাই রঙের; শঙ্কা হয় এ আর-এক জীবনানন্দের ধূসর জন্তু বুঝি। অথচ এ-কবিতার ভেতরে তত্ত্ব নেই, আছে এক সাধারণ খুশির ছবিবার। যেন বিদুষক পড়বার পরও যখন তার হয় এ-কবিতা বুঝি সপ্তাহের কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন, শুধু অবসরের মধুর কিছু দুই সখী, শুধু "এইটুকু থাকবে সম্বল। নির্জন মুহূর্তে শান্তি, তৃপ্ত চোখে দুই ফোঁটা জল" কিংবা যেন দিনের ঘামের পর একটু আতর, তখন হঠাৎ হয়তো পাঠক আবিষ্কার করবেন "মাঘরাতে ব্যাঙের বাজনা" নামের কবিতাটি। যে-অকালে আমরা বাস করি তার সম্পর্কে তিনি সাধারণত যখন লেখেন তখন তা বক্তৃতার মতো শোনায়, রবীন্দ্র বিশ্বাসের চাইতে, কম বুলি-কণ্টকিত হ'লেও চিত্রগুলি স্বকীয় ব'লে মনে হয় না, কলিকালের যে-উদাহরণগুলির উল্লেখ করেন সেগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার লব্ধ নয়, যেন একালের কবি-প্রথা-নির্দিষ্ট এক অনুষ্ঠান অনিচ্ছায় পালন করছেন। "লালিত শিশুর মুখে দুধ-মাখা স্তন। কি ঘেন্নায় উগরে দেয়। দু টাকা তফাতে। তবু সে চাকরি ছাড়ে। অভাব মিটাতে। মালার সূত্রের হাতে কলা সমর্পণ।" কিন্তু উল্লিখিত কবিতায় নাটকীয়তার বদলে এসেছে অনুচ্চ চিন্তার গতির সঙ্গে

সুলভজন অন্ত এক সুর। অতি পরিচিত ধারণাগুলি যন্ত্র উপমায় মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। নীতিকথার মতো শেষে কোনো সহজ তুলনা দেবার চেষ্টা নেই, তিনি জানেন বিশ্বব্যাপী অনায়ত্তার মধ্যে ছোটো যে-সব সুখ আছে সেগুলি সত্য হ'লেও এতই হিসপরিমাণ যে আমাদের আনতে পারে না। "মাতৃরাতে ব্যাঙের বাজনা। এবে দেয় অন্তরস্থ ঈশ্বরের অসুই সান্ত্বনা।"

অরবিন্দ গুহের কবিতা নিয়ে কখনো খুব একটা হৈ-চৈ হয়নি, কিন্তু "আধুনিক বাংলা কবিতা" সংকলনে প্রবল ক'রে বুদ্ধদেব বসু তাঁর অনুশীলনের যে-স্বীকৃতি দিয়েছেন তা বহু পাঠকের সমর্থন লাভ করবে। কী ক'রে যুগান্তকারী না-হ'য়েও বিশেষ হওয়া যায় তার উদাহরণ অরবিন্দ গুহ। তাঁর পরিচয়, অল্প কবিতাগুলি কোনো নতুন চেতনার জন্ম দেয় না, তবু তৃপ্তি দেয়। কী ক'রে তিনি বিপ্লবী না-হ'য়েও বিশেষ হলেন সেই কারণের অনুসন্ধান করলে অনেক তরুণ কবিরা লাভবান হবেন। প্রত্যেক যুগের প্রধান কবিদের চতুর্দিকে এ-রকম নিপুণ অপ্রধান কবিদের প্রয়োজন আছে, আর-কিছু না হোক অন্তত মুখ-বদলের জন্ত।

অরবিন্দ গুহ নতুন কোনো ভাষা সৃষ্টি করেননি, কিন্তু রুচির সঙ্গে ভাষা ব্যবহার করেছেন। ছন্দ নিয়ে অতিমাত্র পরীক্ষা করেননি, কিন্তু একটি কি দুটির অতিরিক্ত ব্যবহার জানেন। এবং, সবচেয়ে যা মূল্যবান, তিনি অতিসহজকে অনন্য ও মূর্ত করতে পারেন প্রত্যেকটি ঘোষণার আড়ালে একটি ঘটনার ছায়া ফেলে, একটি নাটক সৃষ্টি ক'রে। তাই তাঁর লিরিকগুলি আমিত্বের ভারে নুয়ে পড়ে না, কোনো কল্পিত চরিত্রের মুখে জীবনের কোনো তীব্র মুহূর্তের অসতর্ক স্বীকারোক্তির মতো শোনায়। এবং চরিত্রগুলি প্রায় আমাদের সমসাময়িক। তারা যদিও ক্লাসিসেসের বৈদেশিক ব্যাপিকা আছে কি নেই এ-সম্পর্কে বিশেষ মাথা ঘামায় না; ঈশ্বর, অর্থনীতি, শান্তি কোনো বিষয়েই তাদের কৌতূহল নেই, তবু তারা তাদের সংকীর্ণ বোধের জগতে আমাদের অনুরূপ ভাষায় কথা বলে। তাদের জগতে শুধু একটি ঘটনাই ঘটে ও তা-ই নিয়ে তাদের যত কিছু সমস্যা। অসার্থক যৌন সম্পর্কের কাহিনীতে যত নাটকের সম্ভাবনা, অন্য কিছুতে বোধহয় তত নেই। সেই সম্ভাবনা, অরবিন্দ গুহ অনেক কবিতাতেই ব্যবহার করেছেন।

"অলস মুহূর্তের প্রার্থনা" "দক্ষিণ বায়ুকোণ"-এর সবচেয়ে ভালো কবিতা। যার কণ্ঠস্বর আমরা এ-কবিতায় শুনি সে-ব্যক্তি লেখকের কল্পিত অসার্থক, সংকুচিত চরিত্রদের অন্যতম, যে তার ইলিয়টার রোগশয্যার পাশে এসে, অন্যদের অনবধানতার সুযোগে, মেয়েটির স্পর্শ প্রথম পেল। কবিতাটি এই মুহূর্তের আগে ও পরে তার ভয়, সন্দেহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী। "দক্ষিণ বায়ুকোণ"-এর অন্যান্য চরিত্রের মতোই সেও এই তীব্র মুহূর্তের অভিজ্ঞতা থেকে যা লাভ করে, তা শুধু প্রাথমিক বিকাশ। মুহূর্তের জন্য শুধু মনে হয় এ-অভিজ্ঞতা "মায়াবী", তার সমস্ত জীবন বদলে দেবে, তাকে তার অবশ্যম্ভাবী সংকোচের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে আবার পুরোনো অভ্যাসের বশে তাড়াতাড়ি বুলি আওড়ায়। "ভয়ে বুক কাঁপে, আর থাক। মনে মনে তার নাম। গান হয়। অসুখের ছলে তার যেটুকু বিলাস। তা অনেক।" আর তার পরেই সে প্রার্থনা করে আবার সেই অলৌকিক, বিধিদত্ত মুহূর্তের পুনরাবৃত্তি। তাহলে সে স্বীকার ক'রে নেয় যে কখনোই কিছু অর্জন করতে পারবে না, অসুখের ছলে কিছু পেলেও যা পেতে পারে।

৫

মার্কিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতা লেখার ক্লাশ আছে। এ-দেশেও হ'লে হয়তো ভালো হয়। তাহ'লে হয়তো অপাঠ্য রচনা এত ছাপানো হ'তো না। হয়তো মাঝারিরাই থাকতো, এবং ছোটো সুখ-দুঃখের মনোরম, নিপুণ চিত্র আরো রচনা করা হ'তো। অরবিন্দ গুহের মতো কবির সংখ্যা বাড়তো। সে-লাভ কম কী?

অবশ্য শুধু ভালো নয়, অনেক কবিতায় যে আরো কিছু থাকে সে "আরো-কিছু" স্কুল-কলেজের প্রণালীর সঙ্গে-সঙ্গেই সহজলভ্য হ'য়ে যাবে না। ভাষা-চেতনায় ও কবিতার ধারণায় যে-বৈপ্লবিক পরিবর্তন না-হ'লে কল্পিত কবিতাগুলি অলিখিত থাকবে, সেই পরিবর্তনের লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না, শুধু এ-দেশে কেন, কোনো দেশেই নয়। এবং কে জানে সেই পরিবর্তন শুধু শিল্পীর চেষ্টার উপর নির্ভরশীল কিনা। শিল্পে এ-রকম যুগান্তকারী যত পরিবর্তন, সবই ব্যাপকতর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই আদিযুগ থেকে ঘ'টে এসেছে।

অবশ্য এই যুক্তি হ'লো সমস্ত কুকবি ও অকবির আত্মরক্ষার উপায়। কিন্তু তাঁরা আগে আবিষ্কার করেন যে জগতে পরিবর্তন ঘটেছে ও পরে কবিতায় সেই পরিবর্তন বর্ণনা করেন। আর সৎকবি নিজের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে পৃথিবীরও পরিবর্তন হয়েছে ব'লে অনুমান করেন। অকবির ধারণা, শিল্পীর দায়িত্ব সাংবাদিকের, নিজের অন্তরতা তাই তাঁর বোধগম্য হয় না, বক্তব্য ও প্রকরণের প্রভেদ তাঁর কাছে এতই স্পষ্ট। সৎকবি এই প্রত্যেকটি ধারণাকে অস্বীকার করেন, কারণ শিল্পকে তাঁর মনে হয় অজ্ঞাতপূর্ব চেতনার ভাষার স্বভাবের সাহায্যে বিকাশ, শিল্পকর্মটি জন্ম নেবার পূর্বে যে-চেতনার স্বরূপ-নির্ধারণ অসম্ভব ছিল। শিল্পী, তাই, না সমালোচক, না দ্রষ্টা, কোনো অধিকর্তার নির্দেশে সৃষ্টি করতে পারেন না। কারণ যে-অর্থ কবি আবিষ্কার করেন তা সৃষ্টির মুহূর্তে ব্যক্তিমানসের নিভৃতে মূর্ত হয়ে ওঠে; পূর্বেই যদি তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলতো তবে স্বতন্ত্র শিল্পকর্মের প্রয়োজন থাকতো কোথায়? আগে থেকে যাঁরা জানেন আগামী দিনের কবিতা শ্রমিক-সমাজের সামাজিক চেতনার কোন অংশকে রূপ দেবে, তাঁদের শিল্পচর্চা অসফল হওয়া অনিবার্য। কবিতার পরিবর্তন আছে, পরিবর্তন আসবেও, কিন্তু পূর্ব-নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় (বা অন্য কোনো শাস্ত্রসম্মত) চেহারা নিয়ে কোনো দেশেই আসবে না।

শিল্পের বক্তব্য তার সম্পূর্ণ রূপের মধ্যে বিকশিত। বাইরের পৃথিবীকে শিল্প তার নিজস্ব ভঙ্গিতে রূপান্তরিত করে ব'লে যেমন ভবিষ্যৎ শিল্পের রূপ নির্দেশ ক'রে দেওয়া যায় না, তেমনি তার বক্তব্য কিংবা চিত্রকল্পও আইন ক'রে বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। ইতালীয় হিউচারিস্ট মারিনেত্তি ঘোষণা করেন যে আগামী যন্ত্রের যুগে কবিতার চিত্রকল্পকে যন্ত্রের উপমানির্ভর হ'তেই হবে। ইতালীয় কবিতায় কিন্তু মারিনেত্তির প্রভাব অতি অল্পদিন টেঁকে, এবং ইতালীয় সমালোচকদের মতে তাঁর চেয়ে বরং উনগারেত্তি যন্ত্রযুগের ভাষার যথার্থ রূপ দিয়েছেন, যদিও কোনো যন্ত্রের বর্ণনা তাঁর কবিতায় নেই।

সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক পরিবর্তনও কবির মনের রসায়নে বিচিত্র রূপান্তর লাভ করে। সমাজ-বিবর্তনের ঐতিহাসিকের মতে উনিশ শতকের কাল বুর্জোয়া-শ্রেণীর বিজয়গৌরবের কাল। সেকালের উন্নতি শ্রমিক-শ্রেণী

ও পরাজিত সমাজ ভূস্বামীবর্গ, উভয়েই বেনেজাতির অর্থসর্বস্ব জীবনযাত্রার বিরোধিতা করে। অথচ প্রধান শিল্পী কয়জন, যেমন বোদলেয়ার, অপ্রধান কবি লাফাতিনের মতো আগামী সমাজের কথা না-লিখে, বিগত "সামন্ততান্ত্রিক" মূল্যবোধে সিঞ্চিত থেকেই শিল্পসৃষ্টি করেছিলেন।

অনেক সমাজ-সচেতন ব্যক্তি আজ হস্তক্ষেপ করতে চান শিল্পীর সেই অধিকারে, যার দ্বারা তিনি পৃথিবীকে শিল্পের মধ্যে রূপান্তরিত করেন। যদি বর্তমান পৃথিবীর অঙ্গে ভয়ানক অসুখ থাকে, তাহ'লেও, ভবিষ্যতের কথা ভেবে, জীবনের জয়গান লিখতে বলেন। কিন্তু শিল্পীর প্রধান দায়িত্ব নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, স্বতন্ত্র সত্তা লুপ্ত ক'রে দিয়ে নিজেকে উপস্থিত সত্যের সামনে ঊর্মোচিত করা, যাতে অভিজ্ঞতা ও ভাষার আবর্তে, কবির মনের চাকনিতে চুঁইয়ে কবির বক্ষ ভাষা চেতনার আগুনে গ'লে, সেই সত্য তার নিজস্ব শিল্পসম্মত আকার নেয়। অতএব না ভূত বা ভবিষ্যৎ কোনো প্রভুই বর্তমান থেকে শিল্পীকে বিচ্যুত করতে পারেন না। শিল্পের মূল্যই তো তার সমকালের প্রতি আসক্তিতে; যেহেতু কাল প্রবহমান সেইজন্য তীব্র ক্ষণগুলিকে চিরন্তন করবার এই ক্ষমতা এত মূল্যবান।

এবং কোনো প্রভুই শিল্পীকে দুর্নীতিবাগীশ ক'রে তুলতে পারেন না, যদি শিল্পী দেখেন যে শিল্পকর্মের মধ্যে পৃথিবীর অঙ্গের সেই অসুখের চিহ্ন আছে। কোনো প্রভুই শিল্পীকে মিথ্যাবাদী হ'তে বাধ্য করতে পারেন না। শিল্পী সকল কালের কাছে তাঁর কালের সঞ্জয়-দূত, যদি ভালো ভেবেও মিথ্যা ব'লে অজ্ঞানতা উপহার দেন তবে পৃথিবীর সত্যিকার অনিষ্ট করেন তিনি, এবং নিজের কাপুরুষতার পরিচয় দেন। দুঃখদায়ক হ'লেও সত্যকে যিনি দেখতে জানেন তিনি জ্ঞানী, এবং জ্ঞানই পৃথিবীর পরিবর্তন আনতে পারে, মূর্খতা নয়।

বাংলা কবিতায় এক "জীবনবোধে"র চল হয়েছে, যে-বোধে দীক্ষিত ব্যক্তিরা যে-কোনো অবস্থাতেই তাঁদের কবিতায় পৃথিবীর কোথাও যে কোনো অন্যায় অথবা অসুখ থাকতে পারে, এ-কথা স্বীকার করেন না। এঁদের আস্বাদের চেয়ে বৈরাগ্যজনক আর-কিছু নেই। কারণ ইচ্ছাকৃত অন্ধত্ব পৃথিবীর পক্ষে অমঙ্গলের। অসুখের অস্তিত্ব এঁরা নিজেরা অস্বীকার করেন না হয়তো, কিন্তু নিজের তার প্রকাশ এঁরা সহ্য করেন না।

বাংলা কবিতার পক্ষে এটা আশঙ্কার কথা। তবে প্রত্যেক দেশেই কোনো-কোনো কালে এঁদের সংখ্যাধিক্য দেখা গেলেও সৎকবিরা বিভ্রান্ত হন না। নিজেদের চারপাশের এই ভ্রান্ত চিন্তার মধ্যেও যে অরবিন্দ গুহ কুমারীদের দেহের বা আত্মহত্যার বিষয়ে লিখতে সাহস পান, কিংবা দিলীপ রায় দৈহিক কামনার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এ-জন্য তাঁরা অভিনন্দন-যোগ্য। সর্বসম্বন্ধে অসংকোচ হ'লেই ভালো কবি হওয়া যায় না, কিন্তু শব্দ বা বিষয় সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হ'লে কবি হওয়া অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। ছোটোখাটো টেনিসন কিংবা সাগিটারিয়স হবার যাঁদের ইচ্ছে, প্রতি বছর শারদীয় সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হ'য়েই যাঁরা কৃতার্থ, তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।